প্রসঙ্গ : নাট্য

শম্ভু মিত্র

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী। কলকাতা ৬

শাঁওলী - কে

একটি ছাড়া আর-সব লেখাগুলোই এখানে ওখানে বেরিয়েছিলো। এইগুলোকে বেছে ঝেড়ে পুঁছে সম্পাদনার কাজ করেছেন শ্রীমান্ স্বপন মজুমদার। এই বইটার ব্যাপারে যদি কোনো কৃতিত্ব কারোর চোখে পড়ে তাহ'লে তার সম্পূর্ণ অধিকারী তিনি।

শম্ভু মিত্র

সূচিপত্র

নাট্যসমস্যা প্রসঙ্গে

সূচিপত্র

প্রযোজনা প্রসঙ্গে

স্মৃতি প্রসঙ্গে

প্রস্তাবনা

কাল নিরবধি এবং পৃথ্বী বিপুলা — এ-কথা বলতে পারেন লেখক, বলতে পারেন চিত্রকর। কিন্তু আমরা — অভিনেতারা — তা পারি না। আমাদের জন্য নয় ভাবীকালের স্বীকৃতি। নেই সমসাময়িক আবর্তনের ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত মূল্য বিচার। আমরা আজকের। একান্ত ক'রেই আজকের। আমাদের শিল্পে যাঁরা মহান, তাঁরা পরযুগে কিংবদন্তীমাত্র। নিজের নিজের যুগের খণ্ডকালের মধ্যেই আমাদের অস্তিত্ব। সেই 'কাল'কে আমরা প্রকাশ করবার চেষ্টা করি আমাদের দেহ দিয়ে, মন দিয়ে, আবেগ দিয়ে,— আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে। সমকালীন জীবনের আগুন আহরণ ক'রে সেই আগুনে আমরা নিজেদের দগ্ধ করি। কেউ কেউ হাউইয়ের মতো পারি আকাশের বিশালতায় উঠে যেতে। আর অনেকেই পারি না। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়েও কেবল মাটির ওপরেই প'ড়ে প'ড়ে জ্বলি। জ্বলি, আর একদিন ফুরিয়ে যাই।

হয়তো এ-প্রকাশ একটু কাব্যিক, কিন্তু সত্য। কবি, ঔপন্যাসিক তাঁদের অত্যুত্তম সৃষ্টি ছাপিয়ে রেখে দিতে পারেন ভাবীকালের মুখ চেয়ে, কিন্তু আমরা পারি না। আমাদের বেসাতি আজকের দিনের লোকের মন নিয়ে। তাই প্রতিনিয়ত ভয়ও থাকে যে জনপ্রিয় হবার লোভে এই বুঝি লোকের বিভ্রান্তির সুযোগ নিচ্ছি, এই বুঝি তাদের কুসংস্কারকে স্তোক দিয়ে নিজের কোলে ঝোল টানছি। যেমনটা ব্যবসায়িক মঞ্চের ও ফিল্মের বহু নাটকে হয়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য তো হ'লো মানুষকে আনন্দ দেওয়া, তাকে মহান করা। অথচ আজও যাযাবরের মতো গুটিকয়েক বিচ্ছিন্ন দল বেঁধে আমরা এখনও উদয় হই এই সরাইখানায়, কখনো ঐটায়। সৎ-নাট্যের তো এখনো কোনো নিজস্ব গৃহ নেই বাঙলাদেশে, যেখানে আমরা রসিকদের আমন্ত্রণ করতে পারি। তাই সেই সরাইখানায় যাঁরা এসে পড়েন তাঁদেরই আনন্দ দেবার চেষ্টা করি। হেসে, কেঁদে, গল্প ক'রে। তারপর আবার অপসৃত হই কিছুকালের জন্যে। সরাইখানার দর্শকরা কেউ বলে — বড্ডো ভালো। কেউ বলে — বড্ডো ইন্‌টেলেকচুয়াল। কেউ কেউ বলেন — খেলো, অত্যন্ত খেলো। মাত্র সেই

সমালোচনাগুলোই তো আমাদের পাথেয়। তারই কতকগুলোকে মনে রেখে, এবং কতকগুলোকে প্রাণপণে ভোলবার চেষ্টা ক'রে আমরা আবার পালা বাঁধি, নতুন ক'রে কথা সাজাই, তারপর আবার উদয় হই অকস্মাৎ আর-এক সরাইখানায়।

এদিকে মাটির নীচে শুনতে পাই প্রতিনিয়ত গুর গুর শব্দ চলেছে। সেই শব্দের তাড়নায় ওপরের মানুষগুলো উদ্‌ভ্রান্ত। অথচ তারা সেই শব্দের স্বরূপকে অস্বীকার করার চেষ্টা ক'রে চলেছে। দেখে ভয় হয়। কারণ তাতে আমাদের পথ আরো কঠিন হয়। সমস্ত অন্তর দিয়ে সাম্প্রতিককালের সেই মন্ত্রকে খোঁজবার চেষ্টা করি, যে-মন্ত্র অগ্নিস্রাবী ভূমিকম্পের মধ্য দিয়েভাবীকাল পর্যন্ত সেতু রচনা করবে। যদি পারিও — যদি ততোটাই সৌভাগ্যবান হই — তাহ'লেও আমাদের ক্ষমতার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কিংবদন্তী হবো। ছেলেমেয়েরা যার আবছায়া গল্প শুনবে বড়ো জোর। তাই হোক্। এ-পরিণাম তো জানিই। তবু আমরা যতোদূর সম্ভব চড়া দরে নিজেদের যমের কাছে বেচবো। যে যতোদিন পারবো। যে অজ্ঞাত অভিনেতারা সোফোক্লেসের অয়দিপাউসে বা শেক্সপীয়রের বিরাট ট্র্যাজিডিগুলোয় প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন সেই পূর্বসূরিদের প্রণাম ক'রে আত্মস্থ হই। পূজোয বসি।

লক্ষ্য কী

আমরা যখন অল্পবয়সে শিল্পকর্মে জড়িত হ'য়ে পড়ি তখন অনেকটা যেন জৈব তাড়নাতেই শিল্পক্ষেত্রে আসি। নিজের আকাঙ্ক্ষার রূপটা তখনও ঠিক জানি না, তার উদ্দেশ্যও জানি না শুধু অন্ধকার গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে হাতড়ে মরি একটা ফাটল খুঁজে পাওয়ার আশায়। যাতে আলো পাই।

সেই সময়ে চারপাশের কতো মত যে আমাদের কতো পথে নিয়ে যায়! আমাদের আবেগের মধ্যে উজ্জ্বল অনুভূতির আর অবোধ্য অর্থের যে জাফ্‌রিকাটা আলো-আঁধারির বিশৃঙ্খলা থাকে, তাকে মোটামুটি অর্থবহভাবে বিন্যস্ত করবার আগ্রহে আমরা সেই বয়সে কতোরকম ধার-করা মতবাদের ছাঁচ যে আমাদের মনের ওপর চাপাতে চাই! তার কারণ, এই জীবন — যাকে বলি reality — সেটা যখন অজস্র দিক দিয়ে, অজস্র ডাল-পালা ছড়িয়ে তার ভীষণ, অ-নৈতিক, ও অ-সামাজিক চেহারা নিয়ে সামনে প্রকাশ পায় তখন তাকে আমরা সহ্য করতে পারি না। তারও কারণ এই যে, শৈশব থেকে সেই বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের শিক্ষায় নেই। আমাদের মানতে বলা হয়। যেমন, আমাদের শৈশবের মাননীয় আজ্ঞা হ'লো যে আমাদের প্রত্যেকের বাবা একজন মহান ব্যক্তি, এবং আমাদের প্রত্যেকের মা একজন স্নেহশীলা Niobe। 'পিতা স্বর্গ…' আর 'জননী জন্মভূমিশ্চ…'। ফলে বিষয়মুখী যে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আমরা বাবা-মাকে মানুষ হিসেবে দেখতে পেতাম তা ঝাপ্‌সা হ'য়ে যায়। আর একি শুধু বাবা-মার বেলায়, সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চই আমরা দেখতে শুরু করি কেবল নিজের নাভিকে কেন্দ্র ক'রে। তাই একজন মানুষের-মতো-দেখতে ভগবান সৃষ্ট হন এবং প্রত্যেক বিপদের সময়ে তাঁকে স্মরণ করলেই যেন স্পষ্ট তাঁর অভয়দাতা চোখদুটো চোখ বুজলেই দেখতে পাই। এবং মনে মনে এই গভীর বিশ্বাসও থাকে যে আমার প্রতি স্নেহবশত তিনি তাঁর নিয়মের রুটিন একটু-আধটু এ-দিক ও-দিক নিশ্চয়ই ক'রে দেবেন। প্রচলিত অর্থে বোধ হয় এরই নাম ঈশ্বরে বিশ্বাস। এবং জীবনের অন্যান্য অনেক বিশ্বাসই এইরকম। যুক্তিরিক্ত। অন্ধ।

যাই হোক্, আসল কথা হ'লো চোখে ঠুলি না-প'রে জীবনকে বোঝবার চেষ্টা করতেই আমরা ভয় পাই। এ-ভয় আদিম মানুষের ভয়ের চেয়ে বিশ্রী। আদিম মানুষ জলকে অগ্নিকে দেবতা বলেছে বটে, সেই পথেই আবার তাদের চরিত্রনিরূপণ করবারও কিন্তু চেষ্টা করেছে। আর, লক্ষ্মণ সেনের যে-বাংলায় হাঁচি টিকটিকির দৈব অর্থ বিশ্লেষণ থেকে বাঁশ দিয়ে চেপে সতীদাহ করার প্রসার বাড়তে থেকেছে সেখানে কেবলই চোখ বুজিয়ে, মিথ্যে ব'লে, জীবনের বাস্তবকে ঠুলির ভিতর দিয়ে দেখা হয়েছে।

এরই উৎকট ধারা আমাদের চরিত্রে প্রবহমান। ফলে, একদিকে শৈশব থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির যেমন অভাব থাকে, অপরদিকে তেমনি জীবনের প্রত্যেক ঘাটে ঘাটে তিরস্কারের তর্জনা-আস্ফালন দেখে আমাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাসও খুব ক'মে যায়। এবং যৌবনে যখন ক্রমশ জীবনের মুখোমুখি হ'তে থাকি তখন ততোই হাড়িকাঠের-দিকে-টানা ছাগলের মতো অস্থির হ'য়ে আঁকুপাঁকু ক'রে একটা চশমা হাতড়ে বেড়াই। যে-চশমাটা পরলেই জীবনের সমস্ত দুই আর দুই যেন সুবোধ বালকের মতো ইজ্‌ ইকোয়ালটু'র ডানদিকে একটি গোলগাল গলাবন্ধ-কোট-পরা চার-কে বসিয়ে দিয়ে চিন্তার চরকিকে নির্বোধ স্মিতহাসিতে একেবারে চিরকালের মতো থামিয়ে দেবে।

কিন্তু ক্রমশ বয়স আরো বাড়তে থাকে। অভিজ্ঞতা আরো পাকতে থাকে। আর তখন একদিন বোধ হয় যে, যতোরকমের বাজার-চলতি গজ দিয়ে আমাদের জীবনের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ মেপে ফেলবো ব'লে সুনিশ্চিত ধারণা করেছিলুম তারা সবাই হেরে গেলো। অতি অল্প অংশটুকু মাপবার পরেই সেই বিরাট জটিল আকাশ-পেরোনো জীবনের সামনে কোলের উপর ছাপ-মারা সেই মানদণ্ডগুলো নিয়ে আমরা যেন আলাদিনের দৈত্যের সামনে ছোট্ট আলাদিনের মতো ব'সে আছি। কে ব'লে দেবে যে এ-জীবন কি চায়, এর গতি-প্রকৃতি কি ?

এর উত্তর নিজের মতন ক'রে বুঝবো ব'লেই আমরা পরিচিত স্বস্তির তীর ছেড়ে একদিন বেরিয়ে আসি। এবং সেটা বোঝবার ও অন্যকে বোঝাবার চেষ্টা করাটাই হ'লো শিল্পের কাজ ও দায়িত্ব। অর্থাৎ জীবনকে বুঝবো ব'লেই শিল্পের দ্বারস্থ হই। আশা করি, শিল্পী তার জীবনের দামে জীবনকে যতোটা বুঝেছে তারই আলো দিয়ে আমাকে আমার আত্মা খুঁজে পাওয়ার পথে

সাহায্য করবে। আজকের দিনে — খালি আজকের দিনে কেন, প্রত্যেক যুগেই — তাই আমাদের প্রয়োজন এমন নাটকের যা জীবন সম্পর্কে, অর্থাৎ রিয়ালিটি সম্পর্কে, সত্য সম্পর্কে, আমাদের বোধকে উন্নত করবে, গভীর করবে। আমরা আরো সচেতন হবো।

আর তাই আজ নতুন ক'রে আমাদের নিজেদের নাট্যপদ্ধতি আবিষ্কার করার প্রয়োজন পড়েছে। সেটা কেবলমাত্র উগ্র দেশাত্মবোধ প্রকাশ করার জন্য নয়। সেটা আমাদের অন্তরের গভীরকে শিল্পের মাধ্যমে উন্মোচিত করার জন্য। আমাদের জীবন তো ভাসন্ত বরফের মতো অনেকটাই অন্ধকারে ডোবা। সেই অন্ধকারের অনুভব দর্শকদের উপলব্ধির গভীরে পৌঁছে দিতে গেলে এমন একটি ভাষার প্রয়োজন ঘটে, যে-ভাষা আমাদের রক্তের মধ্যে, আমাদের অবচেতনার গভীরের মধ্যে। তাইতো আমাদের খুঁজতেই হবে যে আমাদের নিজস্ব নাট্যভাষা কি ? যে-ভাষা কবিতার ভাষার মতো ইঙ্গিতময়, গভীরতাব্যঞ্জক। আমাদের মধ্যে দুটো সভ্যতার সজ্ঘর্ষ। আমরা না ভারতীয়, না য়ুরোপীয়। ন ঘরকা ন ঘাটকা।

খৃষ্টীয় সভ্যতার একটা বড়ো রীতি হ'লো কম্যুনিয়ন। মন্ত্রঃপূত খাদ্য ও পানীয় খাওয়া হয় সেটা খৃষ্টের মাংস ও রক্ত ব'লে। কল্পনা হয় যে এরদ্বারা খৃষ্টের শক্তির অংশভাক্ হওয়া যাবে। এর আদি উৎপত্তি হয়তো প্রাচীন গ্রীসের দিওনুসিয়স-এর উৎসবের মধ্যে। এবং আজও এই মাংস ও রক্ত গ্রহণ করার মধ্যে খৃষ্টীয় সভ্যতার গভীর অনুভব জড়িত। যদি কাউকে পাপী ব'লে মনে হয় তাহ'লে পাদ্রী তাকে এই আহার্য দেন না। অর্থাৎ সে আর খৃশ্চান নয়, heretic। এর থেকেই ex-communication কথাটা।

অথচ আমাদের মনের গভীর আবেগে এ-ধরনের ক্রিয়ার কোনো আবেদন নেই। আমরা কোনো পূজোর দিনে দেবতার মাংস ও রক্ত আহার ক'রে তার তেজের প্রসাদ পেলুম ব'লে অনুভব করতে পারি না। আমরা শাক্ত হ'লে বলি দিয়ে দেবতার কাছে সেটা উৎসর্গ করি, এবং তার প্রসাদ পাই।

এটা কাউকে ছোটো বা বড়ো প্রমাণ করার জন্যে বলা নয়। এটা এই দুই সভ্যতার মধ্যে আবেগের বিভিন্ন অনুষঙ্গের কথা। যেমন, হঠাৎ কীর্তনের

একটা পদ শুনলে আমরা যতো এবং যেভাবে বিচলিত হই (ধর্ম মানি আর নাই মানি) একজন ভিন্ন সভ্যতার লোক কিছুতেই তা হ'তে পারে না। এবং এই অনুষঙ্গগুলো নিয়েই তো শিল্পকলার খেলা। নইলে তো কেবল বৈঠকখানার মৌখিক আলাপের মতো হবে। দর্শকের মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করা যাবে কী ক'রে ?

যেমন আরো-একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। সেটা হ'লো রঙের। এক একটা সভ্যতার এক একটা রঙের সঙ্গে একটা বিশেষ অনুষঙ্গ মিলিয়ে থাকে। গেরুয়া রঙে আমাদের মনে যে-অনুভূতি তৈরী হয় সেটা অন্যদের হবার কথা নয়। আমাদের বিধবার দুঃখিনী মূর্তি প্রকাশ পায় সাদা থানে, অনেক দেশে সেই একই অনুভূতি তৈরী হয় কালো রঙে।

এগুলোর কোনোটাই বাইরের জিনিস নয়। ভিতরের। সেই ভিতরটাকে নাড়া দিতে গেলে সেই মানুষগুলোর ঐতিহ্য ও বর্তমান, তাদের আশা কল্পনা, ভালবাসা এবং ভয় সবেরই অংশভাগী হ'তে হবে গভীরভাবে। মানুষ-গুলোকে জানতে হয়। এবং যে-ইতিহাসের মধ্যে এই মানুষগুলো জন্মালো তাও অনুভব করতে হয়।

আর সেই জন্যেই আজ আমাদের আত্মস্থ হবার দিন এসেছে। আমাদের আত্মপরিচয় আমাদের জানতে হবে। আমরা কে এবং আমরা কী! এই প্রশ্নের সন্ধানে আজ আমাদের আকাশ পাতাল ঘুরতেই হবে। এ ভিন্ন আমাদের পন্থা নেই।

নাট্যসাহিত্য : দু-একটি কথা

বাঙলাদেশের সাহিত্যের সকল বিভাগ সম্পর্কেই আমাদের পর্যাপ্ত গর্ববোধ আছে, একমাত্র নাট্যসাহিত্য ছাড়া। অথচ সাধারণ বাঙালী যে নাটক ভালবাসে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের অন্য যে-কোনো প্রদেশে বাঙালী গেছে সেখানেই একটা কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর তারই প্রাঙ্গণে পূজোয় পূজোয় নাট্যাভিনয় শুরু হয়েছে। অথচ সকলেই বলেন গৌরব করবার মতো বাঙলা নাটক হ'লো না। কেন ?

অবশ্য বাঙলার পেশাদারী থিয়েটারের সকলেরই ধারণা যে আমাদের নাটমঞ্চের নাকি নিদারুণ গৌরবদীপ্ত সংস্কৃতি এবং তার তুলনায় অন্যান্য অ-বাঙালীরা যা করে তা একেবারেই ছেলেখেলা — একেবারে নিদারুণ হাস্যকর বালচাপল্য।

এ-কথা তাঁরা বলবার শক্তি পান তাঁদের নিজেদের অন্তর্নিহিত একটা মহৎ গুণ থেকে। সেটা হ'লো কিছুই না-দেখার এবং না-জানার গুণ। হয়তো এ-কথা সত্যি যে প্রত্যেক প্রদেশেই কিছু-একটা নাট্যস্রষ্টার ছড়াছড়ি নেই, কিন্তু সেটা এই অহংকৃত বাঙলাদেশের পেশাদারী মহলেই কি আছে ? তাঁরা কি জানেন যে ভিন্ন প্রদেশীয় লোকেরা কলকাতায় এসে তাঁদের নাট্য-অবদান দেখে কীরকম হতচকিৎ হ'য়ে ফিরে গেছে ? এবং সেইজন্যেই আজ ভারতের যেখানে যেখানে সীরিয়াস নাট্য-আন্দোলন হচ্ছে তাদের ওপর বাঙলার তথাকথিত পেশাদারী নাট্যসংস্কৃতির কোনো প্রভাব নেই। এ-সত্য আমরা দিল্লীতে ও বোম্বাইয়ে প্রত্যক্ষ করেছি। — অবশ্য যখন মারাঠী, গুজরাতী বা হিন্দুস্থানী ভাঁড়েরা অভিনয়ের নামে ঠিক বাঙলা ভাঁড়েদের মতোই আচরণ করে, তখন সেটাকে অনুসরণ বলবো, না একজাতীয়ত্বের প্রমাণ বলবো তা বুঝতে পারি না।

যাই হোক্, পেশাদারী মহলের দাবি সত্ত্বেও এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় নাটক পাঠ্য হিসাবে থাকা সত্ত্বেও এ-কথা সাহিত্যবোধসম্পন্ন লোকমাত্রেই বলেন যে, বাঙলায় নাটক নেই।

এবং আমাদের মতো কিছু লোক যারা ছোটোবেলা থেকে নাটক পড়তে ভালোবেসেছি, যারা একটা ভালো নাটক পেলে পাগলের মতো খুশি হই, সেই আমাদেরও কাজে অনুপ্রাণিত করবার মতো নাটক আমরা ক'টা পাই? এবং অনেক সময়ে যা অভিনয় করি তা অভিনয় ক'রে কি তৃপ্তি পাই? আমরা অভিনয়ের মধ্যে নানান নতুন পদ্ধতিকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি, সে কেবল এই উদ্দেশ্যে যে আমাদের অভিনয়ে যেন গভীরতা প্রকাশ পায়। জীবনের গভীরতা। কিন্তু বেশীরভাগ নাটক যা আমাদের হাতে আসে তা আমাদেরই জীবনবোধের তুলনায় অসার মনে হয়। আমরা অনুপ্রাণিত হ'য়ে যে-নাটকের মধ্যে ডুবে যাবো, যে-নাটক আমাদের আত্মার এক আশ্চর্য্য অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মহাদেশ হবে সে-নাটক কই? আমরা অনেকদিন ধ'রে নিজেদের দেহ-মন মার্জনা ক'রে সেই মহৎ আধুনিক নাটকের জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'তে এসেছি। আমরাও কেন বলি যে, নাটক নেই?

অনেকে বলেন যে প্রকাশকেরা নাটক নেয় না, তাই ভালো নাটক লেখা হয় না। এটা বোধহয় আদ্যোপান্ত ভুল। প্রকাশকরা উদাস হওয়া সত্ত্বেও বাঙলা কবিতা তো নতুন হ'তে বাধা পায়নি। যাঁদের নাটক লেখা আত্মপ্রকাশের তাগিদে নয়, কেবল প্রকাশকের রৌপ্যতাগিদে তাঁরা যে নাটক লেখেননি সেটা ভালোই হয়েছে। সে-রকম বহু লোক উপন্যাসের বাজারে আছেন, তাতে কমলবনের সৌরভ বাড়ে না।

চেখভ একস্থলে বলেছেন যে, লেখাটাকে পেশা করা উচিত নয়, তাতে নেশাটা ব্যবসার চাপে অন্তর্হিত হয়, ওটাকে গোপন প্রেমের মতোই রাখা চাই, যেখানে খালি দেওয়ার সম্পর্ক, নেওয়ার নয়।

তাঁর কথা সম্পূর্ণভাবে মেনে না-নিলেও এ-কথাটা নিশ্চিন্তমান্য যে, যে নাটক লিখবে সে লিখবেই, তার লেখার জোরেই প্রকাশক জন্মাবে. প্রকাশক জন্মে উৎসাহ দিলে তবে সাহিত্যসৃষ্টি শুরু হয় না। কিন্তু এই বা কী কথা যে স্বকীয় শিল্পসাধনার জন্য অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যদি মানুষ তৈরী থাকে কৃচ্ছ্র বরণ করতে তাহ'লে তেমন লোকের অভাবই বা কেন ঘটে নাট্যসাহিত্যের বেলায়?

কেউ কেউ বলেন যে নাটক পড়বার মতো কল্পনাশক্তি খুব কম লোকেরই থাকে, বেশীরভাগ লোককে ব'লে ব'লে বুঝিয়ে দিতে হয়। এ-কথাও যথার্থ

নয়। কারণ, আমি ছোটোবেলাতেই বহু লোককে নাটক পড়তে দেখেছি। কিন্তু সেটা ছেড়ে দিয়েও বলা যায় যে, তাহ'লে নাটকে না-হয় ব্র্যাকেটের সংখ্যা কিছু বাড়িয়ে দিন, লোকে উপন্যাসের মতো বুঝে যাবে। বই বেচবার জন্য এ-চেষ্টাও আধুনিক এক-আধজন নাট্যকার শুরু করেছেন ; দেখা যাক, তার দ্বারাই গৌরব করার মতো নাট্যসাহিত্য জন্মায় যদি !

কেউ কেউ বলেন, থিয়েটারে নেয় না ব'লে। বাজে কথা। পেশাদারী থিয়েটার ছাড়া একটা সংস্কৃতমনা থিয়েটারের ইচ্ছা বহুদিন ধ'রে এই জাতের মধ্যে ছিলো। যার ফলে শিশিরবাবুর প্রাথমিক লোকপ্রিয়তা সম্ভব হয়েছিলো। এবং তাঁর শিল্পীজীবনে গ্রহণ লাগার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নতুন থিয়েটারের আকাঙ্ক্ষা সুরুচিসম্পন্ন লোকের মধ্যে এসেছিলো। সুতরাং নাট্যকার থাকলেই তার আশে পাশে একটি দুটি ক'রে লোক জ'মে সে-নাটক অভিনীত হ'তো। হয়তো একেবারেই পেশাদারী থিয়েটারে হ'তো না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক যদি ২০।২৫ বৎসর অপেক্ষা করতে পারে অভিনীত হওয়ার জন্যে, তাঁদের আরো কম অপেক্ষা করতে হ'তো, কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো সমসাময়িক বর্তমানকে অতিক্রম ক'রে যাবার ক্ষমতা কম লোকেরই এ-যাবৎ দেখা গেছে।

যাই হোক্, নাট্যসাহিত্য কেন জন্মাচ্ছে না এর উত্তর খুঁজতে খুঁজতে একটা কথা মনে হয়েছে। ইংরেজ আমলের থেকে বাঙলা সংস্কৃতির দুটি ধারা। একটি, দেশের লোকের ক্ষুদ্র বোধশক্তির আয়ত্তের বাইরে অত্যন্ত সংস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ; অপরটি, সাধারণ বোধশক্তির পরিমাপেই মোটা ও মেঠো। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে যে বাঙলা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বাঁচিয়ে রেখে জাতির জীবনে অপরিহার্য ক'রে তোলবার দায়িত্ব যিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি শ্রী গিরীশচন্দ্র। কেবল অভিনেতা হিসাবে যে অকল্পনীয় সাফল্য তিনি লাভ করতে পারতেন তাকে তিনি বিসর্জন দিয়ে নাট্যকার হলেন। এবং আত্মপ্রকাশের জন্য যে-ধরনের নাটক তাঁর লেখবার ইচ্ছা ছিলো, তাকে বিসর্জন দিয়ে মোটা দাগের নাটক লিখেছেন কেবল তদানীন্তন থিয়েটারের দর্শককে বোঝাবার জন্যে, থিয়েটারকে কোনোরকমে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে। এর কষ্ট তাঁর অনেক প্রবন্ধে দেখা যায়।

অপরদিকে ঠাকুরবাড়িতে ক্রমশ এক নাট্যকার বেড়ে উঠতে লাগলেন, যাঁর

কেবলমাত্র লোকপ্রিয় হবার তাগিদ ছিলো না। কিন্তু এ দুটো চেষ্টা মিললো না।

এর পরে বাঙলা থিয়েটারে নাট্যকাররা পারিতোষিক পেয়েছেন কেবলমাত্র নাটকের পপুল্যারিটির জোরে, সাহিত্য হ'য়ে ওঠার জোরে নয়। এবং অন্যান্য সাহিত্যিক সাহিত্যচর্চা করেছেন পপুল্যারিটির উদ্দেশ্যে নয়, সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এবং সে-সাহিত্যের মান সৃষ্টি হ'তো শিল্পবোধসম্পন্ন লোকের দাবিতে, জনসাধারণের হাততালিতে নয়। সে-সব স্রষ্টার মনের পিছনে তাই জনগণ ছিলো না, ছিলো সাহিত্যের এক ধারাবাহিক মূল্যবিচার।

কিন্তু নাট্যকারদেব চোখের সামনে ক্রমশই বড়ো হ'য়ে উঠতে লাগলো দর্শকদের জনস্রোত। যারা যেখানে সেখানে পানের পিক ফ্যালে, অভিনয় দেখতে দেখতে সশব্দে চা বা লেমনেড খায়, যারা সেন্টিমেন্টাল ব্যাপারে হাপুস নয়নে কাঁদে, এবং ভাঁড়ামি দেখলে হেসে কুটিকুটি হয়। সাহিত্যিক মূল্যবিচার, নাটকের মাধ্যমে জীবনকে প্রকাশ করা, তার সমালোচনা করা, জীবনের অন্তর্লীন সত্যকে উপলব্ধি করা ও করানো, এ-সব কথা কাজে কাজেই বড়ো অবান্তর হ'য়ে যায় এ-পরিবেশে। এখানে মেয়েরাও যেমন সোনা পরে, পুরুষরাও তেমনি। সোনার বোতাম, সোনার আংটি, সোনার হাতঘড়ি। এই নির্বীর্য গড্ডলিকাকে সামনে দেখলে নচিকেতাও তাঁর আহ্বান ভুলে যেতেন। মধ্যবিত্ত বাঙালী নাট্যকাব যে জাতিভ্রষ্ট হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

অন্যান্য সাহিত্যিক থেকে নাট্যকারের একটা বিশেষ তফাৎ আছে, তাকে সব সময়ে দর্শকদের মনে রাখতে হয়, এই ব'লে যে একটা কথা চালু করা হয়েছিলো সেটা আসলে ভুল কথা। কোনো গল্পকার কি তাঁর পাঠককে ভুলে গিয়ে গল্প লেখেন? ঐযে মনে রাখার ওপর অযথা পেশাদারী ঝোঁক দেওয়া হ'তে লাগলো ওরই ফলে নাটক আর সাহিত্য হ'লো না।

তারপর ক্রমশ দিন পালটাতে থাকলো। যুদ্ধের মধ্যে লেখকরাও দেখলেন যে ব্যবসাটা মন্দ না, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে বেশ দু-পয়সা আসে। তখন থেকে বহু লেখকের মধ্যেই সস্তা পপুল্যারিটির স্পৃহা ডালপালা মেলে উঠলো।

আজকে জনগণের কথা সকল সাহিত্যিকের সামনেই এসে গেছে।

রাজনৈতিক ঘটনায়। কিন্তু ব্যবসায়িক কামনায় তার অর্থ ঘুলিয়ে গেছে বহু ক্ষেত্রেই। অপরিস্ফুট যে-জীবন ভবিষ্যতের মধ্যে প্রকাশ পাবার চেষ্টা করছে, সেই জনগণ, বা সেই জীবনের moral values প্রকাশ করার নামই জনগণের সাহিত্য বা প্রগতিসাহিত্য। কেবলমাত্র বহু সংখ্যক লোকের সন্তুষ্টি বিধানই যদি কোনো লক্ষণ হয় তাহ'লে বোম্বের 'নাগিন' ছবি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তি। এর পপুল্যারিটির পাশে কালিদাস ভবভূতি থেকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পর্যন্ত যেন খদ্যোৎ।

এ-কথাটা ঠাট্টা ক'রে আমরা অনেকেই অনেক আসরে বলতে পারি, কিন্তু মনের মধ্যে এটাকে সত্যিই ঠাট্টা ব'লে উড়িয়ে দেবার হিম্মৎ খুব কম লোকের দেখেছি। আর তাই, আজকাল সাহিত্যিকরা ফিল্মে গল্প বেচবার জন্যে কী উন্মুখ, তার জন্যে যে-কোনো মোটা দাগের দৃশ্য লিখে দিতে তাঁদের বাধে না। এবং সেই জন্যেই তাঁরা নাটক লেখেন না, কারণ আমরা – নাটকের লোকেরা — আর ক'পয়সাই বা দেবো।

যদি-বা কেউ লেখেন তো তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে কী নিরঙ্কুশ অহঙ্কার! কেবল তাঁর ভয় হয় অভিনেতা বা পরিচালকে নিশ্চয়ই তাঁর সৃষ্টির সর্বনাশ ক'রে দেবে। একটা কথা কোথাও কাটতে চাওয়া বা বদলাতে চাওয়া যেন প্রথমেই মনে হয় ধৃষ্টতার মতো। অথচ সেই সমস্ত লোক কেনা মোসাহেবের মতো ফিল্মের প্রোডিউসারের সামনে টেনে টেনে হাসেন, আর যথা আজ্ঞা লেখেন।

সুতরাং এঁরা লিখলে আর নাটক সাহিত্য হয় কী ক'রে?

অর্থাৎ আমাদের আন্দাজে দর্শকদের সঙ্গে (যাঁদের 'আই. কিউ' খুব বেশী নয়) তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হবার ধাক্কাতেই এই গণ্ডগোলটা ঘটেছে। গল্প শুনেছি, এক সোভিয়েট সাহিত্যিক এক শহরের গল্প লিখে সেই শহরের মজুরদের পাণ্ডুলিপিটা প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। পড়তে পড়তে তিনি একটা রাস্তাকে কর্দমাক্ত ব'লে বর্ণনা করেন। একজন মজুর উঠে জিজ্ঞাসা করে — "কমরেড, এ-বই ছাপা হবে কতো দিন বাদে?" লেখক একটা সময়ের আন্দাজ দেন। তাতে মজুরটি বলে, ততো দিনে এ-রাস্তা বাঁধানো হ'য়ে যাবে, অতএব এ-বিবরণ লেখাটা তো ঠিক হবে না।

ঠিক এই বিপদই ঘটে নাট্যকারদের। অনেকের মধ্যে যে একজন আছেন, সেই অন্তর্লীন ব্যক্তিত্বকে আনন্দ দেবার, উদ্বুদ্ধ করবার কথাটা গুলিয়ে যায়, বড়ো হ'য়ে ওঠে চোখের সামনে বিশেষ ব্যক্তিগুলো। তাই আজ ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান শহরে যে-ক'টি সীরিয়াস নাট্যপ্রতিষ্ঠান আছে তা গ'ড়ে উঠেছে, অভিনেতাদের কেন্দ্র ক'রে, তাদেরই কষ্টে এবং শ্রমে। আধুনিকযুগের নাট্যকার, যিনি ঐ অভিনেতাগুলোর মতোই উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ও উন্মাদ, তাঁকে আজও ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।

বাঘ নিয়ে যে খেলবে, সে যদি সতর্ক না হয়, তাহ'লে সে বাঘেরই ভক্ষ্য হবে। এমন অনেক ভক্ষ্য ইতিহাসে দেখা গেছে, খেলেছেন ক'জন ?

১৯৬৪

নাট্যদলের সমস্যা

প্রথমত, কয়েকজন লোকে মিলে ভালো ক'রে নাটক করবার উদ্দেশ্যে একটা জোট বাঁধা।

দ্বিতীয়ত, নাটক জোগাড় করা ও সেটাকে তৈরী করা।

দল না-হয় গড়া গেলো, নাটকও এক আধটা না হয় পাওয়া গেলো, কিন্তু করা হবে কি ক'রে? টাকা কই, প্রেক্ষাগৃহ কোথায়?

সে-বাধাও আমরা ভাঙতে পারতাম। ধরুন, যদি মাঠেই করতাম ত্রিপলের ছাউনি দিয়ে। লোকের শ্রদ্ধা থাকলে তাতেও যেতো লোকে, আমাদের আন্দোলন আরো জোরদার হ'তো। কিন্তু গোল বেঁধেছে সেখানে।

হঠাৎ অত্যন্ত ভালো জিনিস একটা সৃষ্টি হ'তে পারে না, যদি-না তার জন্যে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। তার জন্যে অনেক খাটুনি, অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। শিল্প জীবনমুখী, এবং ঠিক সেই কারণেই জীবন নির্ভর। দেশের হাওয়ায় যখন একটা আন্দোলনের ঢেউ ওঠে, বেশীরভাগ মানুষই যখন সেই কেন্দ্রে জমাট বাঁধে তখনই শিল্পীর সুদিন। যেমন বিপ্লব নিয়ে রাশিয়ার নাট্যশিল্পের নবপর্যায়ের শুরু, প্রতিরোধ আন্দোলন নিয়ে ফ্রান্সের শিল্পের অপার জনপ্রিয়তা। আমাদের দেশেও শেষ পেয়েছি আমরা পঞ্চাশের মন্বন্তরের আন্দোলনে। এই সমস্ত আন্দোলন নিয়ে শিল্পী যতোই উচ্চস্তরের কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়েছে ততোই লোকে বেশী আনন্দ পেয়েছে। Content আর form-এ মিল ঘটিয়েছে ইতিহাস, formalist হ'তে দেয়নি।

কিন্তু আজকের অবস্থা? ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে গেছে আমাদের জাতির মানসপটভূমিকা। আমরা সবাই দিশে হারা অধঃপতনের পথে হু হু ক'রে নেমে এসেছি। আমাদের চিন্তার বিন্যাস নেই, আবেগের ভদ্রতা নেই। কর্মহীন পরচর্চা আর নিঃসহায় দৈববিশ্বাসের আবর্তে আমরা তলিয়ে যাচ্ছি।

আমরা শহরে অভিনয় করি। শহরের দর্শকশ্রেণীর সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। এখানকার নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যেই আমাদের প্রচার। মজুরদের

কথা অবশ্য সময়ে সময়ে আস্ফালন ক'রে বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা আস্ফালন মাত্র, সত্যিকার কাজ কিছু হয়নি। হ'লে আমরাই বর্তে যেতাম এবং সেই নেতৃত্বকে মাথায় ক'রে নিজেদের বলবৃদ্ধি করতে পারতাম। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখি, আমাদের সকলেরই ভিড় মধ্যবিত্ত পাড়ায়। এই মধ্য-বিত্তদের অনেকেই কেরানী, বা কেরানী-মনোভাবাপন্ন। যে-মধ্যবিত্ত একদিন নতুন সভ্যতা এনেছে, দিকে দিকে নিজের বল প্রসার করেছে, এরা তারা নয়। Hyperion to a satyr এদের 'কলোনির কেরানী রক্তে' তো দেখি আর কোনো দোলা লাগে না এক হুজুগ ছাড়া। আমরা হুজুগে মেতে দারুন বিপ্লবী হ'য়ে উঠতে পারি হঠাৎ, প্রাণ দিতে পারি পুলিসের গুলিতে। দিয়েছেও কতোজনে। কিন্তু যেখানে সংগ্রাম চলে বহুদিন ধ'রে — মরণপণ অবিরত সংগ্রাম — সেখানে এই মধ্যবিত্ত অত্যন্ত অবিশ্বস্ত, ভঙ্গুর।

বহুদিন পূর্বে, '৪৭ সালে (সেটাও আজ অনেক দূর ব'লে মনে হয়) একটা গল্প শুনেছিলাম। হায়দারাবাদের কৃষকেরা নিজাম ও রাজকারদের বিরুদ্ধে কিছু জায়গায় লড়াই শুরু করেছে। এক নাগপুরের মধ্যবিত্তের সঙ্গে দেখা হয়েছে এক খোঁড়া হায়দারাবাদী চাষীর। তার পা-টি নিজামের দলের লোকের গুলিতে উড়ে গেছে। খুব সহানুভূতি দেখিয়ে মধ্যবিত্ত জিজ্ঞাসা করলো -- 'আর কতোদিন লাগবে ঐ সব অত্যাচারীদের তাড়াতে ?'

চাষী খুব গম্ভীরভাবে বিবেচনা ক'রে বল্লে — 'ধরো দশ বছর।'

শুনে মধ্যবিত্ত চম্‌কে গেলো — 'দশ বছর! দশ বছর ধ'রে তোমাদের এইরকম অমানুষিকভাবে লড়তে হবে ?'

চাষী অবাক। তাকিয়ে বল্লে — 'তা হবে না ? কতো হাজার বছর ধ'রে এরা জাঁকিয়ে ব'সে আছে বলো তো ? সেই তুলনায় দশটা বছর কি এমন বেশি হ'লো ?'

এই হ'লো তফাৎ, লড়ুয়ে আর কেরানীতে: আমাদের জীবনবোধ frustration-এর ভিত্তিতে। আমাদের সাংসারিক, সামাজিক ও অর্থোপার্জনিক জগতে প্রতি মুহূর্তে নীতিজ্ঞান ও বাস্তবে সংঘর্ষ লাগছে, আমরা আত্মসম্মান হারাচ্ছি এবং তার ওপরে গ'ড়ে তুলছি আমাদের জীবনবেদ — terrorism-এর cult-এ। প্রত্যেক মধ্যবিত্তকে আঁচড়ালেই এই জীবনবেদ বেরিয়ে আসবে। 'একটা বিপুল বিস্ফোরণের মুহূর্তে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে

সার্থক হওয়া', 'আশি মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে দিয়ে crash করা', 'নায়গ্রা প্রপাতের সঙ্গে লাফিয়ে পড়া' — এইসব হচ্ছে frustration-এর জীবনবেদ। এর হাত থেকে এড়াতে গেলে সচেতন সংগ্রাম চাই নিজের মধ্যে। প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম। কারণ এই বেদ (প্রগতির ভেক নিয়েও) বলে যে, আমাদের জীবন গ্লানিতে ক্লিষ্ট। আমরা বাঁচি কেবল মুহূর্তে এবং সার্থকতার সংজ্ঞা হ'লো একটা বিপ্লবী মুহূর্তে একটা অতিবিপ্লবী ভঙ্গীতে খান্ খান্ হ'য়ে ভেঙে যাওয়া। — একটা melodramatic ভঙ্গী। জীবন নিয়ে থিয়েটারি করবার একটা করুণাস্পদ প্রচেষ্টা। বিপ্লবের জন্যে বাঁচা নয়, বিপ্লবের জন্যে মরাটাই যেন আদর্শ হ'য়ে দাঁড়ায়।

এবং এই অস্বাভাবিক আদর্শ পাইকারীভাবে অনুসরণ করবার লোকও আবার অনেক সময়ে পাওয়া যায় না, তাই যতো মিথ্যাচার, যতো cynicism এসে আমাদের মধ্যে শিকড় গাড়ে। এ-ঘটনা হয়েছে অতীতে, আমাদের দেশেই হয়েছে। দেশোদ্ধারের জন্য terrorist হবার পর অশক্ত লোকগুলো ভেঙে তছনছ হ'য়ে গেছে। অনেকে তো এখন যতোপ্রকার রাজনৈতিক দলাদলি, আর কালোবাজারী মুনাফার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। অথচ একদিন তাঁরা অনেকের চাইতে ভালো ছিলেন ব'লেই সন্ত্রাসবাদী হয়েছিলেন। এমনি হয়। এবং আজকের দিনেও যে terrorism করবে — তা সে যতো বড়ো নামেই করুক-না কেন — তার ফল তাকেও ভোগ করতে হবে অবনতির পাঁকে নেমে।

এতো কথা উঠে পড়েছে এই কারণে যে, এই মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারাই একটু প্রাগ্রসর বা একটু রাজনীতিক জ্ঞানসম্পন্ন তাদের বেশীরভাগই আজ বিপ্লবের অজুহাতে sensationalism করেন, যার থেকে আসে পরিপন্থী জীবনবোধ। এবং এঁদের পশ্চাদবর্তী যে বাকি মধ্যবিত্ত সমাজ, তাঁরা আজ নৈরাশ্যবোধে অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ। এবং এঁরাই হলেন আমাদের দর্শক সমাজ। এঁদের ভিতর থেকেই আসে আমাদের শিল্পীবৃন্দ, আমাদের নতুন নাট্যকার। তাই আমাদের চিন্তাটাই থাকে সস্তায় কিস্তি মারার, খেটে চরিত্র সৃষ্টি বা সংঘাত সৃষ্টি করার নয়। এবং তাতে সাময়িক কাজও যে না-হয় তা নয়। শহুরে মধ্যবিত্ত দর্শকের দল যেন লঙ্কার ঝাল খেয়ে চান্‌কে ওঠে। যতো সমস্ত আপাতবিপ্লবী বুলি আপ্তবাক্যের মতো

কপ্‌চানো হয়। যতো অভদ্র ভাষায় কপ্‌চানো হয় -- ততোই জোর হাততালি পড়ে। কিন্তু সে-শিল্প সংস্পর্শে দর্শকের মন উন্নত হয় না, লড়াই করবার জন্য নৈতিক জোর আসে না বুকে, ক্রোধ আসে না, আসে কেঁউচেমি।

এবং এ ছাড়া রাজনীতিক নেতা নামধারী বহু ক্ষুদে পয়গম্বর আছেন বাজারে। তাঁরা ব'সে ব'সে এই নোংরামি উস্কিয়েছেন অনেক দিন, এখনও ওস্কাচ্ছেন। ঐতিহ্য সম্পর্কে বোধ বা শ্রদ্ধা ভেঙে তারা মানুষগুলোর আত্মসম্মানবোধ নষ্ট ক'রে দিয়েছে পাইকারীভাবে। অথচ ঐতিহ্যবিহীন শিল্প নেই। কতো হাজার বৎসর ধ'রে তিলে তিলে আমাদের সমাজ তার ভাষা তৈরী করেছে, তার পটুয়ার অঙ্কনরীতি ঠিক করেছে, তার গানের সুরে বৈশিষ্ট্য এনেছে। কতো বিবাদী-সম্বাদী ধারা এসে আজকের দিনের বাঙলা শিল্পের প্যাটার্ণ তৈরী হয়েছে, তার ইমারৎ গ'ড়ে উঠেছে। সেইখানে ঢুকে সমালোচনার নামে কেউ যদি ভিতে ঘা মারতে থাকে তাহ'লে শিল্পবোধের মাপকাঠি গুলিয়ে যায়। গেছেও তা।

এবং এইরকম যখন অবস্থা তখন সত্যিই যদি কেউ ভালো নাটক একটা করতে পারেন সে-দল কি সমাদৃত হবে? ভয় হয়, বোধ হয় না। কিন্তু সেটা তো তর্কের বিষয়। সেটা বাদ দিয়ে এটুকু বলা যায় যে, সর্বগুণ সমন্বিত ও সর্বজনপ্রিয় নাটক আমাদের দেশে এক্ষুনি হঠাৎ হ'তে পারে না। আজকের কাজ হচ্ছে চেষ্টার, আপ্রাণ অনুশীলনের, এবং সেই অনুশীলনের উৎসাহদাতা সমালোচক হ'তে পারেন একমাত্র সংস্কৃতমনা ব্যক্তিরা। কারণ আজ যা কাজ হবে দেশ এখনি তার দাম দিতে পারবে না। কিন্তু যাতে দিতে পারে, শিল্পীগুলোকে সামাজিক জীব হিসেবে যাতে সম্পূর্ণ খাটিয়ে নেওয়া যেতে পারে তার দায়িত্ব অনেকাংশে ন্যস্ত রয়েছে সমাজের সৎ অংশের ওপর। "নাট্যামোদী দর্শকসমাজকেও সাহায্য করতে হবে— অর্থ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, ভালোমন্দোর সমালোচনা দিয়ে।" ('অগ্রণী সাহিত্য', ৩য় খণ্ড, ২য় পর্ব) কারণ আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে, বহুকাজ। আমরা সেই কাজ করতে চাই আপ্রাণ খেটে। আমাদের প্রয়োজন শুধু টিঁকে থাকবার মতো সম্বল, আর সহানুভূতিশীল পরামর্শ।

আমাদের বহু বাধা আছে, এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে কেবলমাত্র আমরাই লড়েছি এ-যাবৎ। যেমন, প্রত্যেক নাটক অভিনয় করবার আগে লালবাজার থেকে অনুমতি নিতে হয়। এবং সে-অনুমতিপত্রখানি না-দেখালে কোনো প্রেক্ষাগৃহ আপনি ভাড়া পাবেন না, ঘরোয়া আসরের জন্যেও না। এ-রকম একটা নয়, একশো বাধা আছে আমাদের, এবং তার জন্যে যে-আন্দোলন দরকার সেটা ব্যক্তিস্বাধীনতার আন্দোলন।

এই সমস্ত সাহায্য চাই প্রগতিমনা সংস্কৃতমনা বন্ধুদের কাছ থেকে। অনেক বাজে কথা বকেছি আমরা, অনেক সময় নষ্ট করেছি। এখন একটু কাজ হোক্। আপ্রাণ চেষ্টা যদি এখনও না শুরু করি সকলে মিলে তাহ'লে অত্যন্ত অভাগা এই বাঙলাদেশ, আমাদের মা।

১৩৫৭

নাট্যসংস্কৃতির সহায়ক কে?

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যেই নাট্য সম্পর্কে একটা নতুন চেতনা, একটা নতুন সৃষ্টির পর্যায় শুরু হয়েছে। এবং এই নতুন উদ্যমের প্রথম ক্ষেত্র ছিলো কলকাতা! এই শহরের নাটমঞ্চের যে-ঐতিহ্য, সাহিত্যের যে-ঐতিহ্য, সমস্ত মিলেই তখনকার শিল্পীদের সাহায্য করেছিলো। বিশেষ ক'রে, তখন বাঙলায় মন্বন্তরের দিন। সমস্ত বাঙালী জাতির নীতিবোধ সেদিন জাগ্রত হ'য়ে দলমত-নির্বিশেষে সকল সাহিত্যিক শিল্পীর কণ্ঠ থেকে ধিক্কার দিয়েছিলো। সেদিন আমাদের সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে এই নৈতিক ক্রোধ আমাদের সকলকে বিধৃত করেছিলো, আমাদের সমাজের বিবেকের ভার ছিলো সাহিত্যিক শিল্পীদের ওপরে। সেদিন বাঙলাদেশের সর্বজনমান্য শিল্পীদের পিছনে বর্তমান লেখকের মতো অখ্যাত শিল্পকর্মীও দু-একজন ছিলো। তখন আমাদের মনে উৎসাহের উৎস ছিলো নৈতিক। আমরা ভেবেছিলাম, ইংরেজ শাসন দুর্নীতির পোষক এবং কিছু সংখ্যক এতদ্দেশীয় তাদের সহায়ক। সুতরাং সেই চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে সমাজে নীতির স্থাপনই আমাদের কাজ। এবং সেই কাজে আমরা সমস্ত বাঙালীরা একই কেন্দ্রবদ্ধ।

তারপর সেই কাজে নেমে কতো ঘটনাই ঘটেছে। কতো অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কতো মিথ্যা কুৎসার প্লাবন বয়েছে, কতো অভুক্ত দিন কেটেছে। তবু কিছু নাট্যকর্মী তাদের প্রাথমিক উৎসাহের সেই নৈতিক উৎসের কথা ভুলে যায়নি। তারা তাদের সামর্থ্যমত কাজ ক'রে গেছে ব'লেই বাঙলাদেশে আজ কয়েক বছর ধ'রে যে বিপুল নাট্যপ্রচেষ্টা চলেছে, সেটা সম্ভব হ'তে পেরেছে।

অবশ্য এ ছাড়া অন্য অনেক বৈষয়িক কারণও ছিলো নাট্যশিল্প প্রসারের। দেশ স্বাধীন হবার পর পঞ্চবার্ষিকী যোজনাগুলি ভুল করতে করতেও সাধারণ অনেকের হাতে কিছু পয়সা বাড়িয়েছে। এখন চাকরিও বোধহয় পূর্বাপেক্ষা সহজলভ্য হয়েছে। আবার বড়ো চাকরির ক্ষেত্রে আজকাল দেশে বিলেতি জজ নেই, রাইটার্স বিল্ডিং-এ সেক্রেটারিরা এদেশী, বিদেশে অ্যাম্বাসাডার হ'য়ে

যাচ্ছে এদেশী লোকেরা, সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বড়ো চাকরিও অধিকতর অধিগম্য। তাছাড়া ব্যবসাপত্রও অধিকতর মুনাফাপ্রদায়ী। যেমন বলা যায়, দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে সংবাদপত্রের কতো ক'টি বিক্রি ছিলো আর আজ কী বিক্রি। — এর ওপরে সরকারী তহবিল থেকে নাট্যোন্নয়নের নামে এক দান-সত্র খোলা হ'লো। ফলে, এইরকম নানাপ্রকার বৈষয়িক উন্নতির কারণে নাট্যপ্রচেষ্টা দেশের নানা অংশে প্রসারিত হবার একটা সুযোগ পেলো। তার ফলে, আবার ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চের বিক্রির পরিমাণও অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেলো। প্রচুর সংখ্যক অভিনেত্রীরা নানান সংস্থায় ভাড়া খেটে জীবিকা অর্জনের সুবিধাও পেলেন। তাই নাট্য আন্দোলন বা নাট্যসংস্কৃতি যাই নামে বলা হোক্ একে, শুনতে পাই, এর নাকি খুবই উজ্জ্বল অবস্থা।

কিন্তু কিছু লোক যারা প্রায় ষোলো থেকে বিশ বৎসর ধ'রে এই কাজে যুক্ত আছেন, তাঁদের অনেকেই অত্যন্ত আশাহত। তাঁদের মনে হচ্ছে, যেন ক্রমশই একটা অত্যন্ত শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার মধ্যে তাঁরা প'ড়ে যাচ্ছেন।

কেন?

কারণ সেদিনের মতো কোনো নৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে আমাদের সমাজ আজ আর গাঁথা নয়। হ'তে পারতো, দেশ গঠনের কাজে আপামর অনুপ্রাণিত হ'লে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক্ তা হ'লো না। বরঞ্চ পামররাই অনুপ্রাণিত করল সৎ মানুষদের। পদস্খলনের দিকে। তাই আমাদের নৈতিক বিশ্বাস আজ এতো শিথিল যে, উলঙ্গভাবে কোনো দুর্নৈতিক কাজ করতে আর আমাদের কোনো লজ্জা হয় না। আমাদের দপ্তরে দপ্তরে নাকি ঘুঁষ লেনদেনের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে লোয়ার ডিভিসন কেরানী পর্যন্ত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি শক্তিশালী পাপচক্র আছে, যাকে সামলাতে গিয়ে উপচার্যরা নাকি ব্যর্থ হন। আমাদের করপোরেশনে নাকি তাই আছে।

কিন্তু কেন আছে? কার কাজ সমাজের এই ব্যাধিকে নিরাময় করা? মাঝে মাঝে পণ্ডিত লোকেরা সংবাদপত্রের পাতায় অপেশাদারী নাট্যসংস্থার মহান আদর্শ সম্পর্কে গুরুজনসুলভ উপদেশবাণী বর্ষণ ক'রে থাকেন। কিন্তু কোনো সংস্থা যদি সরকারী কর্মচারীদের কোনো সমালোচনা করে, তাহ'লে

সরকারী কর্মচারীরাই সে-অভিনয় বন্ধ ক'রে দিতে পারেন এবং করেন। অপেশাদারী সংস্থা যদি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে চায়, তাহ'লে ব্যবসায়িকদের সমান হারে (এবং অনিয়মিত ব'লে অনেক সময়ে বেশী হারে) মূল্য দিতে হয়। নাট্য সমালোচনার সময়ে ব্যবসায়িক কারণেই ব্যবসায়িক মঞ্চগুলো সম্পর্কে সংবাদপত্রে বিস্তৃততর জায়গা দেওয়া হয়। এবং ঐ এক কারণেই ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রশংসার লাইন অনুসরণ করা হয়। এবং অব্যবসায়িক সংস্থা সম্পর্কে স্বল্প-জায়গায় পিঠ চাপড়ানো হয়। আজও পর্যন্ত কেবলমাত্র 'এন্টারটেনমেণ্ট' ছাড়া অন্য ধরনের নাট্য প্রযোজনার কোনো মঞ্চ স্থাপিত হ'লো না দেশে, যেখানে শিল্পের প্রতি লক্ষ্য রেখে নাট্যপ্রয়োগ অব্যাহতভাবে চলতে পারে।

অর্থাৎ ভালো নাট্যাভিনয় করতে যদি কেউ চেষ্টাও করে, তাহ'লে তার পৃষ্ঠপোষক কারা হবে ?

কেবলমাত্র সাধারণ দর্শকের ওপর নির্ভর করলে আমাদের দেশে এখনো ঘটনাটা ব্যবসায়িক হ'তেই বাধ্য। কারণ সাধারণ দর্শক বার বার প্রমাণ করছে যে, কী ধরনের জিনিস তারা বিপুলসংখ্যায় দেখতে যায়। সেই হিসাবে তো এক ধরনের হিন্দি ছবি ভারতবর্ষের সর্বাধিক জনসমর্থিত। কিন্তু অর্থনীতিতে যেমন বলে যে, Bad money drives away good money তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রেও কি ব্যবসায়িক এন্টারটেনমেণ্ট শিল্পপ্রচেষ্টাকে কোণ-ঠাসা ক'রে দেবে না ?

আমরা ইণ্ডাস্ট্রিকে বাঁচাবার জন্যে বিধিনিষেধ আরোপ করি, চাকরির ক্ষেত্রে কোটা করি, আর শিল্প জিনিসটার সম্বন্ধে আমাদের এতোই শ্রদ্ধা যে এর বিশেষ পোষকতার আমরা কোনো প্রয়োজনই অনুভব করি না।

কেউ কেউ বলেন, কেন, সরকার টাকা দেবে।

কিন্তু সকল বিষয়েই সরকারের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকা যে জাতির শিল্পচর্চার প্রকৃষ্ট পন্থা নয় সে-কথা ছেড়ে দিয়েও অন্য কথা আছে। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বর্তমান লেখকের জীবনে একটি ঘটনা ঘটে। সেই কাহিনীটাই বলা যাক।

আকাশবাণী এই লেখককে আধুনিক ভারতীয় থিয়েটার সম্পর্কে ইংরাজিতে একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন। আকাশবাণীর নিয়ম

অনুযায়ী বক্তৃতাটি পূর্বাহ্নে লিখে মাইকের সামনে পড়তে হয়। (প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি উন্মাদ ব্যবস্থার কথা বর্ণনা করা যায়। অভিনেতা হিসাবে অপরের লেখা কথা যদি আমি রেডিয়োর মাইকের সামনে পড়ি, তাহ'লে আকাশবাণী আমাকে যে-অর্থ দিয়ে থাকেন তার প্রায় অর্ধেক অর্থ দেন যদি আমাকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কোনো প্রবন্ধ নিজে লিখে তারপরে সেটাই পড়তে হয়। অর্থাৎ এ-ধরনের বিশেষ আলোচনাকারীদের চেয়ে সাধারণভাবে অভিনেতাদের গ্রেড আকাশবাণীতে বেশী। এ-নীতি আকাশবাণী নিশ্চয়ই সমাজগঠনের পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত করেছেন।)

যেদিন সেই বক্তৃতা রেকর্ড করবার কথা সেদিন লেখাটা পড়ে আকাশবাণীর কিছু কর্তাব্যক্তি একটু আপত্তি জানালেন। লেখাটায় প্রসঙ্গ-ক্রমে ছিলো যে, 'our country has been left impoverished by the blood-sucking imperialist machinery.' আপত্তি বিশেষ ক'রে blood-sucking কথাটায়। যদিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা কথাটার সঙ্গে একমত ব'লে স্বীকার করলেন, তবু নাকি ইংরেজদের সম্পর্কে এ-কথা আকাশবাণীতে বলা যায় না। এমন-কি প্যাট্রিক ডীনের বক্তৃতার পরেও নয়। ফলে লেখক তাঁর লেখাটি পকেটে ভ'রে চ'লে এলো। সামান্য একটা কথা কেটে দেওয়ায় লেখকের অনিচ্ছা নয়, সমস্ত ঘটনাটায় যতো কথা উঠে পড়লো তার অযৌক্তিকতাতেই লেখকের আগ্রহ চ'লে গেলো।

এই তো সরকারী ব্যবস্থার নমুনা। তা ছাড়া সরকারপক্ষ বা বিরোধী-পক্ষ এঁরা করপোরেশনেও আছেন, অ্যাসেম্বলিতেও আছেন। সেখানে এঁদের চটি ছোঁড়াছুঁড়ি বা ডিম ছোঁড়াছুঁড়ির পারদর্শিতা ও মাতৃভাষার ব্যবহারের ধরন কি রাজনীতিতে কোনো আস্থা আনার পক্ষে সহায়ক?

এঁরা নিজ নিজ দলের প্রচার-সুবিধার্থে কিছু কিছু শিল্পীসাহিত্যিককে পোষণ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাতে কি শিল্পকলার পোষণ অপেক্ষা পেষণের সম্ভাবনাই অধিক নয়? তা ছাড়া এই সমস্ত রাজনৈতিক দলের ও তৎসংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রসমূহের যতোই ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ততোই তাঁরা একটা জিনিস কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না যে, কোনো লোকের নিজস্ব কোনো দৃষ্টি-ভঙ্গী বা নিজস্ব কোনো মতামত থাকতে পারে। আজ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক নেতা নিজের ভুল স্বীকার করেছেন ব'লে জানি না। (এক

মহাত্মা গান্ধী ছাড়া, কিন্তু তাঁর কথা আলাদা।) তেমনি আজ পর্যন্ত কোনো সংবাদপত্রের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হ'য়ে কেউ জিততে পেরেছে ব'লে জানি না। অথচ শিল্পী মানেই সেই লোক যার একটা নিজস্ব বোধ আছে, নিজস্ব মতামত আছে। সুতরাং তার বাঁচবার পথ কোথায়? আর সকলের পক্ষে চাকরি, কিন্তু অব্যবসায়িক কোনো সৎ নাট্যপ্রচেষ্টার কর্মীদের পক্ষে রোজগার তো করতে হয় অন্যত্র, এটা শুধু প্রেমের পরিশ্রম। তার ওপর প্রতিটি পদক্ষেপে এতে বিঘ্ন। সস্তায় প্রেক্ষাগৃহ পায় না, সস্তায় বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। এইসব প্রাণান্তিক ব্যাপারে দেশের কোনো সুচিন্তিত পোষকতা নেই। জীবনের অন্যান্য 'ইন্‌স্টিটিউশন' থেকে সমাজের নৈতিক মান উন্নত করার কোনো আদর্শ নেই। অথচ নাট্যসংস্কৃতির সম্পর্কে গুরুগম্ভীর নিবন্ধ রচনা করতে বসি। তখন নিজের কাছেই নিজেকে বড়ো হাস্যকর ব'লে মনে হয়।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে, স্বাধীনতার ফলে অর্থার্জনের নানান পথ নানান দিকে খুলে গেছে, তারই লোভে আবহাওয়াটা ঘুলিয়ে উঠেছে। কিছু দিন যাক, তখন ভাগাভাগির পর অবস্থাটা মোটামুটি শান্ত হবে।

হয়তো হবে। কিন্তু এইটাই তো আমাদের দেশের রূপগঠক সময়। এই তরল অবস্থার মধ্যে আমরা যে-ছাঁচ ব্যবহার করবো, সেই সামাজিক গঠনের মধ্যেই তো আমাদের সন্ততিদের বাঁচতে হবে। সুতরাং একদিন মোটামুটি শান্ত হবে মনে ক'রে কি অনুদ্বিগ্ন মনে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব!

আমরা তো জানি যে কত ভদ্র ও উৎসাহী লোক আছে এই দেশে। কিন্তু এই যে কতকগুলো বিপুলায়তন সংগঠন নিজেদের ভারের বেগে ছুটে চলেছে, এদের চক্রপেষণ থেকে একান্ত মানবকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবে যারা তারা দাঁড়াবার মতো পায়ের নীচে এক চিল্‌তে জমি পাবে তো?

সমগ্র সমাজ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতেই এ-কথা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি আমি। যতো দেরি হবে ততোই হয়তো ক্ষতি বেশী হবে।

১৩৭০

বাঙলা উচ্চারণ

কিছুদিন আগে একদিন দুপুরে হঠাৎ রেডিয়ো খুলে শুনেছিলুম একজন ভদ্রলোক আবহাওয়া সম্পর্কে বলছেন। তিনি বললেন যে, আবহাওয়ার সংবাদে প্রকাশ 'বঙ্গোপ্‌সাগরে ...' ইত্যাদি।

বঙ্গোপসাগর কথাটায় যে প-য়ে হসন্ত দিয়ে 'বঙ্গোপ্‌সাগর করা যায় এটা আগে কখনো শুনিনি। ভাবিওনি।

আর একদিন শুনলুম, মন্ত্রী শ্রী চ্যবন 'লেলিনগ্রাডে ...' ইত্যাদি।

একদিন শিশুদের শিক্ষার আসরে শুনেছি, বক্তা বলছেন 'তৈল্‌-জাতীয় দ্রব্য'।

একটি কলেজে একজন মেয়ে আবৃত্তি করছিলো — 'মৃত্যুরে লব অম্রৎ করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে'।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সঙ্গীতে পাশ-করা গায়িকা (এমনিতেও তিনি বি-এ পাশ) বলছিলেন, 'দ্রুৎ' লয়ে ...' ইত্যাদি! অথচ বাঙলা ভাষায় কেন রাগসঙ্গীত গাওয়া হবে না সে-সম্বন্ধেও উত্তেজিত আলোচনা শুনেছি এঁরই সঙ্গিবর্গের কাছ থেকে!

অবশ্য এমন হ'তে পারে যে, আমি খুবই রক্ষণশীল, খুবই প্রাচীন-পন্থী। কারণ বানান, উচ্চারণ এ-সমস্তই তো যুগে যুগে পাল্টায়। গল্প শুনেছি, কোনো এক ছেলে ইংরেজিতে ভুল বানান লিখে বাবার হাতে কানমলা খেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলেছিলো — বানান আজ আছে কাল নেই, বানান দিয়ে কি ইংরেজি হয়?

সত্যিই তো। শেক্সপীয়রের সময়কার বা তৎপূর্ববর্তী ইংরেজির বানান তো অনেকখানিই ভিন্ন ছিলো। সেইরকম যে-কলকাতায় একদিন 'নেবু, নুচি, আঁব' ইত্যাদি উচ্চারণ চলিত ছিলো সেই কলকাতারই মতো 'বঙ্গোপসাগর', 'তৈলজাতীয়', 'অমৃত' বা 'দ্রুত' উচ্চারণকারী কলকাতাও হয়তো অপসৃয়মান। এখন থেকে হয়তো এইরকম নতুন উচ্চারণই চলিত হবে। তা হোক্। শুধু নতুন চলনের অন্তর্বর্তী

নিয়মটাকে বুঝতে পারছি না ব'লেই আমাদের এতো মুশকিল হচ্ছে। — বলতে গিয়েও, লিখতে গিয়েও!

বুঝতে পারছি না ব'লেই আবার আমাদের মতো কিছু লোকের সন্দেহ হয় যে, এগুলো আসলে কিন্তু উচ্চারণের অপরিচ্ছন্নতা, কোনো নতুন নিয়ম-শৃঙ্খলা এর মধ্যে নেই। যেমন রাস্তা-প্রিয় ছোকরাদের পয়সা কে পয়হা বা বাবাকে বাওয়া বলতে শুনেছি এ-ও সেইরকম।

এর আবার একটা উল্‌টো দিকও তৈরী হয়েছে। যেখানে অস্বাভাবিক একটা উচ্চারণভঙ্গী তৈরী করা হয়েছে নিজেদের বৈদগ্ধ্যের বিজ্ঞাপনের জন্যে। সেখানে র স্থানে ড় বলা হয়, শ, ষ, বা স স্থানে ডবল ডোজের sh বলা হয়, বাঙলা অ এবং আ উভয়েরই স্থানে হিন্দি অ (অর্থাৎ ছোটো আ) বলা হয়। ফলে উচ্চারণটা দাঁড়ায় অনেকটা এইরকম — 'গাগানে গাড়োজে মেগ ঘানা বাড়োshi'। (বাহুল্য ভয়ে এ-কার এবং ও-কারের উচ্চারণভঙ্গীর বিবরণ দেওয়া হ'লো না।)

এমন-কি, একদিন দেখি, চিরকেলে কলকেতিয়া বংশের একটি মেয়ে — যাদের আমরা অলিখিত ভাষায় ঘটি ব'লে থাকি — সে-ও এইরকম উচ্চারণ অভ্যাস করেছে। কি করবে বেচারা। সিনেমায়, রেডিয়োতে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে এই উচ্চারণের যে তর্কাতীত প্রাদুর্ভাব (সুচিত্রা মিত্রের মতো দু-একজন স্মরণীয় ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে)। ফলে ঐ মেয়েটিরও গভীর প্রতীতি জন্মেছে যে, এইটাই হ'লো বাঙলা উচ্চারণের আধুনিকতম বিদগ্ধ ভঙ্গী।

দেশ বিভাগের পর যেমন পৌর প্রতিষ্ঠান ও সরকার সজাগ না-থাকার দরুন এই কলকাতা ও তার শহরতলীগুলোতে পরিকল্পনাবিহীন স্ফীতি ঘটেছে, যার ফলে বে-আইনীভাবে বহু রাস্তা অধিকার ক'রে দোকান ব'সে গেছে, যেখানে বাস চালানো অসুবিধে, ড্রেন বসানো অসুবিধে, অথচ সকলকেই আজ সেই অবস্থা মেনে নিতে হচ্ছে, কারণ সংস্কার করাও বিপুল ব্যয়সাধ্য, — ঠিক সেইরকম বাঁধনহীন এই উচ্চারণ (বিকৃতি না প্রগতি?) উত্তরকালে বোধহয় আমাদের একটু বিপদেই ফেলবে।

একটা ব্যাপার এই নৈরাজ্যের মধ্যে কিন্তু খুবই লক্ষণীয়। কেউ যদি gnat-কে গ্ন্যাট বলে, বা Bengal Bank 'ব্যাঙ্গল বেঙ্ক' উচ্চারণ করে, তাহ'লে বেশীরভাগ বাঙালীরা, আমি দেখেছি, হেসে গড়িয়ে পড়েন। অর্থাৎ মাতৃভাষার উচ্চারণ সম্পর্কে আমরা যতোই শিথিল হই-না কেন, ইংরেজির উচ্চারণ সম্পর্কে কিন্তু আমরা খুবই সজাগ। এর দ্বারাই বোধ হয় আমাদের সামাজিক শ্রেণীবিভাগ হয়। এটা নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা মহৎ ঔদার্যের লক্ষণ।

তাই আমাদের মতো যারা অতো উদার নয়, সেই ইংরেজরা (যাঁরা বর্ধমানকে বার্ডওয়ান ও বারাণসীকে বেনারস ব'লে গেছেন ব'লে আজও আমরা কথোপকথনে তাই ব'লে থাকি), নিজেদের উচ্চারণ সম্পর্কে কিন্তু অত্যন্ত সজাগ। আর তাই তারা নিজেদের ভাষায় উচ্চারণের একটা মান তৈরি করেছে এবং কেবলমাত্র উচ্চারণেরই প্রামাণ্য অভিধানও লিখে থাকে। তাছাড়া কথা কেমন ক'রে বলা হবে সে-সম্বন্ধেও তারা মাথা ঘামিয়েছে অনেকদিন থেকে। (Oxford University Press-এর *Elizabethan Acting* নামক বইটিতে এর অনেক বিবরণ পাওয়া যাবে।)

আমাদেরও এখানকার থিয়েটারে এক সময়ে উচ্চারণ স্পষ্ট করার জন্য অনেক পরিশ্রম করানো হ'তো। আমরাও ছোটোবেলায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে আবৃত্তি করার অনুশীলন করেছি। কিন্তু নাট্যশালার পতনে এমন দশা হয়েছে যে, একজন পুরানো অভিনেতা—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ' — এই কথাটা উচ্চারণ করতে পারলেন না। হয় বলেন শীকৃষ্ণ, না-হয় বলেন শ্রীকিষ্ণ।

আর আধুনিকরা তো বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মনে হয় — কিছু গ্রাহ্যই করেন না। সম্মানকে নিরঙ্কুশভাবেই সন্মান ব'লে যেতে কতোই না শোনা যায়। অথচ এঁরা বেশীরভাগই নতুন ধরনের নাট্য প্রযোজনার আদর্শ নিয়ে দল বেঁধে অভিনয় ক'রে থাকেন। এইটাই মারাত্মক দুঃখের। কারণ তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে, তাঁদের চেষ্টার এই শিথিলতা এমন একটা অপরিচ্ছন্ন চিন্তার পরিবেশ তৈরি করছে, যার ফলে নতুন নাট্য প্রয়াসের কৈশোরেই অন্ত্যেষ্টি সংকারের সূত্রপাত হ'য়ে গেছে।

অবশ্য কাকেই-বা কী বলা যাবে। একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক তিনি আবার কবিও বটে — আমাদের 'বিসর্জন' অভিনয়ের পর মুখে বলেছিলেন এবং কিছুদিন পরে চিঠি লিখেও জানিয়েছিলেন যে, 'ক্রূর' শব্দটির উচ্চারণ অকারান্তই হবে, আমরা হসন্ত দিয়ে ভুল করেছি। বলেছিলেন তৎসম শব্দ মাত্রই অকারান্ত উচ্চারণ হবে। লিখেছিলেন যে "কর্ণকুন্তী সংবাদ"-এ রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ('ক্রূর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে ধিক্কারিল') গ্রামোফোন রেকর্ডে কী আছে সন্ধান করা অফলপ্রসূ হবে না।

হয়ওনি। রবীন্দ্রনাথ হসন্ত দিয়েছেন। যুক্ত শব্দ হওয়া সত্ত্বেও। তাছাড়া সকল ক্ষেত্রে শেষ প্রমাণের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছেই-বা দৌড়িয়ে যেতে হবে কেন? তিনিও মানুষ ছিলেন, তাই গোটাকতক ভুল তিনিও ক'রে থাকতে পারেন। তাই আমাদের চিন্তাচালনার কাজটা আমরা ন্যায় মতো ক'রে গেলেই হয়তো তাঁর প্রতি আমাদের সবচেয়ে বেশী সম্মান দেখানো হবে।

যেমন, ঋ-ফলার কি উচ্চারণ? আমরা অনেকেই ঋ-ফলাযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব ঘটিয়ে ওটাকে র-ফলা উত্তর ইকারান্ত ক'রে উচ্চারণ করি। যেমন, আব্‌ব্রিত্তি, অম্‌ম্রিত।

এতে অনেক ক্ষেত্রে ছন্দেরও মুশকিল হয়। অর্থাৎ 'ম্রিত্যুরে লবো অম্‌ম্রিত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে ...'।

তাছাড়া আরো-একটা প্রশ্ন ওঠে যে, ওটার যদি নিজস্ব কোনো আওয়াজ না-থাকবে তাহ'লে ওটাকে স্বরবর্ণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত রাখা কেন? কেবল অভ্যাসবশে?

আমরা যারা সেকেলে, তারা আবৃত্তির সময়ে মৃত্যু অমৃত কৃষ্ণ ইত্যাদি শব্দগুলোতে ঋ-কে স্বরবর্ণের মতোই উচ্চারণ করি। অন্যান্য ভাষাতেও তাই করা হয়। যেমন মারাঠীতে 'বিশ্রান্তি গৃহ'কে 'গ্রিহ' বলা হয় না। কেবল আমাদের এখানেই 'অভিনেতৃ সংঘ'-এর উচ্চারণ করা হয় অভিনেত্রী সংঘ ব'লে। রাজশেখরবাবু বাঙলায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রতি পক্ষপাত দেখে এক জায়গায় ঠাট্টা করেছেন। কিন্তু বাঙলা-দেশের অভিনেতাদের পক্ষে নিজেদের অভিনেত্রী সঙ্ঘ বলা যেন পক্ষ-পাতের চেয়েও বেশী অর্থ বহন করে।

তাছাড়া আরো-একটি স্বরবর্ণ আছে যার উচ্চারণে আমাদের অনেক বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। সেটি হ'লো — এ। য়েকতা না অ্যাকতা? য়েকত্র না অ্যাকত্র? আজকাল আবার মেয়েদের মুখে অ্যাক্ষুণি শুনি, ছোটোবেলায় এটা শুনিনি। এই স্বরবর্ণটি সম্পর্কেও একটা তদন্ত হওয়া দরকার।

তাই আশা করি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত অধ্যাপকদের দ্বারা উচ্চারণ বিধি সম্পর্কে একটা অনুসন্ধান করাবেন। নইলে ভবিষ্যতে বাঙালীদের হয়তো এর জন্যে কঠিন মূল্য দিতে হবে। অনেক বাঙালীকে তো আমি দেখেছি যাঁরা ইংরেজির ভাবে বাঙলা উচ্চারণ করাটা বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ব'লে মনে করেন। তাঁরা বাঙলা র-কে সেইজন্য সম্পূর্ণ উচ্চারণ করেন না। ফলে তাঁরা কর্ণকে কড়্‌ন বলেন। কিন্তু ইংরেজি একদিন তো যাবেই এবং হিন্দি আসবেই। তখন এই সমস্ত পয়সা ও প্রতিপত্তিকামী লোকেরা টুক ক'রে বদলে গিয়ে 'আরে ইয়ার', 'শুনো ইয়ার' জাতীয় স্ল্যাং হিন্দি ব'লে প্রচুর গৌরব বোধ করবেন, এবং বাঙলাতে হিন্দি ভাষণভঙ্গী আমদানী করবেন। সুতরাং যতো শীঘ্র সম্ভব আমাদের ঘরের খোঁটা শক্ত ক'রে না-পুঁতলে আমরা এইরকম যে-কোনো একটা প্লাবনেই ভেসে যাবো।

গোলমাল আমাদের, বলতে গেলে, স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণ থেকেই। অ-কে যেমন হিন্দি অ-এর মতো উচ্চারণ করা হয়, তেমনি আবার যেখানে সেখানে ও-এর মতোও উচ্চারণ করা হয়। আমার সন্দেহ (অবশ্য ভুল হ'তে পারে) যে, অনেকে ঠোঁটকে বিস্তৃত করা বা চোয়াল খুলে কথা বলাকে আধুনিক ও সভ্য ব'লে মনে করেন না। তাই ঐ বন্ধ চোয়াল অবস্থায় উচ্চারণ করতে গিয়েই অ-গুলো ছোটো আ-এর মতো হ'য়ে যায়, ই-গুলো এ-র মতো হ'য়ে যায়। আবার ও-কার বাড়ালে মিষ্টত্ব বাড়বে মনে ক'রে বোধহয় উচ্চারণ করা হয় — 'গাগোনে গাগোনে আপনার মোনে' (অর্থাৎ 'গগনে গগনে আপনার মনে')। এতে একটা আধো আধো ভাব আসে কিনা।

এটা আরো ব্যাপক অ-কারান্ত শব্দে। এই ধরনের উচ্চারণ পদ্ধতিতে প্রায় সমস্ত অ-কারান্ত শব্দই ও-কারান্তভাবে উচ্চারিত হয়। এরই চরম

উদাহরণ আমি শুনেছিলুম এক 'বড়ো মিষ্টি মিষ্টি' চেহারার ছাত্রের মুখে — নজরুল সাহেবের এক কবিতায় — 'চালো চান্‌চালো বাণীরো দুলালো এcshচেলো পাথো ম্লে, আগো এয়্ গাঙ্গারো কূলে।'

বিদ্রোহী কবি নজরুলের!! — শুনে মনে হয়েছিলো নজরুল সাহেব কি পাগল হবার আগে এইরকম আবৃত্তি শুনেছিলেন? ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যেও এইরকম তদন্তোপযোগী বর্ণ কয়েকটি আছে। পাঠকদের ধৈর্য-চ্যুতি ঘটাতে চাই না ব'লে এক-আধটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন ওষ্ঠ্যবর্ণ-গুলোয় দুটি ঠোঁট ভালো ক'রে মেলানো হয় না। ফলে, ফ-টা বহু ক্ষেত্রেই ইংরেজি f-এর মতো উচ্চারিত হয়। এই দোষ আমারও অনেকদিন ছিলো। শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ী ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন -- তাহ'লে 'বিসর্জন'-এ জয়সিংহ কি বলবে? 'Fool নে মা। Fool নে মা। শুধু Fool নিয়ে হোক্‌ তোর পরিতোষ'?

সেদিন যে-লজ্জা পেয়েছিলুম তা বলবার নয়। প-এর বেলাতেও এইরকম ঠোঁটদুটি যুক্ত না-হওয়ার দরুন উচ্চারণ বিকৃত হয়।

আর স-এর উচ্চারণ নিয়ে গণ্ডগোল তো বহু দিনের। কিন্তু ভয়ঙ্কর বিকৃতির কথা ছেড়ে দিলেও, বেশ কতকগুলো বিভিন্নতার উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন আসতে, নিশ্চিত, কাস্তে। অনেকে শব্দমধ্যবর্তী শ বা স হস্‌যুক্ত হ'লেই তাকে s উচ্চারণ করেন। কিন্তু ষষ্ঠ বলবার সময়ে বিপদে পড়েন, মন খুলে ষস্‌ঠ বলতে পারেন না। আবার যাঁরা মোটামুটি বাঙলা শ-এর উচ্চারণ করেন তাঁরাও কাস্তে বলতে s ছাড়া বলেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অশ্লীল, বিশ্লেষণ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে স হবে, না শ হবে?

কিন্তু বর্ণের কথা অনেক হ'লো। এইবার আর-একটা কথা উল্লেখ করতে চাই সেটা হ'লো ঝোঁকের কথা (accent)। বাঙলা বাক্যে ঝোঁক কিভাবে পড়ে তারও বোধহয় একটা বিধিবিধান লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার হ'য়ে পড়েছে। সেদিন এইধরনের ঝোঁক দেওয়া একটা

অদীক্ষিতদের জন্য সাধারণ লিপিতে দেওয়া হ'লো।—
'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে
ওগো, এই গঙ্গার কূলে।'

ঘোষণা শুনলাম, 'এর পর। দি'ল্লী থেকে। রি'লে করে। শো'নানো হচ্ছে …' ইত্যাদি। প্রত্যেক শব্দের শুরুতেই ঝোঁকগুলো দেওয়া। বেশ একটা ইংরেজি ইংরেজি ভাব হয় বটে।

পুরানো অভিনেতা ছিলেন শ্রী ভূমেন রায়। তাঁর বাঙলা ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান যাই থাক, তার উচ্চারণ ছিলো ভয়ঙ্কর। তিনি থিয়েটারে নাম করেছিলেন রডা, কার্ভালো ইত্যাদি সাহেবী ভূমিকার অভিনয়ে। এবং তাঁর বাচনভঙ্গী ছিলো ঐরকম ভূমিকাগুলোরই উপযুক্ত। তিনিও ঐরকম বেশীর-ভাগ আদ্য অক্ষরেই ঝোঁক দিতেন — র'াজা র'াজা, আমি অ'াসিয়াছে।

এখন দেখি যাত্রার অল্প বয়স্ক অভিনেতাদের ওপর এই বাচনভঙ্গীর বেশ প্রভাব আছে। তাছাড়া কলকাতায় এমন নাট্য প্রতিষ্ঠানও আছে, যাদের বাচনভঙ্গী শুনলে মনে হয় ঐরকম ইংরেজি ঝোঁকের বাঙলা অনুবাদ। হয়তো তাঁরা ভাবেন যে, বাঙলার মরা গাংয়ে এর দ্বারা একটা ওজস্বিতা এনে ফেলা যাচ্ছে। তবে আমরা সকলে প্যাণ্ট পরলেই যে আমাদের মনের জোর বা গায়ের জোর বাড়বে এমন ভরসা করা তো মুশকিল।

যাই হোক্, এইসব ব্যাপারের একটা মীমাংসা হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। অভিনেতাদের পক্ষে তো আবার বেশী ক'রেই প্রয়োজনীয়, কারণ অভিনেতারাই তো সমাজে শুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর বাচনভঙ্গীর মান স্থাপন করবেন। অনেকানেক দেশে তা হ'য়েও এসেছে।

তবে, আমাদের দেশে স্বাধীনতার উপলব্ধিতে আমরা সবাই যেমন নিয়মানুবর্তিতাকে ভাঙছি, তেমনি হয়তো উচ্চারণও স্বাধীনতা পেতে চলেছে। এবার থেকে সব উচ্চারণই হয়তো হবে ব্যক্তিগত উচ্চারণ।

কিংবা দত্ত বাড়ীর সেই ছেলেটির মতো কেউ যদি এসে বলে যে, উচ্চারণ আজ আছে কাল নেই, উচ্চারণ দিয়ে কি ভাব প্রকাশ হয়? তখন মেনে নিতেই হবে। বিশেষত সে যদি কোনো সাহেবের লেখা থেকে উদ্ধৃত ক'রে একটু ইংরেজির টাকনা দিয়ে বলতে পারে, তাহ'লে আমরা সবাই কাল থেকে বঙ্গোপ্‌সাগর বলতে বাধ্য। তাতে আমাদের জিব্‌ভার যতোই অসুবিধে হোক্ না কেন।

১৩৭১

কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে

কবিতা পাঠে ও কবিতা আবৃত্তিতে যে কি তফাৎ তা আমি ভালো ক'রে জানি না। কেমন ক'রে ভালো আবৃত্তি করা যায় তা-ও জানি না। শুধু জানি যে, কোনো কবিতা যদি নিজের খুব ভালো লাগে তাহ'লে সেটা প'ড়ে হোক্ বা মুখস্থ ক'রে হোক্ অপরকে শোনাতে বড়ো ইচ্ছে হয়। এবং অপরে শুনে কখনও তারিফ করে, বা কখনও নিন্দা করে। বা, কেউ কেউ সব সময়েই প্রশংসা করে, কেউ কেউ সব সময় নিন্দা করে। এর থেকে কবিতা পাঠের বা কবিতা আবৃত্তির কোনো নিয়ম খুঁজে বের করা খুব কঠিন। বিশেষ ক'রে আমার পক্ষে যে নাকি এই কাজের 'কাজী'।

তবে নিজেকে বাদ দিয়ে, আমি যে সমস্ত আবৃত্তি শুনেছি তার কথা বলতে পারি কিছুটা। কিন্তু গোড়াতেই একটা কথা স্পষ্ট হওয়া ভালো। রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে কবিতা বলতেন সেটা কি? পাঠ, না আবৃত্তি? পাঠ যদি হয়, তাহ'লে আমাদের আবৃত্তির ধরন মূলতঃ তার থেকে ভিন্ন নয়। আর যদি সেটা আবৃত্তি হয়, তাহ'লে তিনি যখন নিজের গদ্য লেখা দেখে পড়তেন তার ধরনও মোটেই ভিন্ন নয়। আমার চেনা-জানা লোকের মধ্যে কবি শ্রী অরুণকুমার মিত্রের পড়া আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর আস্তে হওয়ায় বেশী লোককে শোনানো অসুবিধে। যদি যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর গলা জোর করা যায়, তাহ'লে তাঁর অপূর্ব আবৃত্তিতে লোকে মুগ্ধ হবে। অর্থাৎ শ্রোতার সংখ্যার তারতম্যে গলার জোর কম-বেশী হ'তে পারে, কিন্তু পাঠ ও আবৃত্তি একই জিনিস। অক্ষম পাঠ-কে পাঠ বলবো, আর সক্ষম পাঠ-কে আবৃত্তি বলবো, এ-রকম সংজ্ঞা আমার ভালো লাগে না।

কবিতা আবৃত্তি আমি হালে কয়েক জায়গায় শুনেছি। পূর্বে নিয়ম ছিলো কবিতা মুখস্থ ক'রেই বলতে হবে, আজকাল দেখি সে-সব গোঁড়ামি উঠে গেছে। রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে গেলে সামনে বই খুলে রাখতে হয়, কবিতা আবৃত্তি করতে গেলে বই দেখে দেখে করতে হয়। আমি তো আবার একটু সেকেলে, এবং বেশ একটু গোঁড়া (কিছু কিছু প্রগতিবাদী বন্ধুদের পরিভাষায় —

reactionary), তাই আমার কেবলই মনে হয় এগুলো শ্রদ্ধার অভাব, নিষ্ঠার অভাব। অবশ্য হঠাৎ যদি কাউকে গান বা আবৃত্তি করতে হয়, তাহ'লে অন্য কথা। কিন্তু বহুদিন থেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে যে-আসর শুরু হ'লো সেখানেও এই কাণ্ড! আমি নিজেও এ-পাপ করেছি, তাই জানি। মনের অগোচর তো পাপ নেই ; স্পষ্ট জানি, সময়াভাবটা বারো আনা ক্ষেত্রেই মিথ্যে কথা, নিষ্ঠার অভাব — কবিতার প্রতি এবং দর্শকের প্রতি — হচ্ছে আসল কথা।

এ ছাড়া, আবৃত্তির ধরনের বোধ হয় মোটামুটি তিনটে ভাগ করা চলে। কেউ কেউ একেবারে গদ্যের মতো ক'রে পদ্য পড়েন, কেউ কেউ খুব সুর লাগিয়ে পড়েন, আবার কেউ-বা নাটকীয় ভঙ্গীতে পড়েন। অবশ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এর সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয় ; একটু আধটু ভেজাল প্রায়শই থাকে, তবে তর্কাতর্কির সময়ে এই তিনটে মতই সাধারণত শুনি। খুব ঝোঁকওয়ালা কবিতা, যেমন 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি' একেবারে ঝোঁক বর্জন ক'রে গদ্যের মতো পড়তে শুনেছি। কারণ নাকি, ঝোঁক এবং সুর দিলে কবিতার বাক্যগত অর্থ হারিয়ে যায়। অপর পক্ষে শক্ত বাঁধুনিওয়ালা পয়ার ছন্দের কবিতা দীর্ঘমাত্রায় সুর দিয়ে পড়তে শুনেছি। কারণ যে, সুর না-দিলে নাকি কবিতা নাটকের স্বগতোক্তির মতো শুনতে হয়, কবিতা ব'লে চেনা যায় না। আবাব 'বন্দা তখন বামবাহুপাশ জড়াইল তার গলে, দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে ছুরি বসাইল বলে' — এটুকু মঞ্চের ওপর হাঁটু গেড়ে ব'সে, বাঁ হাতে কাল্পনিক ছেলের গলা জড়িয়ে' ডান হাতে কাল্পনিক ছুরি একেবারে আমূল বসিয়ে দিতে দেখেছি।

এঁদের সকল মতের প্রতিই শ্রদ্ধা জানিয়ে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমার ভীষণ হাসি পায়। নিজের নিজের একটা মত খাড়া করবার এবং সেই মতটাকে লাঠির মতো বাগিয়ে ধরবার চেষ্টার মধ্যে আমি আনন্দ খুঁজে পাই না। আমার কাছে ভিন্ন ভিন্ন কবিতা বিভিন্ন গন্ধ ব'য়ে আনে। কতো ভিন্ন সুর, কতো ভিন্ন মেজাজ। তার প্রত্যেকটাকে আলাদাভাবে আবৃত্তি করবার ইচ্ছে হয় আমার। কিন্তু কণ্ঠস্বরের এতো দৈন্য যে, সব মেজাজ সব সময়ে ঠিকভাবে প্রকাশ পায় না। একই চাল যেন দুটো ভিন্ন কবিতায় এসে পড়ে। তখন যে কী পরিমাণ রাগ হয় নিজের ওপর তা বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের 'অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি…'

কবিতাটি পড়তে যতোটুকু সুর লাগে তা-ও ক'মে যায় যখন পড়ি — যে ক্ষুধা চোখের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে··।' এবং বুদ্ধির এই অশান্ত প্রাখর্য আবার মিশে যায় বৈদান্তিকের স্তোত্র উচ্চারণের মতো নির্মোহ ধ্যানময়তার মধ্যে, যখন পড়ি — 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী···।' পড়ি অর্থে পড়তে চাই। আমার মনের ভিতরটা ঐ-রকমভাবে পড়ে। —

কিন্তু এ সমস্ত লিখে কী ফল বলো ? নিজেরও কোনো লাভ হয় না, পরের তো হয়ই না। একটা কথা বলি। নিজের সম্বন্ধে ব'লে একটু লজ্জার সঙ্গেই বলছি, খারাপভাবে নিও না। অনেকের মুখে শুনেছি যে আমি নাকি ভালো আবৃত্তি করি। এবং পরোক্ষে শুনেছি আরো অনেকের কথা, যে, আমি নাকি আবৃত্তি ঠিক করতে পারি না। কিন্তু সত্যি বলছি, এ-নিন্দা বা প্রশংসায় আমার বিন্দুমাত্র উপকার হয়নি। সৎ সমালোচনার অভাব বড্ডো অনুভব করতে হয়। যদি আমার ভালো থাকে সেটা কোথায়, এবং যদি আমার ত্রুটি থাকে সেটাই বা কেমন, এ যদি-না ভালো ক'রে ব'লে দেওয়া হয়, তাহ'লে কী ক'রে নিজেকে উন্নত করি বলো ? খামোখা 'আপনি বড়ো ভালো' বা 'আপনি বড়ো পাজী' শুনে তো কোনো লাভ হয় না।

তাই নিজের বুদ্ধি মতোই চলতে হয়, বেশ কষ্ট ক'রে। যেমন আমরা সম্মিলিত কণ্ঠে আবৃত্তি করবার একটা চেষ্টা করেছি। তাতে হাতি ঘোড়া সাপ ব্যাং কী যে হ'লো তার কোনো সমালোচনা পাইনি। যাকে বলে technical আলোচনা। অবশ্য একেবারে পাইনি বললে ভুল হবে। কবিতা এমনভাবে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে নেওয়ায় অনেকের আপত্তি আছে। কারো তো মনে হয়েছে যে আমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়িরকমের সুর লাগাই। ব্যঙ্গ ক'রে বলেছেন যে, এর পরে তানপুরা নিয়ে আবৃত্তি করতে দেখলে'ও তিনি আর আশ্চর্য হবেন না। (ভাষাটা অবশ্য ঠিক এই না।) কিন্তু এ-কথা নিশ্চয়ই খুব রাগ-ক'রে-বলা। কারণ সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারণের সময় থেকে কৃত্তিবাসাদি পড়া পর্যন্ত খুব সুর লাগিয়েই পড়া হ'তো। আজও ভারতের নানান ভাষার কবিতা পড়বার সময় গানের মতো সুর ক'রেই পড়া হয়। অতএব, এমন-কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটনা আমরা করিনি যার কোনো আলোচনাই হয় না, কেবল ব্যঙ্গ করা যায় !

কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে যে নাচা যায় বা পাখোয়াজ বাজানো যায়, এ-তথ্য রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ ক'রে গেছেন। কিন্তু তিনি যা করেননি সেই পথে একটু-আধটু 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' করলেই আমরা দূষণীয় হ'য়ে পড়ি কী ক'রে! অবশ্য তুমি এ-রকম কোনো কথা বলোনি, এ-সমালোচনা বেরিয়েছিলো 'দেশ' পত্রিকায়। কিন্তু আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস যে সে-সমালোচকেরও এইভাবে বলার ইচ্ছে ছিলো না, কারণ এতে যুক্তি কম।

এই সমালোচনার অভাব আমাদের প্রায় সর্ব-ব্যাপারে। নিন্দা বা কটূক্তি অনেক। তাঁর ওপর আবৃত্তিকে তো অনেকে পাত্তাই দেন না। নাট্যাভিনয়ের সমালোচনাই এমন ভাসা ভাসা হয় যে তাতে কারো উপকার হয় না। যেমন ধরো, নবনাট্য আন্দোলন বেশ ভালো ক'রে শুরু হয়েছে বাঙলাদেশে 'নবান্ন' বা 'জবানবন্দী'র সময় থেকে। এবং এতোদিনে বোঝা যাচ্ছে যে, এ-আন্দোলন দেশের মাঁটিতে শক্ত শিকড় গেড়েছে। 'জবানবন্দী' প্রথম অভিনয় হয়েছিলো ১৯৪৪ সালে জানুআরি মাসের গোড়ায়, এবং 'নবান্ন' সেই বছরেরই শেষের দিকে। অর্থাৎ সাত বৎসর আগে। অথচ, কোনো একটা লেখাও কি বেরিয়েছে যাতে এই নবনাট্যের সঙ্গে সাধারণ মঞ্চের অভিনয়ের আঙ্গিকগত বা গুণগত পার্থক্যের বিশ্লেষণ ক'রে এর ভবিষ্যৎ উন্নতির বা অবনতির পথের একটা আন্দাজ দেওয়া হয়েছে। অথচ এটাই তো সবচেয়ে দরকার। কোন্ পথে গেলে আমরা আরো উন্নত হবো শিল্পী হিসাবে, এবং কোথায় কোন্ টানে আমাদের অবনতির আশঙ্কা এ-কথা তো জানতে হবে। আমরা নিজেদেরকে বাইরে থেকে দেখতে পাই না, তাই সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না যে কী করলাম বা কতোটুকু করলাম, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সমালোচকের — সংস্কৃতমনা এবং রসগ্রাহী হিসাবে।

আরো-একটা উদাহরণ দিই। শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ী যে একজন বিরাট অভিনেতা এ-কথা আমরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে পট্ ক'রে ব'লে থাকি। কিন্তু কী যে তাঁর বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, বা কতো বিরাট ক'রে একটি চরিত্রের রূপায়ণে যে তিনি সক্ষম, এ-কথা কোথাও পড়িনি। অথচ, পাশাপাশি যদি দুটি বিরুদ্ধ অর্থের কথা থাকে, যেমন ধরো

কোমল ও কঠোর, তাহ'লে সমগ্র লাইনটার বা বক্তব্যের ছন্দ বিনাশ না-ক'রে তিনি ঐ-কথাদুটোর উপযুক্ত মূল্য দিয়ে যেতে পারেন লহমার মধ্যে নিজের অসাধারণ উচ্চারণ ক্ষমতায়! (এ-ক্ষমতা বাঙলা মঞ্চে আর-কারো আছে কিনা সন্দেহ।) এবং তার ফলে ছাপার অক্ষরে যা একান্ত নির্জীব তা হঠাৎ রোদ্দুরের আলোর মতন ঝলমল ক'রে ওঠে তাঁর ভাষণে। তাছাড়া, যাকে বলে 'জান্তব চিৎকার' সেইরকম একটা ক্রুদ্ধ উন্মত্ত -জন্তুর মতো গর্জন ক'রে উঠতে পারেন, যা অনন্য-সাধারণ। তাঁর নাদির শা-র ভূমিকায় বা কখনো কখনো আলমগীরের ভূমিকায় সেই গর্জন আমি শুনেছি। কথাবিহীন কেবলমাত্র একটা চিৎকারে যে অতো স্পষ্ট ক'রে একটা চরিত্রের আদিমতা বোঝানো যায়, তা তো আগে ভাবতেই পারিনি। অথচ কোনো আলোচনায় আজ পর্যন্ত সে-কথা আমি উল্লেখ করতে শুনিনি। এই যে, এতো বড়ো বড়ো প্রতিভার বা গুণের সম্যক্ আলোচনা হ'লো না, এর ফলেই তো আমাদের এ-অবস্থা। এদিকে আমরা শ-এর দয়ায় Sarah Bernhardt আর Eleanora Duse-এর অভিনয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে গভীর লেখা পাই। এমন-কি হাল আমলের ইংরেজ সমালোচকের কাছে জানতে পারি যে, Sir Laurence Olivier-এর গলার কী বৈশিষ্ট্য, তাঁর চিৎকারই বা কতোটা প্রকাশক্ষম, বা Gielgud-এর শেক্সপীয়র আবৃত্তির মধ্যে কী কাব্যানুভূতির প্রকাশ। এ-সব পড়লে দুঃখ হয়, বেশ দুঃখ হয়।

ভেবো না, এ-সমস্ত ধান ভানতে শিবের গীত হচ্ছে। আসলে, সমালোচনার সমালোচনা প্রসঙ্গে কথাটা উঠলো। তাছাড়া আবৃত্তির নতুন ধরন বোধহয় সব সময়েই একটা নতুন অভিনয়ের আঙ্গিকের সঙ্গে আসে। যেমন, শিশিরবাবু একসময়ে আবৃত্তি খুব জনপ্রিয় করেছিলেন এবং তার সঙ্গে তাঁর নব্য অভিনয়ের ধারা একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে অবিচ্ছেদ্য। আজ যে আবার আবৃত্তি সম্বন্ধে লোকে কৌতূহলী হচ্ছে তারও কারণ একটা নতুন অভিনয় পদ্ধতি এসেছে ব'লে। অর্থাৎ আবৃত্তি বা অভিনয় একা একা ক্রমোন্নতির পথে চলে না, যখন চলে তখন উভয়ে মিলে একসাথেই চলে! দু-জনেরই শিকড় এক মাটিতে।

অভিনেতার বেলায়, মানে মহৎ অভিনেতার ক্ষেত্রে, দেখতে পাই, তিনি একযুগ পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের সংলাপের বাক্‌স্পন্দ এবং ধ্বনিমাধুর্য ধ'রে রাখতে পারেন। কিন্তু তারপর কথ্যভাষায় ভঙ্গীও বদলাতে শুরু করে! তখন অভিনেতার স্বরক্ষেপ বা স্বরপরিবর্তনের এবং অভিনয়ের রীতি সেকেলে লাগে, মনে হয় অতীতযুগ থেকে আমদানি করা, যা এখন বেমানান এবং এখনকার বিচারে অন্যরকম অনুভূতি জাগায়।

এই বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে স্পষ্ট করা যেতে পারে। আমাদের ছেলেবেলায় রাজনৈতিক মিছিলে স্লোগান দেবার রেওয়াজ ছিলো, এখনও আছে। কিন্তু প্রস্বরের ধরন অনেক বদলেছে — এতোই বদলেছে যে চেনাই যায় না। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা শুনতাম, ব-ন্দে-মা-ত-র-ম্ বা ইন্-কি-লাব জিন্-দা-বাদ। এই স্লোগানগুলি টেনে টেনে বলা হ'তো, যেন লোকদের আহ্বান করা হচ্ছে। কিন্তু এখন কদাচিৎ 'বন্দেমাতরম্' স্লোগান হিসেবে দেওয়া হয়, কিন্তু 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান দেবার প্রস্বর অনেক বদলেছে। এখন এইভাবে বলা হয়: ইন্/কি/লাব জিন/দা/বাদ। ঝোঁকটা এখানে একেবারে অন্যরকম। আমার ধারণা, আজকালকার ছেলেরা এই আধুনিক রীতিতে স্লোগান দেওয়ায় ঠিক সেইরকমই মত্ত হ'য়ে ওঠে, যেমন আমরা হতাম আমাদের কালে, আমাদের ধরনে দেওয়া স্লোগানে।

ধ্বনির প্রস্বর পরিবর্তনের আরো-কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী কয়েকটি কবিতা নেওয়া যাক। যেমন, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি:

> ওহে অন্তরতম,
> মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম।

অথবা

> দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে মনে হল, যেন চিনি—
> কবে নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা, ছিলে লীলাসঙ্গিনী।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা পড়বার সময় দেখা যাবে, পঙ্‌ক্তির শেষভাগে স্বরক্ষেপ ওপরে উঠে যায়। এই প্রবণতা রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে অনুপস্থিত। জীবনানন্দ থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক:

> আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি ...

অথবা বিষ্ণু দে-র

শুনেছি সেকালে নিরাপদ কবি গানে ··

অথবা সুধীন্দ্রনাথের

আমার কথা কি শুনতে পাওনা তুমি···

প্রত্যেকটি লাইনের ঝোঁক নীচের দিকে। [উচ্চারণের] এই পরিবর্তনের পেছনে যে-মানসতা কাজ করেছে, তা পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। আবার আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আর-একজনের যতোই বৈপরীত্য থাক, সবার মধ্যে কিন্তু কিছু-একটা যুগলক্ষণ থাকে, যার সাহায্যে আমরা একযুগের সঙ্গে অন্যযুগের পার্থক্য বুঝতে পারি।

অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি কোনো একটি শ্রেণীতে ফেলা যায় না। তাঁর পরবর্তীযুগের "পৃথিবী" ইত্যাদি কবিতা পড়লে বোঝা যায়, ফীনিক্সের মতো তিনি বারবার নতুন জন্ম লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর মতো ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত কয়েক শতকের মধ্যে একটিই পাওয়া যায় এবং সে-জন্য আপাতত আমাদের আলোচনার বাইরে। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি, যদি কোনো অভিনেতার আবেগ প্রকাশের বাচনভঙ্গী দু-দশক ধ'রে জীবন্ত লাগে তাহ'লে তিনি অসাধারণ অভিনেতা।

এবং সেই সূত্রেই সমালোচনা এতো প্রয়োজনীয়। যথার্থ সমালোচনা সাধারণকে বিচার করতে শেখায়, তার রসগ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায়। যেমন আমি অনেক রাজনীতিতে দীক্ষিত অল্পবয়সী ছেলে দেখেছি যারা নাটকে প্রেমের দৃশ্য আদৌ বরদাস্ত করতে পারে না, কিন্তু সেটা যদি কৃষাণ-কৃষাণীর বা মজুর-মজুরনীর প্রেম হয় তাহ'লেই পাশ। আবার যদি দু-একটা এ-রকম কথা থাকে যে — 'তোক্ শাড়ী দিব্যার মন কর্ছিনো, কিন্তুক পাইসাই নাই হামার' — ব্যস্, তাহ'লে তো একেবারে দারুণ 'প্রগতি' হ'য়ে গেলো। সত্যিই আমি এ-রকম লোক দেখেছি। অথচ অন্য সবদিকে তারা খুব যোগ্য, তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। আমাদের উচিত নানাভাবে বাস্তব সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল ক'রে তোলা, যেন তারা আপ্তবাক্য না মানে, সরলীকরণের দিকে না ঝোঁকে।

আরো-একটা কথা আছে। সম্প্রতি আমরা 'চার অধ্যায়' অভিনয় করেছি। দেখে অনেকে বলেছেন, অত্যন্ত বাক্যভারাক্রান্ত, যথেষ্ট action

নেই। কিন্তু আমরা যখনি আমন্ত্রণ করেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের লেখা অভিনয় করা হবে, তখনই তো মনে পড়া উচিত ছিলো যে, রবিবাবু কেমন লিখতেন বা তাঁর নাটকগুলোয় action কেমনধারা থাকে। আনা-রসের আমন্ত্রণে গিয়ে যদি কেউ 'আম কই, ল্যাংড়া আম' ব'লে হাঁক পাড়েন, তাহ'লে নিমন্ত্রণ-কর্তাকে বড়োই মুশকিলে পড়তে হয়। অথচ, সেদিন 'বহুরূপী'র অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেভাবে রবীন্দ্রনাথের কঠিন লাইনগুলো বলেছিলেন (আবৃত্তি করেছিলেন?) তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো। আমরা এ-যাবৎ শুনে এসেছি যে, হাস্যরসাত্মক নাটকগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্য যে-কোনো গম্ভীর নাটকে বাচন-ভঙ্গীতে কেমন একটা সুর লাগানো হয়। তাতে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অমানবিক ও আবছায়া লাগে। অন্তত আমাদের লেগেছে, তাই আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে যতোদূর সম্ভব সহজ ক'রে তাঁর লাইন বলতে, যাতে ব্যাপারটা রক্তমাংসের মনে হয়। সেইটার আলোচনা হ'লেই আবৃত্তি সম্পর্কে কথা উঠে পড়তো। কিন্তু হয়নি। হয় আমাদের ত্রুটিতে কোনো বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায়নি, কিংবা দর্শকদের লক্ষ্য হয়নি! যদি আমাদেরই ত্রুটি হয়, তাহ'লেও সেটা আলোচনা করার মতো, কারণ, যে-'বহুরূপী'র কিছুটা নাম হয়েছে অভিনয় বৈশিষ্ট্যে, সে এতো খারাপ করে কেন? অতীত সফলতাটা কি শিকে ছিঁড়েছিলো বেড়ালের ভাগ্যে?

এইধরনের কিছু আলাপ আলোচনা যদি শুরু ক'রে দেওয়া যায় তাহ'লে তারপরে ধীরে সুস্থে লেখা যাবে, যে কী ভেবে আমরা সম্মিলিত কণ্ঠের আবৃত্তি শুরু করলাম, এবং এর পরেই বা আর কি কি করা চলতে পারে।

১৩৭৮/১৩৭৭

অভিনয়

অভিনয় একটি শিল্পকলারূপে গণ্য হ'য়ে থাকে। কিন্তু নাট্যকারের সৃষ্ট গল্পের গতি, চমক ও উত্তেজনার সাহায্য নিয়ে কেবলমাত্র একটি চরিত্রের সংলাপ আবৃত্তি করার মধ্যে বিশিষ্ট কলাসৃষ্টির মর্যাদা কোথায়? প্রত্যেক শিল্পকলারই তো একটি নিজস্ব ও স্বাধীন প্রকাশভঙ্গী থাকে যা দিয়ে সে এমন-কিছু আবেগ সৃষ্টি করতে পারে যা অন্য-কোনো শিল্প-পন্থায় সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে গানে যখন একটি বিশেষ পর্দার পর আরো-একটি বা একাধিক বিশেষ পর্দা লাগানো হয় তখন সেগুলো শ্রোতাদের মনে যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা অন্য-কোনো প্রকারে অনুভবে সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়। ছবিতেও তেমনি। একটি রঙে, বা বিশেষ একটি রেখায় যে-আবেদন দর্শকদের মনে জাগিয়ে থাকে তা-ও অন্য-কোনো প্রকারে সম্ভব নয়। সেইরকম অভিনয়েও বাচনভঙ্গী, ও অঙ্গভঙ্গী, অভিনেতার সত্তার অভিক্ষেপণ দ্বারা এমন-কিছু আবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব যা লিখে প্রকাশ করা যায় না, এঁকে প্রকাশ করা যায় না, বা গেয়ে প্রকাশ করা যায় না, এবং সেই কারণেই অভিনয় কলারূপে গণ্য হ'য়ে থাকে।

তাই ব'লে সাহিত্যিক-প্রদত্ত সংলাপকে বাদ দিয়ে কেবল মূকাভিনয়কেই একমাত্র বিশুদ্ধ অভিনয়ধারা বলা হয় না। অভিনয়-শিল্পের অতি শৈশব থেকেই ভাষাকেও তার বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে একটি ব'লে গণ্য করা হ'য়ে থাকে।

'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' — এ-কথাকয়টি 'প্রফুল্ল' নাটকে হাজারবার প'ড়েও অভিনেতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ এর উচ্চারণের মাধ্যমে গভীর ব্যথার যে বিশিষ্ট রূপটি প্রকাশ করতে পারতেন তা অনুমান করা অসম্ভব। বা 'সীতা' নাটকে শিশিরকুমার যেভাবে 'শত্রু! শত্রু!' ব'লে লবের গালে মৃদু মৃদু আঘাত ক'রে এক জটিল আবেগ সৃষ্টি করতেন তা-ও তেমনি না-দেখে আন্দাজ করা অসম্ভব। এইগুলো ভাষাকে ছাড়িয়ে ভাষার ব্যবহারের উদাহরণস্বরূপ স্মর্তব্য।

অনেক আগে, নাট্যকলার যখন কৈশোর, তখন অভিনেতারা অভিনয়ের সময়েই মুখে মুখে সংলাপ তৈরী ক'রে বলতেন ; এটি য়ুরোপে Commedia dell, arte-এর বিশিষ্ট রূপে প্রকর্ষলাভ করেছিলো। কিন্তু ড. মনোমোহন ঘোষের অনুমান যে ভারতেও নাট্যপ্রচেষ্টার প্রাথমিক স্তরে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো। এবং সেই কারণেই, তিনি বলেন যে, গ্রীক পদ্ধতি যখন শ্রবণের উপর বেশী মূল্য দিয়েছে ভারতে তখন দর্শনের উপর। এবং সেইজন্যই বহুদিন থেকে ভারতে নাটকের নাম দৃশ্যকাব্য। (ড. মনোমোহন ঘোষ, 'নাট্যশাস্ত্র', ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা।) কেবলমাত্র আবৃত্তি-নির্ভর না-হওয়ার জন্যই ভারতবর্ষে ভাবপ্রকাশের অনেকপ্রকার আঙ্গিকমুদ্রার প্রচলন হয়েছিলো, এবং বহুযুগ পূর্বেই নাট্যশাস্ত্রে সেগুলি বিধিবদ্ধ অবস্থায় লিপিবদ্ধ।

যদিও সেই সব মুদ্রার অনেকগুলোই আজ ভারতীয় অভিনয়ে অপ্রচলিত, তবুও প্রাচীন-মুদ্রা-সদৃশ কয়েকটি ভঙ্গী এখনও সাধারণভাবে এদেশের সর্বত্র ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কাউকে নিরস্ত করতে আমরা দক্ষিণহস্ত উত্তোলন ক'রে যে-ভঙ্গী করি, তা বোধহয় ভারতের সকল নাট্যমঞ্চে অতি স্বাভাবিক বোধেই প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে, কিন্তু প্রয়োগকালে কারো হয়তো স্বপ্নেও মনে হয় না যে, এটিও শাস্ত্রোল্লিখিত একটি মুদ্রা। এর নাম পতাকা মুদ্রা। এবং আজও ভরতনাট্যম নৃত্যে এটি সহজে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে।

এইরকম কিছু কিছু মুদ্রা চলিত থেকে গেলেও বহু মুদ্রাই কিন্তু আমাদের সামাজিক বিবর্তনের ফলে আজ অর্থহীন হ'য়ে পড়েছে। তাই, তাদের জায়গায় এখন অনেক নতুন মুদ্রা বা করণেরও উদ্ভব হয়েছে! যেমন, টাকা বোঝাতে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে চাপ দিয়ে বাজানোর ভঙ্গী করা বা চিন্তামগ্নতা বোঝাতে হাতের উপর মাথা রাখা।

এইভাবে অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে মনোভাব প্রকাশের যে অজস্র উপায় আছে তা আঙ্গিক অভিনয়ের মধ্যে গণ্য হয়।

অভিনয়ের বাচিক অংশ সম্পর্কেও মানুষ বহুযুগ ধ'রে আলোচনা করেছে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর উচ্চারণপদ্ধতি খুবই সরল ক'রে বোঝানো আছে এবং তার পরে বিভিন্ন ছন্দেরও

বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা ক'রে দেওয়া আছে। এবং সর্বোপরি, বিভিন্ন ভাবের ও বিভিন্ন রসের প্রকাশে কণ্ঠ কেমনভাবে ব্যবহৃত হবে তারও হিসেব দেওয়া আছে। য়ুরোপেও আরিস্ততল্‌ থেকে বাচিক অভিনয়ের আলোচনা চলেছে। বাঙলা রঙ্গমঞ্চেরও অতীত আচার্যেরা নতুন অভিনেতাদের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভালো ক'রে অনুশীলন করাতেন যাতে তাদের উচ্চারণে স্পষ্টতা আসে, ছন্দবোধ জন্মায় ও স্বরপ্রক্ষেপণের ক্ষমতা আয়ত্তাধীন হয়। কিন্তু এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রাথমিক। কণ্ঠস্বরের যে-ক্ষমতায় শিল্পী দুরূহ আবেগময় দৃশ্যের অভিনয়ে মোহবিস্তার ক'রে থাকেন তা সংগীতশিল্পীর শিল্পকর্মের মতোই। এতে নিজস্ব স্বরগ্রাম জানতে হয়, এবং প্রত্যেক সুর সম্পর্কে নিজের কণ্ঠস্বরের আচরণও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা থাকা প্রয়োজন। যন্ত্রের নিজস্ব আচরণ জানা না-থাকলে যন্ত্রী যেমন তাকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারেন না, তেমনি আপন কণ্ঠস্বরের আচরণও অভিনেতার পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য।

আঙ্গিক ও বাচিক — অভিনয়ের এই দুই অংশেই শিল্পীদের লক্ষ্য থাকে স্বচ্ছতা লাভ করার দিকে। অর্থাৎ অভিনেয় চরিত্রটির অন্তরকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করার দিকে। যদি আঙ্গিক বা বাচিক ভঙ্গী এমন হয় যে তার কৌশলটাই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু অভিনেয় চরিত্রটির অন্তরকে প্রকাশ করে না, তা হ'লে সেই অভিনয়কে অস্বচ্ছ বলা চলে।

অভিনয়ের আর-একটি অংশ রূপসজ্জা, ও চরিত্রোপযোগী জিনিসপত্র ব্যবহার করতে পারা। যেমন, যোদ্ধার ভূমিকা অভিনয়ে তলোয়ার বহন ও ব্যবহার করতে পারাও অভিনয়ের অংশ। তেমনি আবার, চায়ের দোকানের বয়ের ভূমিকায় চায়ের পাত্র বহন করতে পারাও অভিনয়ের অংশ।

কিন্তু বাহ্যিক সমস্ত প্রকরণের ওপর আছে অভিনেতার সত্তা। সেই সত্তার ব্যবহার ও প্রকাশই হ'লো অভিনয়ের কঠিনতম অংশ। এবং সেই অংশের দ্বারাই শিল্পী নিজের গভীরতা ও মহত্ত্ব প্রমাণ ক'রে থাকেন।

এ যে কেমন ক'রে সাধিত হয় সে-সম্পর্কে যুগে যুগে বহু মনীষী বহু প্রকার মতই লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। এবং এই সমস্ত মতের মধ্যে অমিল যেমন প্রচণ্ড, মিলও তেমনি প্রচুর। সক্রেটিস ও এক আবৃত্তিকারের আলোচনার যে-লিপি প্লেটো বহু প্রাচীনযুগে লিখে গিয়েছেন তাতে এমন

বলা আছে যে, কবি ও তাঁর আবৃত্তিকারেরা অনুপ্রেরণায় অস্বাভাবিক অবস্থাতেই নিজ শিল্প সৃজন করতে সক্ষম হন। এবং সেই সময় থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত অভিনেতার সৃষ্টির উৎস যে কোথায় এ-সম্বন্ধে যেমন বহুমত ব্যক্ত হয়েছে তেমনি অবার প্রতিবাদেরও প্রবল ঝড় উঠেছে। দেনি দিদেরো (Denis Diderot) অভিনয়ের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক নিবন্ধ লিখেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ককলাঁ্যা (Coqueline) ও হেনরী আরভিং (Henry Irving) এই তর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ ছাড়া বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা তাল্মা (Talma)-র প্রায় সমসময়ে দু-জন বিখ্যাত অভিনেত্রীর এই সম্পর্কে আলোচনা, এবং তাঁদের পাশ কাটিয়ে তাল্মার নিজের লেখা যে-প্রবন্ধ আছে তা আজও প্রচুর কৌতূহল জাগায় (*Memoirs of Hyppolite Clarion ; Memoirs of Marie-Francoise Dumesril ;* Francoise Joseph Talma, *Reflection on the Actors Art.*)। রুশ নাট্যাচার্য স্তানিশ্লাভস্কি শিখিয়েছেন যে প্রতিভাধর অতিনেতাদের পদ্ধতিটা কী, এবং সেই পদ্ধতি অনুসরণ করলে ক্ষমতাপন্ন অভিনেতামাত্রেরই সফলতর হবার সম্ভাবনার কথা তিনি বলেছেন।

জর্মান নাট্যকার ও নির্দেশক বের্টোল্ট্ ব্রেখ্ট্ (Bertholt Brecht) আবার স্তানিশ্লাভস্কির পদ্ধতির ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন, অভিনেতা ও অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে একটা দূরত্ব সব সময়েই বজায় রাখা প্রয়োজন। এবং তা'হলে দর্শক ভাবাবেগে ভেসে না-গিয়ে যুক্তি দিয়ে সমস্ত জিনিসটি বোঝবার চেস্টা করবে।

এইসব তর্কের এখনও কোনো মীমাংসা হয়নি। এবং কোনোদিন হবে কিনা তা-ও সঠিক বলা সম্ভব নয়। কিন্তু যে পারে সে কেমন ক'রে যেন এতো তর্ক-ঝগড়া সত্ত্বেও পেরে যায়, আর রসপিপাসু দর্শকও অমনি ধন্য ধন্য ক'রে ওঠে।

কিন্তু এই পারাটাও আবার দেশ ও কালের সীমার মধ্যে অত্যন্ত আবদ্ধ। সমসাময়িক মানুষের মন যে-ইঙ্গিতে মুগ্ধ হয়, যে-শব্দস্থাপত্যে নিজেকে ভুলে যায়, তার অভিঘাত পরবর্তীযুগে লুপ্ত হ'য়ে যায়। তাই লেখক বা চিত্রকর যুগের আগে জন্মেও পরবর্তীযুগের বোধের প্রসাদে

বেঁচে যেতে পারেন কিন্তু অভিনেতা সমসাময়িক মনকে আন্দোলিত করতে অক্ষম হ'লে তাঁর পক্ষে সুবিচার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এবং সম-সাময়িককালে বিখ্যাত অভিনেতার সঠিক মূল্য নিরূপণ পরবর্তীযুগে তেমনিই কঠিন। অথচ বহমান সময়ের একটি ক্ষণের মধ্যে চিরন্তন সময়কে উপলব্ধি করবার যে কঠিন মূল্য তা অভিনয়শিল্পীকে শোধ করতেই হয়। এটাই তাদের ভাগ্যলিপি।

নাট্যাভিনয়

আজকে আমাদের দেশে প্রচুর থিয়েটার হচ্ছে। বছরের এক একটা সময়ে মহাসমারোহে যাত্রা-উৎসব হচ্ছে। রাজকীয় সমারোহে ফিল্ম তোলা হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে। তাছাড়া মূকাভিনয় হচ্ছে, নৃত্যনাট্য হচ্ছে পুতুল-নাচ হচ্ছে, - জলের মধ্যেও বেশভূষা প'রে সাঁতার কেটে নাট্যাভিনয় হচ্ছে। এইরকম নানা সৃষ্টিচাঞ্চল্য দেখে নিশ্চয়ই আমরা অনুমান ক'রে নিতে পারি যে দেশের নাট্যশিল্পের একটা শুভক্ষণ এসেছে, এবং — যাকে বলা যায় — দেশের ধমনীতে একটা নাট্যপ্রেমের জোয়ার জেগেছে।

এই জোয়ারের মধ্যে কিছু কিছু মঞ্চের লোক, যারা নাট্যরস স্ফূর্তির জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলো, যারা দেশের জমিতে একটা সৎ নাট্যপ্রচেষ্টার ভিত্তি গড়বে ব'লে ঐকান্তিক পরিশ্রম করেছে তারা যেন আজ খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাদের মনে হচ্ছে 'নবনাট্য আন্দোলন', 'প্রগতিবাদী নাট্য' 'আধুনিক নাট্য', 'সৎ নাট্যপ্রচেষ্টা' এ-সমস্ত কথাগুলোর মানেই যেন হারিয়ে গেছে। যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে এই কথাগুলোও যেমন গুলিয়ে গেছে, তেমনিই গুলিয়ে গেছে এই কাজের পিছনের চিন্তাগুলো।

এই বিষয়টা এখনো এতো উত্তপ্ত যে আমার পক্ষে ওর মধ্যে প্রবেশ না-করাই ভালো। কিন্তু থিয়েটারের লোক হিসেবে একটা কৌতূহল আসে। সেটা হ'লে যে এই তর্কের মূলে যে-কথাটি আছে সেই নাট্যবস্তুটি কী? মঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতে ভেবে দেখা যাক যে তিনি কোথায় নিহিত?

দেখা যাচ্ছে যে, যাত্রা থিয়েটার বায়স্কোপ থেকে আরম্ভ ক'রে প্যান্টো-মাইম গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, সবই এর আওতার মধ্যে পড়ছে। কিন্তু এদের মধ্যে মিলটা কী?

একটা মিল দেখা যায় যে, এগুলোর শিল্পীরা কোনো-না-কোনো একটি চরিত্রের মতো বেশভূষা ক'রে অঙ্গভঙ্গী ক'রে নানাপ্রকার ভাব প্রকাশ করছে। তাহ'লে কি ধ'রে নেওয়া যাবে যে আমি ছাড়া অন্য আর-একজন হওয়ার চেষ্টার মধ্যেই নাট্যবস্তুটি নিহিত আছে?

কিন্তু তাহ'লে একটা প্রশ্ন জাগে। আমাদের দেশে অভিনয়ের ওপর নাকি কথকতার প্রচুর প্রভাব ছিলো। তাছাড়া কথকতার সংলাপবহুল বর্ণনায় যথেষ্ট নাটকীয়তাও ছিলো। কিংবা চারণের গান। তাতেও গীতিনাট্যের মতো সংলাপকে গানের রূপে প্রকাশ করা হয়। কিংবা বর্ণনাময় যে-নৃত্য, যাতে শিল্পী কোনো একটা বিশেষ চরিত্র না-সেজে নাট্যশাস্ত্রোক্ত মুদ্রা রচনা ক'রে একটা ঘটনার বর্ণনা দেয় — যে-নাচ একেবারে ভরতমুনির আশ্রিত ভরত-নাট্যম্ — সে কি নাট্যলক্ষণাক্রান্ত নয়?

তখন হয়তো আমরা বিবেচনা ক'রে বলতে পারি যে কথক অবশ্য নানা ভঙ্গীতে নানা ঘটনার বর্ণনা দেয়, নানা চরিত্রের সংলাপ একা উচ্চারণ ক'রে সে অভিনয়ই করে, তাই সেটাও নাট্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

বেশ। তাহ'লে উপন্যাসকার বাদ যাবেন কেন? — কেউ অবশ্য তর্ক ক'রে বলতে পারেন যে উপন্যাসকার তো কথকের মতো কথা ব'লে বা গান গেয়ে বর্ণনা দিচ্ছেন না, তাঁর মাধ্যম শুধু লিখিত অক্ষর। কিন্তু নাট্যকারের লেখা নাটকটাও তো শুধু লিখিত অক্ষর, সেটাও কি নাট্যশিল্প বহির্ভূত? সোফোক্লেস, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, — সব বহির্ভূত?

তাহ'লে আবার একটা সংজ্ঞা ভালো ক'রে তৈরী করা যাক। সেটা হচ্ছে যে, মানুষ বা মানুষের তৈরী পুতুল বা ছবি যদি অক্ষরের দ্বারা বা উচ্চারিত শব্দের দ্বারা (যাতে সঙ্গীতও অন্তর্ভুক্ত) বা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা (যাতে অন্তর্ভুক্ত নৃত্যও) এক বা একাধিক চরিত্রের ভাব প্রকাশ করে তাকে নাট্যশিল্প ব'লে অভিহিত করা চলে।

কিন্তু তবু একটা কথা থেকে গেলো। কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে নাটকের মধ্যে যদি রেলগাড়ীর দৃশ্য বা প্লাবনের দৃশ্য দেখানো হয়, তাহ'লে সেগুলো কি নাট্যশিল্প প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত নয়? তাতে তো অক্ষরের বালাই নেই, সংলাপ নেই, অঙ্গভঙ্গীও নেই। অথচ এমন একটা-কিছু প্রীতিজনক নিশ্চয়ই আছে যাতে দর্শকসাধারণ উৎফুল্ল হ'য়ে হাততালি দিচ্ছেন এবং পয়সা উসুল হ'লো মনে ক'রে আনন্দ পাচ্ছেন। সেটা কি নাট্যশিল্প? — কিংবা সিনেমাতে যদি ঐ একই জিনিস দেখানো হয়? তখন কি সেটা প্রশংসনীয়?

এর সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রশ্নও উঠতে পারে যে বিশেষ একটি নাটকীয় মুহূর্তে আবহসঙ্গীতের ছোট্টো একটি পকড় বা phrase গভীর আবেগ সৃষ্টি করতে

পারে, সেই phraseটি কি তাহ'লে নাট্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত? অর্থাৎ সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি যে সঙ্গীত একটি পৃথক শিল্প, কিন্তু অভিনয়ের অন্তর্গত সেই phraseটি কোন্ গোষ্ঠীর?

এতোরকম তর্ক যখন উঠে পড়তে থাকবে তখন কাজে কাজেই আমাদের মাথার মধ্যে গোলমাল লেগে যাবে। আমরা তখন আবার সাদা-সাপ্টা ক'রে আর-একবার সংজ্ঞা ঠিক করবার চেষ্টা করবো। বলবো যে, নববধূ যখন নানান্ আভরণ প'রে লাল চেলিতে সর্বাঙ্গ ঢেকে তার স্বামীর কাছে যায়, তখন স্বামী সেই অলঙ্কারকে বা চেলিকে বধূ ব'লে ভুল করে না। ওগুলো তার বধূর আভরণ মাত্র। নববধূ এই সজ্জা নিয়েই নববধূ, কিন্তু এইসব সজ্জা ছাড়িয়েও সে নববধূ। আলো, মঞ্চমায়া, আবহসঙ্গীত, দৃশ্যপট, — এরা নাট্যে থাকতে পারে, আবার অবস্থাবিশেষে না-ও থাকতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। ঠিক যেমন গান্ধর্ব বিবাহে চেলিও থাকে না, স্বর্ণালঙ্কারও থাকে না, কিন্তু তাতে শকুন্তলার বিবাহ তো অসিদ্ধ হয় না।

কিন্তু তবুও প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। সেটা হ'লো যে নাট্যবস্তুটি কোথায়, এবং কোথা থেকে তার আভরণের শুরু। আলো, মঞ্চমায়া, দৃশ্যপট, এদের বাদ দিতে দিতে তো অভিনেতাদেরও বাদ দিয়ে দেওয়া যায়। ধরুন এমন তো বলা যায় যে, শেক্সপীয়রের নাটক প'ড়ে আমরা বহুদিন থেকেই মুগ্ধ হয়েছি, অর্থাৎ নাট্যশিল্পসৃষ্টি ঐ-নাটক লেখার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছে, পরে আবার সেটাকে মঞ্চস্থ করা হ'লো কিনা সেটা আমাদের অনেকের কাছে অবান্তর, কারণ সে-মঞ্চাভিনয় তো শেক্সপীয়রের অদ্ভুত শিল্পকীর্তির একটা বর্ণাঢ্য আভরণ মাত্র। — এ-কথা তো অনেককে বলতে শুনেছি যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকে যখন ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র সেজে মঞ্চের ওপরে নিজ নিজ চরিত্রানুযায়ী আবেগে অভিনয় করে তখন নাকি নাটকটিকে বুঝতে ও অনুভব করতে সহজ হয়, এবং সেটাই নাকি মঞ্চপ্রযোজনার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।

কিন্তু শিশুদের বোধগ্রাহ্য করার জন্যে তাদেরও বইয়ের পাতায় পাতায় তো অনেক ছবি থাকে। নাট্যাভিনয় কি সেইরকম কেবল শিশুবোধ্য হবার জন্যে? যাঁদের সাহিত্য প'ড়ে রসোপলব্ধির ক্ষমতা নেই, নাট্যাভিনয় কি কেবল তাঁদেরই বুঝিয়ে দেবার জন্যে? তাহ'লে আর এটাকে শিল্পই বা বলা কেন?

তাহ'লে নাট্যের মূল সত্তাটা কোথায়? যদি বলি একমাত্র নাটকেরই মধ্যে, তাতে মনে হয় যে সাহিত্যের মধ্যে, অর্থাৎ পৃথক কোনো সত্তা নেই। আবার যদি বলি নাটকটা অবান্তর, অভিনয়ের মধ্যেই নাট্যের প্রাণ, তাহ'লে সেটাও অবাস্তব লাগে। অথচ এই মূল প্রশ্ন সম্পর্কে নিজেদের মনে স্বচ্ছতা না-থাকার দরুন আমাদের নাট্যসমালোচনা এতো দুর্বল। নাট্যের সমালোচনায় ব'সে আলোচনা হয় প্রধানত নাটকের, — নাটকের গল্পের। তারপর সবশেষে বলা হয় 'অভিনয় যথাযথ হইয়াছে'। কিন্তু কার সঙ্গে যথাযথ? গল্পের সঙ্গে? গল্পটাই তো প্রকাশ পেয়েছে অভিনয়ের মাধ্যমে। সুতরাং দু-ফুট উঁচু দেওয়ালের ওপরের ছাত দু-ফুট উঁচুই হবে। কিন্তু কেউ কি খোঁজ ক'রে দেখেছে যে মাথার ওপরে চাড দিয়ে ছাতটা কতোখানি আকাশে তোলা হয়েছে?

আমাদের অল্প বয়সে আমাদের পাড়ায় 'চিতোর গৌরব' নামে একটি স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত ছোট্টো নাটক অভিনয় হয়েছিলো। তাতে প্রথম দৃশ্যে ছিলো যে রাণা অমরসিংহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে মুগ্ধ, যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক। শেষে অমাত্যদের বাণী শুনতে শুনতে সে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে এবং উদ্দীপ্ত কণ্ঠে যুদ্ধঘোষণা করে। আমার এক বাল্যবন্ধু, যিনি অমরসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তিনি পরদিন বাড়ীর এক কবিরাজ মশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর অভিনয় কবিরাজ মশায়ের কেমন লেগেছে।

বৃদ্ধ কবিরাজ মশাই প্রায় ক্রুদ্ধভাবে বলেছিলেন — গোড়ার দিকে তুমি কী একেবারে যাচ্ছেতাই একটা করছিলে — একেবারে বিচ্ছিরি —।

বন্ধু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে — কেন, কী করেছি?

কবিরাজ মশাই তেমনি উত্তপ্তভাবে বলেন — কী আবার! বিলাস-ব্যসনে একেবারে মত্ত। — খুব যাচ্ছেতাই হয়েছে। তবে হ্যাঁ, মোহ ভাঙার পর থেকে খুব ভালো। তখন থেকে খুবই ভালো। কিন্তু গোড়াটা বিচ্ছিরি।

আমরা হাসাহাসি ক'রে এঁদের নাম দিয়েছিলাম 'মোহ ভাঙার' দল। কিন্তু যতো বয়স বাডতে লাগলো ততো দেখলাম এইরকম মোহ ভাঙার দলই বেশী। আমাদের অনেকের চিন্তাই ঐ-রকম অপরিশুদ্ধ। এই চিন্তার ন্যায়শাস্ত্রে নায়ক আমাদের মনের মতো কথা বললে বলি তার অভিনয় ভালো হয়েছে। এই ন্যায়শাস্ত্রানুযায়ীই আমরা ঠিক ক'রে নিই যে মূল নাট্যবস্তুটি কেবলমাত্র

নাটকেই আছে এবং সেটাকে প'ড়ে আমরা যেমন যেমন বুঝি যদি অভিনেতা ঠিক সেইপথে সেটাকে প্রকাশ করতে পারেন তাহ'লেই তাতে আমাদের শরীরে স্বেদ, কম্পন ইত্যাদির মতো সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং আমরা সেই অভিনেতাকে শিল্পী বলি।

কিন্তু এই ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে এ-কথাও বলা উচিত যে শিশিরকুমার মোটেই প্রথম শ্রেণীর নট ছিলেন না। কারণ তাঁর অভিনীত যে মূল নাটক, যেমন, 'সীতা' বা 'আলমগীর' বা 'রঘুবীর' কোনোটাই বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ব'লে সম্মানিত নয়। সুতরাং যেখানে মূল নাট্যবস্তুই দ্বিতীয় বা তন্নিম্ন শ্রেণীর সেখানে তার যথাযথ প্রকাশে শিশিরকুমারের কতোটুকু শিল্পক্ষমতার প্রয়োজন ?

অথচ এ-কথা আমরা অনেকেই শুনেছি যে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন। সে-কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের নাটকেও এমন-কিছু অ-পূর্ব সৃষ্টি করতে পারতেন যা ঐ-নাটকের সাহিত্যিক গুণাগুণ অতিক্রম ক'রে তাঁকে শিল্পীপদবাচ্য করেছে। এবং এ-রকম অভূতপূর্ব শিল্পসৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন অভিনেতা কেবলমাত্র নাট্যকারের রঙচঙে illustration নয়। কেবলমাত্র শিশুবোধ্য মানের বই নয়।

সেখানে নাটকটাই হ'লো পুরো নাট্যাভিনয়ের যেন কিছু শর্টহ্যাণ্ড নোট্স্। অতি অল্প নোট্স্। যেমন গানের কথাগুলো দেখে আন্দাজ করা যায় না যে শ্রেষ্ঠ সুরকারের হাতে তার স্বরলিপি কী হবে। কী তাল হবে, কী লয় হবে, কোথায় মীড় থাকবে, কোথায় গমক থাকবে। সেটাই তাঁর সৃষ্টি। এবং তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব সেই সৃষ্টির মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আনে। সেই স্বকীয়তা আসে ব'লেই তিনি শিল্পী, নইলে খালি কারিগর হতেন।

এবং সেইজন্যেই মহাকবির লেখা সংলাপের উপর নির্ভর ক'রে দু-জন প্রথম শ্রেণীর অভিনয়শিল্পী দুটি পৃথক হ্যামলেট সৃষ্টি করতে পারেন। অর্থাৎ নাটকটাই যদি একমাত্র নাট্যবস্তু হ'তো, তাহ'লে দুটি হ্যামলেটের সৃষ্টিটাই সম্ভব হ'তো না। যা-কিছু সৃষ্টি তা ঐ একবারেই হ'তো, ঐ-নাটক লেখাতেই হ'তো। — কথাটাকে মঞ্চের দিক থেকে ভেবে দেখা যাক।

শ্রেষ্ঠ সময়ে নাট্য হ'লো নাটক ও অভিনয় এই যুগ্মতারার দ্বৈতনৃত্যের মতো। পরস্পর যেমন পরস্পরের দাস হয়, তেমনি আবার পরস্পরের প্রভুও

হয়। মঞ্চের সম্পর্কে জ্ঞান না-থাকলে, অভিনয়-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান না-থাকলে, যেমন শ্রেষ্ঠ নাটক লেখা সম্ভব নয়, তেমনিই আবার সাহিত্যের পদ্ধতি কিছু জানা না-থাকলে, নাট্যকারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতগুলো ধরতে না-পারলে, শ্রেষ্ঠ অভিনয়ও সম্ভব নয়। শেক্সপীয়র অভিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রচণ্ড অভিনয়ের উপযুক্ত নাটক লিখে। যদি বারবেজ সম্পর্কে তাঁর মনে অশ্রদ্ধা থাকতো তাহ'লে ক্রমশ তখন অতো কঠিন অভিনয়ের নাটক হয়তো লিখতেন না। এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতাও নাটকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নাট্যকারের লিখিত চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর নিজের চরিত্রের গভীরতম সত্যকে প্রকাশ ক'রে। এই দুই শ্রেষ্ঠ-র মিলন হ'লেই শ্রেষ্ঠ নাট্যের জন্ম হয়। কিন্তু এ-রকম ঘটনা তো ইতিহাসে অহরহ ঘটে না, তাই কখনো পাল্লার এ-দিকে ভারি হয়, কখনো ও-দিকে।

ইংলণ্ডে যখন নাট্যকারের অভাব ঘটেছে তখনো সেখানকার দিগ্বিজয়ী অভিনেতারা শেক্সপীয়রকে আশ্রয় ক'রে নাট্যের মর্যাদা বজায় রেখেছেন! আবার কোনো কোনো যুগে দিগ্বিজয়ী অভিনেতাকে আশ্রয় ক'রে নতুন নাট্যকার নাটক লিখেছেন। যেমন শুনেছি, ফোর্বস্-রবার্টসনকে মনে ক'রে বর্নার্ড শ তাঁর 'সীজার ও ক্লিওপ্যাট্রা' লিখেছিলেন। কিন্তু যেটা লেখা হবে সেটা নাটকই হওয়া চাই অর্থাৎ তাতে 'থিয়েট্রিক্যাল অ্যাক্শন' থাকা চাই। 'থিয়েট্রিক্যালী রীয়ল' হ'য়ে ওঠবার সুযোগ থাকা চাই। মঞ্চকে মাথায় রেখে তার অনুগমন করা চাই। অর্থাৎ অভিনেতাদের গভীর অভিনয়ের সুযোগ থাকা চাই। বড়ো নাট্যকার অভিনয়ের সেই সুযোগই ক'রে দেন বড়ো অভিনেতাদের জন্যে। তাই তাঁদের নাটক মহৎ নাটক।

এককালে গ্রীকযুগে নাটকে কাব্যই ছিলো প্রধান বস্তু, এবং নটের প্রথম দায়িত্ব হয়তো ছিলো সেটাকে ভালো ক'রে আবৃত্তি করতে পারা। কিন্তু পরে ইতালীতে এমন একটা যুগ এসেছিলো যখন নাটক বলতে কিছু ছিলো না। শুধু একটা গল্পের কাঠামো। তার যা-কিছু রক্তমাংস, যা-কিছু জীবন্ত সৌষ্ঠব, সমস্তই সৃষ্টি করতেন অভিনেতারা, মঞ্চের ওপরে। সংলাপ তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি ছিলো, নাটকের নয়।

এইরকম বহু পদ্ধতির ইতিহাস পার হ'য়ে এসে আজ এই কথাই স্পষ্ট হয় যে নাট্যকলার মূল কেন্দ্র হ'লো একটি অভিনয়ের আসর ও নটনটীদের আবেগ,

তাদের passion। — এর দ্বারা নাট্যকারদের প্রতি কোনো অবজ্ঞা প্রকাশ করছি না। তাঁরা সাহিত্যিক, তাঁদের নাটক পাঠ্য হিসাবেই লোকের কাছে আদর পাবে, শ্রদ্ধা পাবে। কিন্তু সেটা নাট্য নয়। নাট্য হবে যখন অভিনয়ের আসরে আবার নতুন ক'রে সেই নাটককে সৃষ্টি করা হবে।

কিন্তু, এই মঞ্চের ওপর আবার সৃষ্টি হওয়া — এইধরনের কথার যথার্থ অর্থ কী তা আমরা ঠিক ক'রে উঠতে পারি না। আমাদের সাধারণ-ভাবে ধারণা আছে যে নাট্যকারের সংলাপ যথাযথভাবেই বলতে হয়। অর্থাৎ যেখানে হাসবার কথা বলা আছে সেখানে হেসে এবং কাঁদবার জায়গায় কেঁদে বলতে হবে। এইটুকুই তো দায়িত্ব।

কিন্তু সেইটুকুই যদি দায়িত্ব হয় তা হ'লে তো সত্যিই অভিনেতারা আভরণ ব্যতীত আর-কিছুই নন। নাট্যকার স্থান ব'লে দেন, পাত্র ব'লে দেন, কাল ব'লে দেন। তাই দেখে মঞ্চশিল্পী মঞ্চ সাজালো, আলোকশিল্পী আলো জ্বালালো, আর অভিনেতারা মঞ্চে এসে সংলাপগুলো মুখস্ত ব'লে গেলো। এ-রকম অভিনয় একেবারেই নাট্যকারের চাদরে বাঁধা, তার নিজস্ব শিল্প-সত্তা কিছু নেই।

তাইতো অনেক নির্দেশক নিজের স্বাধীন উপস্থিতি বোঝাবার জন্যে দরজার চৌকাঠকে অসম চতুষ্কোণ ক'রে দেন, জানালাগুলোকে হয়তো ত্রিভুজের মতো কেটে দেন। এতে আমাদের অনেক দর্শক খুব প্রীতও হয়, তারিফ ক'রে ভাবেন, হ্যাঁ, একটা জবরদস্ত নির্দেশক আছে বটে পিছনে।

কিন্তু কী উপায়ে তাহ'লে নাট্যকে নাট্যকারের উপর স্থাপন করা যায়? ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে বোঝা দরকার।

রবীন্দ্রনাথও গল্প লিখেছেন, শরৎচন্দ্রও গল্প লিখেছেন। গ্রামের গল্পই লিখেছেন, দু-জনে। কিন্তু যে যার নিজের দৃষ্টি থেকে দেখা দুটো ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করেছেন। একই বাঙলার গ্রাম, একই গাছপালা, একইধরনের মানুষ, একই রিয়্যালিটি। কিন্তু একজনের বোষ্টমী আর-একজনের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে নেই। সেখানে আছে কমললতা, সেখানে আছে রাজলক্ষ্মী। তারা কিন্তু রবীন্দ্রনাথে নেই। গ্রাম্য খল চরিত্রের লোক দু-জনের লেখাতেই আছে। অথচ তারাও পৃথক্, একজনের সৃষ্টি আর-একজনের সৃষ্টির সঙ্গে কিছুতে গুলিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। একজনের গোলোক চাটুজ্যে আর-একজনের

জগতে বাসই করে না। কিংবা বিভূতিভূষণের গ্রাম। সে যেন আর-একটা জগৎ। একই গ্রাম, কিন্তু আর-একটা জগৎ।

এই যে-তফাৎ, এটা হ'লো শিল্পীর গভীরতম সত্তার উপলব্ধি অনুযায়ী। সেইজন্য একই বহির্জগৎ বার বার ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর চোখে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। তেমনি একই নাটক, সেই নাটকে যতো ব্যাপ্তি থাকবে, ততোই সে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর হাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পাবে। এবং এই যে-স্বকীয়তা,এটা যতো গভীর হবে, যতোই মননশক্তির দ্বারা উজ্জ্বল হবে, ততোই দৃষ্টিসম্পন্ন দর্শকের দরকার হবে। অত্যন্ত দরকার।

অতীতে যখন নাট্যে রীতিপ্রকরণটাই বড়ো ছিলো তখন এতো অসুবিধে ছিলো না। গোঁফওয়ালা একটা কুৎসিতদর্শন লোক মদের গেলাস হাতে নিয়ে টলতে টলতে আর খল্ খল্ ক'রে হাসতে হাসতে আসরে ঢুকলেই আমরা বুঝতে পারতুম যে এই হ'লো বদমাইশটা। কিন্তু পৃথিবী উন্নতি করার সঙ্গে সঙ্গে তখনকার দিনের ঐ-সব অবশ্যপালনীয় প্রথা শিল্প-জগৎ থেকে সরানো হয়েছে। এখন প্রত্যেকটা শিল্পী প্রায় একলা। একলা দাঁড়িয়ে তাকে নিজের বিশিষ্ট জগতের খবর দিতে হবে। অথচ চতুর্দিকে বিজ্ঞ সমালোচকেরা কেবলই কোনোমতে একটা লেবেল মেরে দিলে কাজ হাল্কা হবে ব'লে হাতে আঠা-লাগানো কাগজ নিয়ে সেঁটে দেবার জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তারই হুড়োহুড়ির মধ্যে স্বকীয়তা বোঝবার চোখ থাকা চাই, কান থাকা চাই, সহৃদয় দর্শকদের।

নাট্যে একটা গল্প ধরা হয় হঠাৎ একেবারে মাঝখানের কোনো ঘটনা থেকে। তারপর ঘটনা থেকে ঘটনায় চলতে থাকে। উপন্যাসের মতো আনুপূর্বিক বিবরণ দেবার সময় থাকে না, ফলে সেই চলমান স্রোতের মধ্যে থেকেই বুঝে নিতে হয় মানুষগুলোকে, তাদের অন্তর্বিরোধকে। ঠিক যেমন পৃথিবীতে চলতে চলতেই আপনি আন্দাজ ক'রে নেন আপনার আশেপাশের মানুষগুলো কে কেমনধরনের লোক।

একটা উদাহরণ ধরা যাক। 'সাজাহান' নাটকের প্রথম দৃশ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র দারা পিতাকে খবর দেয় যে সিংহাসনের লোভে বাকি তিন ভাই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

দারা বলে — পিতা, আপনি চিন্তিত হবেন না। এ-বিদ্রোহ দমন করতে আমি জানি।

সাজাহান বলে — না, আমি তার জন্যে ভাবছি না দারা। আমি ভাবছি, এই ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ —

সাজাহান যে কী চরিত্রের তার একটা পরিচয় হয়তো এই কথাগুলোতেই প্রথম পাওয়া যাবে। এক হ'তে পারে যে, সাজাহান একজন অবসর-প্রাপ্ত অথর্ব পিতা। বিষয়-সম্পত্তির লোভে ছেলেরা লড়াই করবে, হয়তো একটা ছেলে আর-একটাকে মেরেই ফেলবে, এইসব ভয়ের জন্যে ঠাণ্ডা হ'য়ে কথা ব'লে যতোটা পারা যায় মিটমাট ক'রে ফেলারই চিন্তা করছে, দারার বিদ্রোহ-দমনের কথাকে বেশী উৎসাহ দিতে চাচ্ছে না।

আবার এ-ও হ'তে পারে যে সাজাহান একজন কবি। যুদ্ধ, লড়াই, এ-সমস্ত তার কাছে শৌর্যের বিষয়। দামামা বাজলে তার রক্ত নেচে ওঠে, তাতে কাব্য আছে। কিন্তু সম্পত্তির লোভে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করাটা যেন অত্যন্ত নীচ, অত্যন্ত কুৎসিত কাজ, — বলতে গিয়ে যেন ধিক্কারে তার কথা বন্ধ হ'য়ে যায়।

কিংবা, এ-ও তো হ'তে পারে যে সাজাহানের আজ মনে প'ড়ে যাচ্ছে যে সে নিজেও একদিন নিজের ভাইদের হত্যা করিয়ে সেই রক্তকলঙ্কিত হাতে মুকুট তুলে নিয়ে মাথায় পরেছে। হয়তো আজ বৃদ্ধ সাজাহানের মনে হচ্ছে Sins of the fathers visit their children। এ-পাপ তার বংশের পাপ।

এখন ধরা যাক যে ভালো অভিনেতারা এইরকম ভিন্ন ভিন্ন ইঙ্গিত দিয়ে অভিনয় করলেন। কিন্তু এগুলো তো ভীষণ বাড়াবাড়ি ক'রে দেখাবার নয়; এগুলো খুবই আলতোভাবে সম্পাদন করবার কথা। তখন সেই ইঙ্গিত-গুলোতে আনন্দ পাবার মতো সুরুচিসম্পন্ন বিদগ্ধ দর্শকদের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। সেই দর্শকরা তখন দেখতে পান যে নাট্যকারের আঁচল ছাড়িয়ে কী ক'রে নাট্য স্বপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ইতিহাসে আছে, দু-জন ইংরেজ অভিনেত্রী Lady Macbeth-এর ভূমিকা দু-রকমভাবে অভিনয় করেছিলেন। সেই প্রসার আছে ব'লেই তো অভিনয় একটা শিল্প।

কিন্তু এই স্বকীয়তা প্রকাশের অর্থ কী? কেউ যদি বলেন যে, আমি তো আমার মতো। সুতরাং আমি যদি কেবলই নিজের গোটাকতক বিশিষ্ট ধরনধারণের পুনরাবৃত্তি ক'রে যাই তাহ'লেই কি সেটা অভিনয় হবে?

উত্তরে বলা যায় যে, না, সেটা আপনার behaviour হবে, acting হবে না।

তফাৎটা কী?

ধরুন, একটা কুকুর। সে তো অভিনয় করে না, সে শুধু নিজের মতো behave করে, এবং সেই behaviourটা নির্দেশক প্রয়োজনমতো কাজে লাগিয়ে দেন। সেটা acting নয়। ফিল্মের রাজ্যে জন্তু ও মানুষ নিয়ে এ-রকম অজস্র হ'য়ে থাকে। এখানে অবশ্য তার আলোচনায় কাজ নেই।

Behaviour ছেড়ে acting করতে গেলে তাই অভিনেতাকে মননসম্পন্ন ব্যক্তি হ'তে হয়। তার কাজ নয় কেবল একটা চরিত্র হ'য়ে-ওঠা। তার কাজ অভিনেয় চরিত্রের একজন টীকাকার হওয়া। এইখানে কুকুর, ভেড়া, গরু, ছাগলের 'অভিনয়ের' সঙ্গে তার তফাৎ। এই টীকা করতে ব'সে অজস্র ছোটো ছোটো details আসে যাতে অভিনেয় চরিত্রটিকে নানান্ দিক থেকে সম্পূর্ণ ক'রে দেখানো যায়। এলিওনোরা দুজের অভিনয়ে এইরকম details লক্ষ করেছিলেন বর্নার্ড শ। সেই লেখাটা প'ড়ে আমরা উপকৃত হই।

তাই যখন শিশিরকুমারের মতো কোনো অভিনেতার অভিনয় দেখতে যাবে দর্শক তখন রাম বা আলমগীর বা নাদির শাহের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর কী commentary সেইটাই দেখবে, সেই সৃষ্টির আনন্দের শরিক হবে। নইলে ঐ 'যথাযথ'ভাবেই দেখে আসতে হবে।

তাই বার বার ক'রেই আমার মনে হয় যে, নাট্য হ'লো অভিনয়াশ্রয়ী। আর-সমস্তই হ'লো এর আভরণ। এমন-কি নাট্যকারের লিখিত ভাষার কাব্যও অনেক সময়ে এর বাধাস্বরূপ। নাট্যের যে-কাব্য তা ভাষার ওপর নির্ভর করে না। যেমন 'মাদার কারেজ' নাট্যে শেষ দৃশ্যে যখন মা গাড়ীটা টেনে নিয়ে চলে। অন্ধকার মঞ্চের মধ্যে কেবল ঐ-গাড়ীটা আর মায়ের ওপরে আলো। মা গাড়ীটা টেনে চলেছে, আর পায়ের নীচে রিভল্ভিং মঞ্চ উল্টোদিকে ঘুরে যাচ্ছ। ফলে অন্ধকারের মধ্যে মা যেন গাড়ী টেনেই চলেছে, টেনেই চলেছে। এই হ'লো কাব্য। একেবারে মঞ্চের নিজস্ব কাব্য। কিন্তু এর ভিত্তি হ'লো অভিনয়। ভিত্তি যদি নাট্যকারের গল্প হ'তো তাহ'লে হয়তো ডিটেক্‌টিভ নাটকই শ্রেষ্ঠ নাট্যগুণান্বিত ব'লে ইতিহাসে আদৃত থাকতো।

আজও আমাদের নাট্যসংস্কৃতি সম্পর্কিত নানান্ প্রচেষ্টায় আমরা যদি আমাদের আধুনিক মনকে নাট্যের মধ্যে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি, কেবল নাট্যকারের সংলাপ বলার মধ্যে নয়, তাহ'লেই আমরা বাঁচবো, তাহ'লেই সত্যকার ভালো নাটক লেখবার পথও খুলে যাবে।

গ্রীকযুগে কাব্য এবং তার আবৃত্তির ওপরেই ঝোঁক দেওয়া হ'তো সবচেয়ে বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষে বহু অতীত থেকেই নাটক হ'লো দৃশ্যকাব্য। তাই পশ্চিমে শ্রবণের ওপর ঝোঁক দেওয়া হয়েছে, আমাদের এখানে দর্শনের ওপর (শ্রী মনোমোহন ঘোষ 'নাট্যশাস্ত্রে'র ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় এ-কথা বলেছেন)। অনুমান করা যায় যে সেইজন্যেই ভারতবর্ষে ঐ প্রাচীন যুগেই অঙ্গভঙ্গী ও হস্তমুদ্রার অতো ধারাবদ্ধ বিবরণীর গ্রন্থনা সম্ভব হয়েছিলো। আর সেই গ্রন্থনার মূলে ছিলো অভিনয়কলা।

কিন্তু আজ আধুনিক নাট্যপ্রচেষ্টার দিনে কীভাবে অভিনয় করলে বলা যাবে যে এই অভিনয়পদ্ধতি আধুনিক, এবং এটা সৎ নাট্যপ্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত? কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করে ব'লেই তো কেউ প্রগতিবাদী বা আধুনিক হ'য়ে যেতে পারে না।

অর্থাৎ, সেন্টিমেন্টাল বাঙলা থিয়েটারের সিরাজদ্দৌলা হিসাবে শ্রী নির্মলেন্দু লাহিড়ী অতুলনীয় অভিনয় করতেন, কিন্তু সেই ধারা অনুসরণ ক'রে কেউ যদি আধুনিক নাটকে সেন্টিমেন্টাল প্রবাহ আনেন তাহ'লে সেটা কি আধুনিক ও সৎ নাট্যসংস্কৃতি?

এখানে ধারা অনুসরণ করার কথাটা কেবলমাত্র নির্মলবাবুর গলার দোলানি বা মুদ্রাদোষ অনুকরণের কথা বলছি না, তারচেয়ে ব্যাপক অর্থে কথাটা ধরা যাক। অর্থাৎ অভিনেয় চরিত্রকে দেখবার ভঙ্গী সম্পর্কে কথাটা ধরা যাক। যেমন, 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজ যখন সভাসদদের বলে 'এ বাঙলা হিন্দুর না, এ বাঙলা মুসলমানের না, মিলিত হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি এই বাঙলা' — তখন একভাবে নির্মলবাবুর সিরাজ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতো আবেগকে। এবং সেইজন্যে — যতোদূর আমার মনে পড়ে — তিনি বলতেন — '··· মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাঙলা'—

এবং সেই আবেগ প্রকাশের একটা বিশিষ্ট কৌশল ছিলো। কণ্ঠস্বর তুলতে তুলতে ক্রমশ উঁচু পর্দায় যেতো, এবং গুলবাগ কথাটি থাকতো সেই স্বরগ্রামের

শীর্ষে। দর্শকদের স্বতোৎসারিত হাততালিতে 'এই বাঙলা' কথাটা প্রায় শোনা যেতো না। সেই কৌশলের অক্ষম অনুকরণেও এখনো লোককে যাত্রার আসর মাতিয়ে তুলতে দেখেছি। অথচ এ-কথাটা একেবারে যুক্তির মতো ক'রে বলা যেতো। সুর না-দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। তাতে শারীরিক শিহরণ কিন্তু হ'তো না। কোনটা আমরা দর্শক হিসেবে চাই ?

মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের চাণক্য চরিত্র বিশ্লেষণে এক অন্যধারার প্রকাশ আছে। যেটা বুদ্ধিনির্ভর। তাতে আবেগকে খাটো করা হয়নি কোথাও, হৃদয় ও বুদ্ধির সুসমঞ্জস ছন্দই বজায় রাখা হয়েছে। সেটা আছে তাঁর 'থিয়েটার প্রসঙ্গে' নামক বইটাতে।

যাই হোক্, এগুলো খালি উদাহরণ। আমাদের আসল প্রশ্ন ছিলো যে নাট্য যদি অভিনয়াশ্রিত হয়, তাহ'লে কোন্ অভিনয়কে আধুনিক বলবো ?

এর একটা সাধারণ উত্তর চট্ ক'রেই হয়তো কেউ দিয়ে বসবেন —'কেন ? স্বাভাবিক অভিনয়। আগের দিনের অভিনয় অস্বাভাবিক ছিলো, আজ-কালকার আধুনিক রীতি হচ্ছে স্বাভাবিক অভিনয়।'

নাটমঞ্চের সঙ্গে আমার পরিচয় যতোই দীর্ঘ হচ্ছে অনেক জিনিস আমার অবোধ্য লাগছে। অনেক প্রশ্ন, যাদের সহজ সমাধান আমি নিজেও নিরঙ্কুশ মনে কতোদিন করেছি এবং অপরকেও করতে দেখেছি, আজ তারা এমন ডালে-পালায় কন্টকিত হ'য়ে উঠেছে যে সমাধান আর সহজলভ্য নয়।

আমরা অভিনয় কবি। যাঁরা দেখে প্রশংসা করেন তাঁরা বলেন, স্বাভাবিক অভিনয়। বলা প্রয়োজন, আমি সাধারণ দর্শকের মতের আলোচনা করছি না ; যাঁরা জ্ঞানী-গুণী যাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ, যাঁরা সাহিত্যিক বা যাঁরা শিল্পবোদ্ধা ব'লে পরিচিত, তাঁদের অনেকের সঙ্গে যে-আলোচনা হয়েছে তারই ভিত্তিতে এই আলোচনা।

স্বাভাবিক মানে কী ? শুনেছি, স্বাভাবিক মানে হ'লো একাত্মীকরণ : অভিনেয় চরিত্র আর অভিনেতা যেন একই সত্তা। তাই অভিনয় দেখতে দেখতে যেখানে ভুলে যাই যে অমুককে দেখছি, কেবল মনে হয় যে অভিনীত চরিত্রটিকেই দেখলাম, সেইখানেই অভিনয় স্বাভাবিক ও সার্থক।

কিন্তু আমরা আমাদের জ্ঞানে দেখেছি, শিশুদের দিয়ে অভিনয় করালে তা ঐ-রকম বেশী স্বাভাবিক মনে হয়। তাদের সামনে বড়োদের অভিনয়, কি

আওয়াজে কি বাচনভঙ্গীতে, একটু আড়ষ্ট লাগেই লাগে। এমন-কি, শিশু যদি বেসুর গলায় গান গায় বা বেতাল ছন্দে নাচে, সেটাও আমাদের ভীষণ তৃপ্তি দেয়। স্বাভাবিক ব'লেই তৃপ্তি দেয়, স্বাভাবিক অভিনয় ব'লে নয়। অর্থাৎ শিশুটি স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করেনি, তার স্বাভাবিকত্বকে ব্যবহার করা হ'লো মাত্র।

তেমনি যদি বোধের আরও নীচু স্তরে যাই সেখানেও দেখা যাবে যে একটা কুকুরকে বা পাখিকে শিখিয়ে অভিনয় করানো যায়, এবং সেটা দেখতে ভীষণ স্বাভাবিক লাগে; একবারও মনে হয় না যে পাখিটা বা কুকুরটা অভিনয় করছে। তা হ'লে স্বাভাবিক অভিনয় ব'লে যে-তারিফ করা হয়, সেটা কেন?

অভিনয় তো কেবলমাত্র 'আপনি চায়ে ক' চামচ চিনি খান—' জাতীয় মনোভাবের প্রকাশ নয়। অনেক গভীর মনোভাব, অনেক গভীর উপলব্ধি তাতে প্রকাশ করবার থাকে। তখন কি কেবলমাত্র স্বাভাবিকত্বের ওপর নির্ভর ক'রে পার হওয়া যাবে? ধরা যাক, শেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের নাটক, সেখানে ভাষাই তো দৈনন্দিন ব্যবহারের স্বাভাবিক ভাষা থেকে অনেক ভিন্ন। সুতরাং দেখা যাবে যে স্বাভাবিকত্বটা ওপরের নয়, ভিতরের ব্যাপার এবং তা প্রকাশের যে-কৌশল সেটা মঞ্চের ওপর তথাকথিত 'ফ্রী' হওয়া বা চটুলভাবে 'আপনি চায়ে ক' চামচ চিনি খান' বলার ওপরেই নির্ভর করে না।

অবশ্য এ-সব অভিনয়েরও দরকার থাকে হয়তো, কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্য হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অভিনয়। সেই অভিনয়ের সংজ্ঞা কেবলমাত্র স্বাভাবিক অভিনয় নয়।

স্তানিস্লাভস্কির 'মাই লাইফ ইন আর্ট' বইয়ে একটা কাহিনী আছে। তাঁদের দল একবার নীপার নদীর তীরে এক পুরনো প্রাসাদে বেড়াতে যান। সেখানকার সমস্ত পরিবেশটা যেন টুর্গেনিভের বইয়ের বর্ণনানুযায়ী। বাগানের একটা দিক দেখে তাঁদের মনে হ'লো, টুর্গেনিভের 'এ মান্থ ইন দি কান্ট্রি' নামক নাটকের অভিনয়ে তাঁরা দ্বিতীয় অঙ্কে যে-দৃশ্যসজ্জা মঞ্চের উপর করেছিলেন বাগানের সেই দিকটা অবিকল সেইভাবে সাজানো। এই দেখে লোকে বললে যে তাঁরা এই সত্যকার পরিবেশের মধ্যে ঐ-নাটকের দ্বিতীয়

অঙ্কটা অভিনয় করুন। সকলে রাজী হলেন, অভিনয় শুরু হ'লো। স্তানিস্লাভস্কি কিন্তু মাঝপথে থেমে গেলেন। তাঁদের পৃথিবীবিখ্যাত স্বাভাবিক ও সহজ অভিনয় এই স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঠেকতে লাগল। আরো-একটা গল্প আছে ঐ-বইয়ে। টলস্টয়ের 'দি পাওয়ার অফ ডার্কনেস' নাটকের জন্য তাঁরা গ্রাম থেকে এক বুড়ীকে আনিয়েছিলেন। সে-বুড়ী এতো স্বাভাবিক যে শেষপর্যন্ত তাকে বাদ দিতে হয়। পুরো দলের অভিনয়ের সঙ্গে এতো বেখাপ।

এ-উদাহরণগুলো সংক্ষেপেই উদ্ধৃত করা হ'লো।

আজকের বাঙলাদেশে ব্যবসায়িক মঞ্চ বা সিনেমা থেকে আধুনিক নাট্যপ্রচেষ্টা — সর্বত্রই তো এ-কথা বহুল প্রচারিত। তাহ'লে কি অভিনয়ের কোনো প্রকারভেদ নেই? সব নাটকের অভিনয়ই কি এক অভিনয়? ব্যবসায়িক মঞ্চ বা সিনেমার অভিনয় আর নবনাট্য সংস্কৃতির অভিনয়ও কি একই অভিনয়? তা যদি হয়, তাহ'লে আধুনিক বা সৎ নাট্য-প্রচেষ্টা নাট্যের ওপর নির্ভর করে না, করে নাটকের ওপর। তাই নয় কি? কারণ, ভিন্নতা তো মাত্র সেখানেই তাহ'লে। অভিনয়ে তো নয়।

এবং যদি দেখা যায় যে নাটক আধুনিক হ'তে পারে, কিন্তু অভিনয়ের সে-রকম আধুনিক হবার কোনো ক্ষমতা নেই, এর যা-কিছু প্রকাশভঙ্গী ও কৌশল, সবই, শিল্পের ক্ষেত্রে বা ব্যবসার ক্ষেত্রে, এক, তাহ'লে আধুনিক-নাট্য-প্রচেষ্টা, আধুনিক নাট্যসংস্কৃতি, এ-সব নাম হয়তো ভ্রমাত্মক। আধুনিক নাটক-প্রচেষ্টা বললেই তো তাহ'লে ঠিক বলা হবে।

কিংবা যদি দেখা যায় যে নির্মলবাবুর কণ্ঠের দোলানিটা বাদ দিলেই, বা শিশিরবাবুর টেনে টেনে কথা বলা বাদ দিলেই (এই শিশিরকুমারেরই কিন্তু এক সময়ে স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্য দেশব্যাপী খ্যাতি ছিলো) অভিনয় স্বাভাবিক হ'য়ে যাবে, তাহ'লে প্রশ্ন উঠতে পারে যে মিলোর ভেনাসকে একটা জাঙিয়া ও ব্রা পরিয়ে দিলেই সেটাও আধুনিক তক্ষণশিল্প ব'লে অভিহিত হবে না কেন?

অপর একটা মনোভাব আছে অনেকের মধ্যে যে কোনোরকম আবেগ থাকলেই সেটা নাকি পুরানো। তাহ'লে রাজা অয়দিপাউসের জানবার যে তীব্র আগ্রহ, এবং সেই নির্মম সত্য জানার পরে তার যে-অবস্থা, সে-আবেগ

কি প্রকাশ-রহিত থাকবে? 'রক্তকরবী'তে রাজার এঁটোদের দেখে নন্দিনীর যে-ব্যাকুলতা সেটাও কি প্রকাশ-রহিত?

অর্থাৎ দেখা যায় যে, আমরা যদি সৎ আবেগ ও সস্তা ভাবালুতার পার্থক্য না-করতে পারি তাহ'লে নাট্য তো দূরের কথা মানুষ হিসাবেই আমরা ছোটো মানুষ থাকবো। ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে স্নানের ময়লা জল ফেলতে গিয়ে স্নানের টবের শিশুটাকে পর্যন্ত ফেলে দেওয়া। সস্তা সেন্টিমেন্টকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আমরা যদি আবেগকেও ঝেড়ে ফেলি তাহ'লে আমাদেরও সেই দশা হবে।

কিন্তু প্রশ্নটা র'য়েই যাচ্ছে যে অভিনয়কলা যদি মূল নাট্যবস্তু হয় তো তার আধুনিক রূপ কী হবে, সৎ প্রচেষ্টা কোন্ পথে হবে?

এ-প্রশ্নের উত্তর বোধহয় আমাদের ভাবা দরকার। কারণ বহু ক্ষেত্রেই আমার মনে হয়েছে যে সাধারণভাবে যে-সব নাটক আমরা অভিনয় হ'তে দেখি তার মধ্যে গভীর উপলব্ধির কথাকে কেবলি এড়িয়ে যাওয়া হয়, — ফিল্মের গল্পের মতন। এবং তার স্থলে আমদানি করা হয় হৈ হট্টগোল, সেনসেশ্যনালিজম্ আর যান্ত্রিক স্টান্ট্। গভীরভাবে গভীর কথা বলবার ক্ষেত্র যেন আরো-একটু সঙ্কীর্ণ হ'য়ে গেছে। এবং সেইজন্যেই অভিনয়ে নিখাদ সেন্টিমেন্টের অতীতাশ্রয়ী অভিনয়ভঙ্গীর এতো প্রাদুর্ভাব। যখনই আবেগের কথা বলতে হয় তখনই মনে হয় অভিনেতা যেন আগের যুগ থেকে কথা বলছেন। আজকের দিনের মানুষ হিসাবে তাঁকে আবেগ বিশ্লেষণ করতে দেখি না।

এইখানে একটা মস্ত কথা আছে। সেটা হচ্ছে যে, অভিনয় চিরকালই বর্তমানের বস্তু, সেটা ভবিষ্যতের নয়। ফলে, আজ দিনটাতে দর্শক যতোটা তার কল্পনাকে ছাড়তে পারবে ততোটাই ভালো অভিনয় সে পাবে, তার চেয়ে বেশী কোনো অভিনেতারই দেবার ক্ষমতা নেই, কারণ, নেবার লোক নেই।

এইরকম দুটি ট্রাজিডি আমি নিজে জানি। এক শ্রী যোগেশ চৌধুরী, আর অপরজন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এঁদের অভিনয়ভঙ্গী স্বতন্ত্র ছিলো। অনেক বেশী জাগ্রত বুদ্ধির। এবং বুদ্ধি ও হৃদয়ের অপূর্ব মিলনের। কিন্তু এই দু-জন অভিনেতাই তাঁদের সমসাময়িক লোকের কাছে যথোচিত সম্মান ও অর্থ পাননি। পেতেন, যদি তাঁরা ব্যবসায়িকভাবে পপুলার হতেন। কিন্তু

তাঁরা তা ছিলেন না। শিল্পী হিসেবে তাঁরা তাঁদের যুগের থেকে ভিন্ন ছিলেন। এবং সেই ভিন্নতার মূল্যও তাঁদের দিতে হয়েছে। তাঁদের সমস্ত কষ্টই ব্যর্থ হবে যদি আমরাও আজ গালভরা কথার আড়ালে লুকিয়ে নিজেদের কাজটাকে ভালো ক'রে না-বুঝি। বিগতযুগ যেমন নিজেকে বঞ্চিত করেছে বোধের অভাবে, তেমনি আমরাও বঞ্চিত হবো সেই একই পাপে।

এই প্রশ্ন তোলাটাই আমার কাজ।

এ-ক্ষেত্রে বক্তব্য হচ্ছে যে স্বাভাবিক অভিনয় তা হ'লে এমন জিনিস যা সত্যকে স্পষ্ট করে, সাধারণ স্বাভাবিকত্বকে অনুকরণ করে না। তা হ'লে স্বাভাবিক বলাই বা কেন ?

ছবি বহুদিন থেকে স্বাভাবিকত্ব এড়িয়ে নন-রিপ্রেসেনটেশনাল হয়েছে, সাহিত্য জোলার যুগ কাটিয়ে নন-রিপ্রেসেনটেশনাল হয়েছে। এখন চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখক চরিত্রটির এতো কাছে যান যে পদার্থবিদ্যায় যেমন পদার্থ উবে গিয়ে রয়েছে শুধু বৈদ্যুতিক পরমাণু আর ফাঁকা জায়গা, তেমনি গোটা মানুষটার তথাকথিত স্বাভাবিক চেহারা উড়ে গিয়ে রয়েছে তার বিভিন্ন বিশ্বাস আর উপলব্ধি। এ-সমস্ত প্রগতি যদি আমরা অন্য সকল শিল্পে অবিসংবাদিত ব'লে ধ'রে নিই তাহ'লে অভিনয়শিল্প সম্বন্ধে কেবল স্বাভাবিকত্বকে সংবর্ধনা জানালে মনে স্বতই সন্দেহ জাগে যে অপরাপর ক্ষেত্রের উপলব্ধিটাও ত্বকছোঁয়া।

এইটুকু আমার কাছে স্পষ্ট যে অভিনয়ের স্বাভাবিক হবার দায়িত্ব নেই, কিন্তু সত্য হবার আছে। কবিতা ক'রে বললেও যেমন হ্যামলেটে জীবন্ত সত্য আছে। সেই সত্যই আমাদের লক্ষ্য। তাই 'বিসর্জন'-এ জয়সিংহ যখন মিনতি ক'রে বলে, 'দেবী, আছ, আছ তুমি। দেবী থাকো তুমি'। তখন তার মধ্যে আজকের যুগের একটা মর্মান্তিক সত্যকে শুনতে পাই।

তাই কোনো চরিত্রের বিশিষ্টতা যদি আমরা উদ্‌ঘাটিত করতে চাই তা হ'লে সেই চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে নয় বা নিজেকে সেই চরিত্র মনে করিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন নয়, কেবল অভিনয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য (যাকে বলা হয় 'ফাইন টাচেস') দিয়ে তাকে স্পষ্ট করা উচিত। অনেক সময়ে সেটা

ডেলিবারেট, যেমন ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাটকে চরিত্রের মুখে গান দেওয়াটা ডেলিবারেট।

এই যে সচেতন উন্মোচন, এটা সম্পূর্ণভাবেই দর্শক-নির্ভর। দর্শক যদি পয়েন্টগুলো না-দেখে এবং 'স্বাভাবিক' অভিনয়-স্রোত কামনা করে, তা হ'লে 'সত্য' অভিনয় সম্ভব কি ?

এই তথাকথিত স্বাভাবিকত্ব নেই ব'লেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক নাটক ব'লে অনুমিত হয়নি। আমাদের চিন্তা যে, রবীন্দ্রনাথের আরো নাটক বাঙলাদেশের সত্যকামী নাট্যগোষ্ঠীগুলি কী পদ্ধতিতে অভিনয় করবে ?

অভিনয়শিল্প

যে-কোনো কারণেই হোক্ আমার কিছু শুভানুধ্যায়ীর ধারণা হয়েছে যে আমি বোধহয় খানিকটা অভিনয় শেখাতে পারি। অনেক জায়গায় তাই অনুরোধও শুনতে হয়, আমি যেন অভিনয় সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু আলোচনা করি।

এ-রকম কঠিন বিষয় সম্পর্কে কঠিন আলোচনা শুরু করতে আমার নানা কারণেই সংকোচ বোধ হয়। প্রথমত, আমি ঠিক লেখক নই ; দ্বিতীয়ত নিজের অভিনয়জ্ঞান সম্পর্কে আমার নিজের মনেই যথেষ্ট সন্দেহ আছে ; তৃতীয়ত এ-সব সত্ত্বেও আমার মনে যে-সমস্ত কথা ওঠে সে-সব কথা যে কীভাবে বললে ঠিক বোঝানো যাবে, বা, নিজে থেকে না-বুঝলে এ-কথা কাউকে ব'লে বোঝানো যায় কিনা তা আমি আজও জানিনে।

তবু যদি আলোচনা করতে হয় তাহ'লে আমাকে গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়। যেমন, অভিনয় কাকে বলে ? বা, ভালো অভিনয় কাকে বলে ? মনে হয় এ-সম্পর্কে বেশীরভাগ লোকেরই কোনো ধারণা নেই। তা যদি থাকতো তা হ'লে যে-কোনো সুন্দর চেহারার তরুণ বা তরুণী ছবিতে বা মঞ্চে নায়ক বা নায়িকা সেজে নামতেই এতো হৈ-চৈ পড়তো না। সভায় সম্মেলনে সমারোহ ক'রে তাঁদেরই বৎসরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলে বিজ্ঞাপিত করা হ'তো না। কারণ, তাঁরা নতুন শুরু ক'রেই কিছু বিরাট শিল্পী হ'য়ে যেতে পারেন না। আর যদি তা পারেন তাহ'লে অভিনয়কে শিল্প বলবার কোনো দরকার নেই, অভিনয় অন্য জিনিস। অভিনয়-অনুশীলনের কোনো প্রয়োজন নেই, বুদ্ধি বা হৃদয়বৃত্তি মার্জনার কোনো প্রয়োজন নেই, বয়সের ধর্মে যা করা যাবে তাই-ই আদি এবং তাই অনন্ত। এবং এই ধারণা প্রচারের জন্য কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা ব্রত নিয়েছে। বোম্বের একটি ইংরেজি পাক্ষিক মহাসমারোহে প্রত্যেক বৎসর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচন করেন নায়ক-নায়িকার মধ্যে থেকে, এবং শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্র অভিনেতা বা অভিনেত্রী নির্বাচন করেন অভিনয়ক্ষমতার বিচারে। অপূর্ব প্রহসন।

মতিলাল বা ডেভিড বহুদিন থেকে অভিনয় করেছেন, এঁদের মার্জিত বুদ্ধি, অনুশীলন বা অভিজ্ঞতা, কিছুই আদর পাবে না, তাঁরা হবেন মাত্র পার্শ্বচরিত্র অভিনেতা, এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলা হবে যাঁরা নায়ক সাজবেন তাঁদের, তা তাঁরা মতিলাল-ডেভিডের তুলনায় যতোই কাঁচা হন তবুও। আমাদের বাঙলা-দেশেও এর ঢেউ লেগেছে। সেদিন চ'লে গেছে যখন লোকে বলতো যে আজ বাঙলা যা ভাবছে কাল সারা ভারতবর্ষ তাই ভাববে। এখন আমরা বোম্বের পাছ-দোহারি করি। এবং বোম্বে পাছ-দোহারি করে হলিউডের।

একটা কথা স্পষ্ট হওয়া দরকার, কেউ কেউ যেন ভুল না-বোঝেন যে নতুন লোক সম্পর্কে বা যৌবন সম্পর্কে বা সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার অবজ্ঞা। তাহ'লে আমার ওপর অবিচার করা হবে এবং এতাবৎকাল আমি যা করেছি সব মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। আমার দুঃখ যে গুণের কদর নেই। এবং সাধারণ লোক ব্যবসাদারদের কথা শোনে ব'লেই অনেক সময়ে নিজেদের স্বাভাবিক বোধ হারিয়ে ফেলে। তবু ভরসার কথা, বোধটা সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় না, বা চিরকালের জন্য হারায় না। এবং তাই এখনো বাঙলাদেশে সত্যজিৎ রায়ের মতো লোক সম্ভব হয়। তাই 'পথের পাঁচালী'র মতো ছবি লোকপ্রিয় হয়। কিন্তু কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে অপূর্ব অভিনয় হয়েছে এ-ছবিতে তা কি আদর পাবে?

তারপর আরো কথা আছে। চলতি আলাপ আলোচনায় বলা হ'য়ে থাকে যে অভিনয় খুব 'স্বাভাবিক' হবে এবং অভিনেতা নিজেকে ভুলে নিজের অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। এই দুটো কথার একটাকেও আমার ঠিক ব'লে মনে হয় না। বরঞ্চ গোলমেলে ব'লেই মনে হয়।

কোনো শিল্পকলাই কোনোদিন 'স্বাভাবিক' নয়। স্বাভাবিক যে-ঘটনাগুলো জীবনে ঘটে তারই মধ্যে থেকে বেছে নিতে হয়, সাজিয়ে নিতে হয়, তবেই শিল্পকলা। এবং এই বাছাবাছি ও সাজানো গোছানোর মধ্যে একটা ছন্দ থাকা প্রয়োজন। এটা শিল্পসৃষ্টির নিজের নিয়মেই ঘটে, এবং এই পরিচ্ছন্নতা ও ছন্দোবদ্ধতা মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। নিজের প্রেমাস্পদ মারা গেলে মানুষ যখন মর্মান্তিক কষ্ট পায় তখন তার কিছুই ভালো লাগে না। সমস্ত পৃথিবী মিথ্যে ব'লে মনে হয়। তাই তখন সে ভালো ক'রে খায় না। ফলে কোষ্ঠ-পরিষ্কার হয় না, জিভ ময়লা হয়, মুখে দুর্গন্ধ হয়। এ-সব

অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সাধারণত শিল্পের ক্ষেত্রে এগুলো অপ্রয়োজনীয়, এক হাস্যরস উদ্রেক করার জায়গায় ছাড়া। শিল্পকে দেখতে হয় বা দেখাতে হয় কেবল সেই ব্যক্তির ক্ষুব্ধ আত্মাকে, তার রাত জেগে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে-থাকাকে, একলা ঘরের মধ্যে হঠাৎ খাটের বাজু আঁকড়ে ধ'রে তার অর্ধব্যক্ত আর্ত হাহাকারকে, তার সারা শরীরের থরথরানিকে। এবং চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন হয়, সাত দিনে এক সপ্তাহ হয়, এবং চার সপ্তাহের কিছু বেশী লাগে পুরো একমাস হ'তে। কিন্তু সেই পুরো একমাসের নানা তুচ্ছ অসংলগ্ন ঘটনাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তার দুঃখকে যদি একটি দৃশ্যের মধ্যে দেখাতে হয় তাহ'লে তাকে চেপে ছোটো করতে হয়, কাজে কাজেই সেটা তখন নির্যাসের মতো তীব্র এবং ঘন হ'য়ে ওঠে। সেই কাজ শিল্পীর। তার অনেক দিনের তিলে তিলে আহরণ-করা অভিজ্ঞতা এবং জীবনবোধ সে নির্যাসের মতো ছেঁকে নিয়ে পরিবেষন করে। এর মধ্যে স্বাভাবিক জীবনের শিথিলতা নেই, কান-পর্যন্ত-টানা ধনুকের ছিলার মতো এর সমস্ত পরিমণ্ডলটাই অতিতানিত।

অথচ বহু তথাকথিত বিদগ্ধজনকে দেখেছি যাঁরা অভিনয়ের মধ্যে এই-রকম পরিমণ্ডল দেখলেই ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গ হাসি টেনে বলেন — মেলোড্রামাটিক। তাঁদের কয়েকজনের কাছে জানতে চেয়েছি যে মেলোড্রামা মানে কী? তাতে খুব যে সন্তোষজনক একটা উত্তর পেয়েছি তা-ও নয়। তাঁরা বলেন, অভিনয় হওয়া উচিত একেবারে দৈনন্দিন জীবনবৎ তরল এবং স্বাভাবিক, এমন কোনো আবেগ প্রকাশ করা হবে না যা শতকরা নিরানব্বই-জন লোক জানে না এমন কোনো ঘটনা দেখানো হবে না যা সাধারণ স্বাভাবিক দিনে না-ঘটে। এইসব ব'লে একজন আবার স্তানিশ্লাভস্কির উদাহরণ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে মস্কো আর্ট থিয়েটার নাকি এরই সাধনা ক'রে সার্থক হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তাহ'লে স্তানিশ্লাভস্কি 'ওথেলো' প্রযোজনা করার চেষ্টা করেছিলেন কেন, 'ওথেলো'র কিছুই তো স্বাভাবিক নয়, দৈনন্দিনও না: না চরিত্রগুলো, না তাদের ভাষা, না ঘটনাগুলো কোনোটাই রোজ নিরানব্বইজনের জীবনে ঘটে না। অতি স্বাভাবিকভাবেই সন্তোষজনক কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না ভদ্রলোক। — জীবনটা ন্যাকা ছেলের দিনপাতের মতো নিস্তরঙ্গ বা শিথিল নয়। প্রত্যেকদিন সকালে ট্রামে-বাসে ভীড়, আপিস পাড়ার অস্থির চাঞ্চল্য, লক্ষ লক্ষ কাগজে ঢেরা পড়ছে,

অযুত টাইপরাইটার খট্ খট্ করছে, কোটি কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। আবার তেমনি প্রখরতা বিকালের দিকে, তেমনি ঊর্ধ্বশ্বাসগতি। এর মধ্যে কতো জায়গায় কতো মা অসহায় জানোয়ারের মতো আর্ত চীৎকার করতে করতে নতুন জীবনের জন্ম দিচ্ছে, কতো মুমূর্ষু শেষ নিঃশ্বাস নেবার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে ঢ'লে পড়ছে, কতো হাহাকার আকাশকে বিদীর্ণ ক'রে দিচ্ছে, কতো শাঁখের শব্দ তার ওপর প্রলেপ দিচ্ছে। এই চলেছে পৃথিবী জুড়ে, আর পৃথিবী ছুটেছে মহাশূন্যের মধ্যে। এই বেগের প্রখরতাকে ধারণ করার ভার শিল্পের। এর থেকে অর্থ বের ক'রে তাকে নির্যাসের মতো ঘন ক'রে যখন পরিবেষন করা হবে তখন সেটা অমৃতও হ'তে পারে, কিন্তু সেই অমৃত বলহীনের লভ্য নয়।

শিল্প স্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক মনের চাহিদা মেটানোর বস্তু। স্বাভাবিক জগৎকে স্বীকার করার পরই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। যতো বিরাট ক'রে, যতো গভীর ক'রে জীবনকে জানা যাবে ততোই মহত্তর শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। যে-লোক ভালো ক'রে জীবনকে জানলো না তার কতোটুকু প্রকাশক্ষমতা? সে কী ক'রে প্রকাশ করবে 'প্রফুল্ল' নাটকের ভজহরির চরিত্র, যে-ভজহরি দেখেছে বাপ খুন হ'লো, নিজেদের ঘর জ্ব'লে গেলো, ভাইবোনগুলো রাস্তায় নেমে না-খেতে পেয়ে ম'রে গেলো? সে কী ক'রে প্রকাশ করবে 'চরিত্রহীন' দিবাকরের চরিত্র, যে-দিবাকর কিবণময়ীর সঙ্গে রেঙ্গুনে পালিয়ে গিয়ে বস্তির মধ্যে ঘর বাঁধলো এবং অনুশোচনা ও অপরিতৃপ্তির জ্বালায় কদর্য হ'য়ে একদিন সেই কিরণময়ীকে লাথি মারলো? সম্ভব নয়। সে বড়োজোর পাশের বাড়ীর মেয়েকে প্রেমপত্র ছুঁড়ে দিতে পারে। বা গম্ভীর মুখ ক'রে উদাস চোখে ন্যাকা প্রেমের কথা আউড়ে যেতে পারে। কিন্তু যে-দর্শক জীবনে একবারও গভীর-ভাবে প্রেমে পড়েছে তার কাছে এগুলো অসহ্য ন্যক্কারজনক ব'লে মনে হয়। এদের অভিনয় কেবল তাদের কাছেই চলে যে-বেচারীরা জীবনে প্রেমে পড়বারও অবকাশ পায়নি। যে-অশ্বত্থামা দুধের স্বাদ জানে না তার কাছে দুধই বা কী আর পিটুলী-গোলাই বা কী! যা বাচ্ছা-ভুলানো গল্প, যার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য নেই, তা শিল্পের বাগানে আগাছা। এর মধ্যে অভিনয় করতে গিয়ে জীবনবোধের চর্চা করতে হয় না। হাসির সময়ে হেসে দিলাম, কাঁদার সময়ে চোখ ছল ছল ক'রে দিলাম (তা-ও গ্লিসারিনের সাহায্যে), বাকিটা

ক্যামেরাম্যানের বা নাট্যকারের কারুকার্য। সত্যিকারের শিল্পী হ'তে হ'লে জীবনে বাঁচা চাই। নিজের মনকে দরাজ ক'রে অজস্র অভিজ্ঞতা অর্জন করা চাই। তারপরে সেগুলো প্রকাশ করবার পদ্ধতি অনুসন্ধান করা চাই। অবনীন্দ্রনাথ আঁকার সম্বন্ধে যা বলেছেন, অভিনয়ের বেলাতেও তাই।

আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে অভিনেতার নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব থাকবে না, তার নাকি উচিত নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে একেবারে বেমালুম মিশে যাওয়া। বড়ো গোলমেলে কথা। অভিনেতার নিজের একটা চেহারা থাকে, একধরনের গলার আওয়াজ থাকে, এবং একধরনের মুখ চোখ থাকে, এগুলোকে কোনো সময়েই অভিনেতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে পারে না, এবং পারলেই যে খুব ভালো অভিনয় হয় তা নয়।

আবেগের অভিনবত্ব, প্রকাশভঙ্গিমার অভিনবত্ব, এই সমস্ত যদি না-থাকে তাহ'লে বড়ো অভিনেতা হয় না। শিল্পের কাজ নয় আত্মগোপন করা, কাজ হচ্ছে আত্মপ্রকাশ করা। বহুদিন আগে 'স্‌ভেনগালী' নামে একটা ছবি দেখেছিলাম। জন ব্যারিমুর তাতে দাড়িগোঁফ প'রে নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাতে তিনি তাঁর ভাই লাওনেলের হাবভাব আওয়াজ সমস্ত নকল করেছিলেন। তাঁর পক্ষে করাও সহজ ছিলো, কারণ দু-জনে ভাই। তবু দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিলো যে, জনের যদি বিশেষ-কিছু দেখাবার না-থাকে, যা একান্তই তার, তাহ'লে এ-চরিত্র লাওনেলকে দিয়ে অভিনয় করালেই হ'তো, আসল লাওনেল হয়তো নকল লাওনেলের চাইতে বেশী-কিছু করতে পারতেন। কারণ তিনি তো নিজের মতোই করতেন, তাতে তাঁর আত্মা প্রকাশ পেতো।

এর মানে এই নয় যে প্রত্যেকেই নিজের মনের মতো এক একটা চরিত্র দাঁড় করিয়ে নিলো এবং আমরণ সেই একই চরিত্র একই হাবভাব পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করতে করতে বেরিয়ে গেলো। জীবনের এই তো মুশকিল! কোনো একপেশে অর্থ করলেই কেলেঙ্কারী। এর সর্বত্র হচ্ছে বিপরীত অর্থের সমন্বয়। স্বাভাবিক হওয়ার বেলাতেও তাই। স্বাভাবিক নয়, অথচ স্বাভাবিক। আত্মপ্রদর্শন নয়, অথচ আত্মপ্রকাশ। এবং এই আত্মপ্রকাশে বৈচিত্র্য থাকা চাই — বারে বারে নতুন নতুন নাটকে, নতুন নতুন চরিত্রে।

এ-রকম ঘটনা হামেশা দেখা যাবে যে, একজন গ্রাম্য ছাপওয়ালা লোক — যার কথার উচ্চারণ বাঁকা, গলার আওয়াজ অ-তৈরী, চলাফেরা কেতাবিহীন — তাকে একটা গেঁয়ো লোকের চরিত্রে নামানো হ'লো এবং দর্শকরা তাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব'লে গ্রহণ করলো, একেবারে পুরো গেঁয়ো মনে হ'লো। এখানে কিন্তু নাম তার আত্মবিলুপ্তির জন্যে হ'লো না। তার গ্রাম্যতার প্রকাশের জন্যেই হ'লো (এবং যাঁরা আত্মবিলুপ্তির ভাষণ দেন তাঁরাই সবচেয়ে বেশী আহা আহা করেন)। — এই যদি শিল্পের পরাকাষ্ঠা হয়, তাহ'লে একে শিল্পই বলা চলে না এবং এর মধ্যে শেখবারও কিছু নেই। ফলে সেই অভিনেতার মাথা বিগড়ে যায় এবং তখন তার সেই গ্রাম্যতাও কেমন নকল, কেমন বাড়াবাড়ি মনে হয়। তারপর ক্রমে সবাই তাকে ভুলে যায়।

অল্প বয়সে যখন আমি অভিনয়টা আসলে কী বোঝবার চেষ্টা করছি সেই সময়ে পাড়ার থিয়েটারে 'রমা' নাটকের অভিনয় দেখেছিলাম। যিনি রমেশের অভিনয় করেছিলেন তাঁর মুখখানা দেখতে ভালো ছিলো, কিন্তু গলার আওয়াজ ব'লে কোনো বস্তু ছিলো না, এবং ব্যক্তিত্ব ব'লে কিছু ছিলো না। যাই হোক্, সেই রমেশ অভিনয়ের সময়ে কথাগুলো মোটামুটিভাবে আউড়ে গেলেন এবং দর্শকের মধ্যে (বিশেষ ক'রে মেয়েদের মধ্যে) বেশ সুখ্যাতি পেলেন। ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এ-সব কথা তখনো আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। অভিনয় আমার কাছে ভালো লাগলো না, অথচ বলবার উপায় নেই। মনে হ'তে লাগলো, এ-ক্ষেত্রে নাট্যকার শরৎচন্দ্র যা করবার সবই ক'রে গেছেন, দর্শকরা কেবলমাত্র সেই গল্পটাই মশগুল হ'য়ে দেখলো, এখানে অভিনেতার বোধহয় করবারই কিছু নেই, কারণ গল্পটাই মুখ্য এবং সেই গল্প যিনি সাজিয়েছেন তিনিই একমাত্র শিল্পী। নায়ককে শুধু সুন্দর দেখালেই হ'লো।

মনে হ'তে লাগলো, এর চেয়ে অপরেশবাবুর 'কর্ণার্জুন' অভিনয়ের পক্ষে অনেক ভালো নাটক। সেখানে শকুনি যখন বলে — 'তুমি দেখতে পাচ্ছো না দুর্যোধন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, ঐ-আগুনের শিখা লক্‌লক্ ক'রে আকাশ ছেয়ে ফেললে, ঐ-আর্তনাদ, ঐ-হাহাকার — হাঃ, হাঃ, হাঃ।' তখন অভিনেতার অনেক-কিছু করবার থাকে। এর জন্যে তাকে গলা তৈরী করতে

হয়, যে-গলায় ঝঙ্কার আছে, তাকে ভঙ্গী তৈরী করতে হয়, যে-ভঙ্গীতে রাজকীয় ছন্দ আছে, তাকে গোটা গোটা ক'রে উচ্চারণ শিখতে হয়, পৈশাচিক উল্লাসে হাসতে জানতে হয়। অতএব, নিশ্চয়ই 'কর্ণার্জুন' 'রমা'র চেয়ে অনেক ভালো নাটক। অন্তত অভিনয়ের পক্ষে।

ভাবলাম বটে, কিন্তু শান্তি পেলাম না। 'পল্লীসমাজ' যখন পড়েছিলাম তখন যে-আনন্দ ও -বিস্ময় লেগেছিলো, তার কাছে 'কর্ণার্জুন' কোথায় ? তাহ'লে কি রমেশের ভূমিকা না-ক'রে গোবিন্দ গাঙ্গুলীর ভূমিকা অভিনয় করাই সত্যকার অভিনেতার কর্তব্য ? না অনেক-কিছু করবার আছে রমেশের ভূমিকায় ? — নিশ্চয়ই আছে, নইলে শিশিরকুমার করেন কেন ? (তখনো পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য হয়নি।) কিন্তু কী তা ? জিজ্ঞাসা করলাম। অভিজ্ঞ লোক তো অনেক থাকেন চারদিকে! সাহসে ভর ক'রে প্রশ্নটা একজনকে ক'রে ফেললাম। তিনি বোধহয় আমার কাছে এ-প্রশ্ন প্রত্যাশা করেননি। একবার ভাল ক'রে আমার দিকে চেয়ে পান চিবুতে চিবুতে উপর দিকে দৃষ্টি তুলে বললেন অভিনয়কে জীবন্ত ক'রে তুলতে হবে।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সতরঞ্চির উপর তিনি ব'সে। বাকি ঘরটা ফাঁকা, ক্লাবে তখনো লোক এসে জোটেনি। সামনে একটা তোবড়ানো টিনের কৌটো বিড়ির ছাই ফেলার জন্যে। খুব সপ্রতিভ হবার চেষ্টা ক'রে আবার জিজ্ঞাসা করলাম — কী ক'রে জীবন্ত হবে ? 'ভাবতে হবে, পড়তে হবে, লেখক যা বলেছেন ঠিক সেই অনুযায়ী ক'রে যেতে হবে, তবে হবে।'

আর-কিছু বলা হ'লো না, বোকার মতো সায় দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু কেবলই মনে হ'তে লাগলো যে শরৎচন্দ্র সার্থক লেখক, তিনি তাঁর কলমের জোরে রমেশ প্রভৃতির চরিত্র যথেষ্ট জীবন্ত ক'রেই এঁকেছেন, তারা এতো স্পষ্ট যে পাঠক কেবলমাত্র ছাপার অক্ষরে প'ড়েই তাদেরকে মনশ্চক্ষে দেখতে পায়, সুতরাং অভিনেতার আর বিশেষ কী থাকে জীবন্ত করবার।

এই সময়ে দু-জন ইংরেজ অভিনেত্রীর লেডী ম্যাকবেথ অভিনয়ের বিবরণ পড়ি। একই চরিত্র দু-জনে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ফুটিয়েছেন, দুটো আলাদা চরিত্র হ'য়ে গেছে। কিন্তু তাঁদের নিজের নিজের যুক্তি অত্যন্ত যথার্থ ও প্রখর।

আশ্চর্য ব্যাপার! মনে হ'লো, নাট্যকার কী চেয়েছিলেন সেটা যদি জানা যেতো তাহ'লে বলা যেতো কে ঠিক করেছেন, আর কে ভুল করেছেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝলুম যে নাট্যকারের রায়ও চরম নয়। সৃষ্টি যতোই মহৎ হয়, যতোই জীবন্ত হয় ততোই ওপর থেকে তাকে দেখতে খুব সহজ মনে হয়। কিন্তু এই আপাত-সহজতার অন্তরে এতো জটিলতা থাকে যা আমাদের জীবনের মতোই ভিন্ন ভিন্ন চোখে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। সেখানে নাট্যকারের মনের চেয়েও তাঁর সৃষ্টি বড়ো। এবং এ-কথা কেবলমাত্র মহৎ স্রষ্টা সম্পর্কেই বলা যায়।

এ-বোধ যখন একটু একটু ক'রে আসতে লাগলো, তখন শিখলাম যে বিভিন্ন লোকের হাতে একই নাটক সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে অভিনীত হ'তে পারে। তা লোক ধাঁধিয়ে বাজার জমানোর জন্যে একটা কায়দা খুঁজে বের করা নয়। সত্যি সত্যিই আবেগের ভিন্নতা, মানসিক গঠনের ভিন্নতা এবং এই বিশিষ্টতা না-থাকলে কেউ শিল্পী নামেরই উপযুক্ত নয়। কিছুদিন আগে বাঙলাদেশের জনকয়েক লেখক আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন নিজের নিজের একটা বিশিষ্টতা, লেখার একটা বিশেষ ভঙ্গী দাঁড় করাতে। এ-রকম চেষ্টার ফলে কোনো বিশিষ্টতা জন্মায় না। অভিনয়ের বেলাতেও অনেকে বিশেষ একধরনের কথা বলার ভঙ্গী, আর কিছু মুদ্রাদোষ অনুশীলন করেন। আসলে এঁরা (এই সমস্ত কবি লেখক বা অভিনেতা) নিজেদেরকে একটু প্রদর্শন করাতে চান। নিজের একটা কাল্পনিক ছবি বাজারে চালু হোক্, যাতে সকলে তাকে সেই বিশেষ চরিত্রের লোক ব'লে মনে করে, অথচ মনে মনে জানেন, তিনি তা নন। এইসব বিজ্ঞাপনের পদ্ধতি চলচ্চিত্র পত্র-পত্রিকার দৌলতে আমরা দেখেছি। এর মধ্যে একটা ভিখিরীপনা আছে। শিল্পীর কাজ নয় নিজেকে মোহনসাজে সাজিয়ে লোককে ধোঁকা দেওয়া, তার কাজ নিজের আবেগকে প্রকাশ করা, নিজের গভীর অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়া। অতএব, আমি যদি রমেশের চরিত্র মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং মনের মধ্যে অনুভব করি যে আমার মধ্যেও ঠিক ঐ-রকম একটা রমেশ আছে, তাহ'লে আমার অভিনীত রমেশ অন্য সকলের থেকে ভিন্ন হবে। এরজন্যে গায়ের জোর প্রয়োজন হয় না, মোহনসাজ দরকার হয় না। কারণ এ অপূর্ব বসুন্ধরাতে আমরা সকলেই বিশিষ্ট। সেইজন্যে শিল্পীর কাজ নিজের মনকে উন্মুক্ত করা, নিজের গভীরকে

অনুভব করা। এমন-কি, অভিনেতাকে যদি অসৎ লোকের ভূমিকা অভিনয় করতে হয় তাহ'লেও তাকে নিজের মনের মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে। দেখা যাবে, নীচতা আমার নিজের মধ্যেও আছে, হয়তো বিশেষ কোনো অবস্থায় পড়িনি ব'লে তা বাড়তে পারেনি, বা নিজের সৎ চেষ্টায় সে-দোষকে নির্জীব ক'রে রেখেছি, কিন্তু তবু আছে। এই বোধ যখন আসে তখন অভিনয়ের চরিত্র সম্বন্ধে একটা সহ-অনুভূতি জাগে। অভিনয় সার্থক হয়।

এর অর্থ এই নয় যে 'ডবল লাইফ' ছবির নায়কের মতো ওথেলো চরিত্র অভিনয় করতে করতে অভিনেতা ঈর্ষার বসে খুনী হ'য়ে উঠবে। এ সম্পূর্ণ মিথ্যে। তা যদি হয় তবে মানুষের সমাজে শিল্পকে বরবাদ ক'রে দেওয়া উচিত। আসলে হয় এর উল্টো। অভিনেতা নিজের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে নিজের ত্রুটিগুলো দেখতে পায়। বস্তুনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী না-থাকলে শিল্পের মধ্যে সেগুলো ব্যবহার করা যায় না। তার ফলে বরঞ্চ অভিনেতার চারিত্রিক উন্নতি হয়। নিজেকে নিজের বাইরে থেকে দেখবার চেষ্টা ক'রে নিজের ত্রুটিগুলি ধ'রে ফ্যালে। এবং এ-সমস্ত ত্রুটি আলোয় টেনে আনলেই এদের ক্ষতি করবার ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে যায়। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা রোগ-সারানোর পদ্ধতিও শুনেছি এই।

সেইজন্য অভিনেতাকে সততা শিখতে হয়। সামান্য সামাজিক সততা নয়, নিজের কাছে সৎ হওয়া, নিজের আত্মার প্রতি সততা। অভিনেতা তার অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেবে, এ-কথা যেমন মিথ্যে তেমনি সত্য। যেখানে ডুবিয়ে না-দেবার অর্থ হচ্ছে নিজের মুদ্রাদোষগুলির পুনর্ব্যবহার ক'রে যাওয়া, সেখানে এ-আলোচনা চলে না। এক কথায়, আপনার মন যদি শিল্পীর হয় তবে সব ঠিক আছে। আপনি যা করবেন, (এমন-কি ভুল করলেও) তাতে আপনার ভালো হবে। আর যদি সে-রকম মনই না-থাকে, — তা হ'লে আপনার আত্মীয়বন্ধুরা অনেকে অশাভঙ্গ হবেন আর-কি।

অভিনয় করবার এবং ভালো অভিনয় করবার উপায় খুব সহজ। যে-ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে সেটি নিজের মনের মধ্যে আত্মসাৎ করা চাই। কালির ওপর ব্লটিং কাগজ ফেললে যেমন হয়, তেমনি নিজের মনকে ফেলে ভূমিকাটি শুষে নেওয়া চাই। তারপর সেটা মহড়া দেবার সময়ে মনে

মনে প্রতিজ্ঞা করা চাই, যা আমার কাছে সত্য নয় তা করবো না। অভিনয় ভালো হ'তে বাধ্য।

কেউ যখন কোনো চরিত্রে অভিনয় করে তখন তার কী দেখাবার থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হয় যদি উল্টো প্রশ্নটা, করা যায়, যে কী কী দেখালে উপযুক্ত অভিনয় হয় না।

প্রথমত, মানালেই ভালো অভিনয় হয় না। অর্থাৎ মানানোর প্রশ্নটা বাহ্যিক। শ্রীমতী প্রভাকে রমার অভিনয় করতে আমরা দেখেছি। প্রথম দৃশ্যে মনে হয়েছিলো, উপন্যাসে বোধহয় উল্লেখ আছে রমার রঙ ফর্সা। তাছাড়া একটু যেন বেশী মোটা মনে —। কিন্তু তারপর ভুলে গেলাম। শেষ-পর্যন্ত সব মানিয়ে গেলো।

দ্বিতীয়ত এক একটা দৃশ্যে — বিশেষ ক'রে উত্তেজনাপ্রদ দৃশ্যে বাচন-কৌশলে দর্শককে মুহ্যমান ক'রে দিলেই উপযুক্ত অভিনয় হয় না। এই পাপ আমাদের মঞ্চে প্রচুর। কোনো সমগ্র চরিত্র যথার্থ ক রে তুলতে গেলে পুরো নাটককে যথার্থ ক'রে তুলতে হয়। পুরো নাটককে যথার্থ ক'রে তুলতে হ'লে অনেক আদর্শ উদ্দেশ্যের কথা এসে পড়ে, অলস লোকের কাছে এগুলো ভীতিপ্রদ। তারা মহৎ নাটকের পথ পরিহার করার সঙ্গে সঙ্গে মহৎ অভিনয়-পদ্ধতিও পরিত্যক্ত হয়েছে। অতএব বাকী রইলো শুধু উত্তেজনা। নিস্তরঙ্গ-জীবন কেরানী-দর্শক এই উত্তেজনায় পরিতৃপ্ত হ'য়ে বাড়ী ফেরে! এক-আধটা দৃশ্যের হাততালি তোলবার প্যাঁচ নয়, সমগ্র চরিত্রের গভীর অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারলে তবেই অভিনয়। কিন্তু সমগ্র চরিত্র কী ক'রে প্রকাশ পাবে? নাটকে কেবলমাত্র একটি চরিত্রই থাকে না। দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার নাটকে একটি চরিত্রের (এমন-কি প্রধান চরিত্রেরও) খুব কম অংশই দেখানো যায়, মাত্র কয়েকটি ঘটনায় সে কী ব্যবহার করলো — সেইটুকু। তার মধ্যে কী ক'রে একটি চরিত্রের সমগ্রতা দেখানো সম্ভব?

অথচ তা সম্ভব। গল্পলেখক কী ক'রে কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র দু-এক আঁচড়ে একাধিক চরিত্র জীবন্ত ক'রে তোলেন? বলার নিয়ম হচ্ছে অল্প, এবং এমন কায়দা ক'রে তাতে ছেদ টানা যে, দর্শক বা পাঠক নিজের কল্পনা দিয়ে সেই অসম্পূর্ণতা ভরিয়ে নেবে। এ-কাজ করতে হবে পাঠক বা দর্শকের অজান্তে। তাদের সচেতন ক'রে কল্পনা করতে বললে ফল শোচনীয় হবে।

শুধু এখানে ওখানে কিছু আঁচড়ে, এখানে ওখানে কিছু ইঙ্গিত। অভিনয়েও তাই। কেন আপনি কোনটা করছেন এবং প্রত্যেক কথা বলার আগে কী ভেবে বললেন এবং ব'লেই বা কী ভাবলেন — একটু ধরিয়ে দিন দর্শককে। তারপর তারা আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলবে। এই হ'লো অভিনয়। প্রত্যেক চরিত্র এক একটা পূর্ণ জীবন এবং তাদের পৃথক্ পৃথক্ চিন্তাভঙ্গী আছে, স্রোতের মতো তা ব'য়ে চলেছে, কখনো ধাক্কা খাচ্ছে কখনো শান্ত হচ্ছে, কিন্তু ব'য়ে চলেছে, এই স্রোতের মধ্যে আছে সেই চরিত্রের পুরো চেহারা, তার অতীত, তার বর্তমান, এবং তার ভবিষ্যতেরও আভাস। তার পুরো অভিজ্ঞতা এই চিন্তাস্রোতের মধ্যে মিশে স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

নাটকে এইরকম বিভিন্ন চিন্তাস্রোত একজায়গায় প'ড়ে নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খায়, ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করে, চেষ্টা করে নিজেদের সার্থকতার পথ খুঁজে পেতে, এবং খুঁজে পায়।

সুতরাং অভিনেতা যদি তার অভিনেয় চরিত্রের জীবনবোধ, তার চিন্তাধারা দর্শকের সামনে স্পষ্ট ক'রে দেখাতে পারে তবে তা হ'লো অভিনয়।

এরপরে একটা কথা বাকী থাকে, সে হ'লো ব্যক্তিত্বের কথা। ভালো অভিনেতা হ'তে গেলে ব্যক্তিত্ব অর্জন করা চাই। চাই-ই-চাই। কিন্তু কী ক'রে অর্জন করা যায় ব্যক্তিত্ব?

সস্তা সিরিজের বই দেখেছি চৌরঙ্গীর ফুটপাথে, 'কী ক'রে ব্যক্তিত্ব বাড়াতে হয়'। চার্লস্ অ্যাটলাসের বিজ্ঞাপন দেখেছি যে ব্যায়াম ক'রে ব্যক্তিত্ব বাড়াও, মেয়েরা টুপ্ টুপ্ ক'রে তোমার প্রেমে প'ড়ে যাবে।

অথচ এই সমস্ত বই ও ব্যায়াম নিয়মিত ইস্তেমাল ক'রেও বহু ব্যক্তি ব্যক্তিত্ববিহীন হ'য়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। এবং যার ব্যক্তিত্ব গজাচ্ছে তার ও-সব না-প'ড়েই গজাচ্ছে। আসলে, ব্যক্তিটা যদি বড়ো হয়, কর্মী হয়, চিন্তাশীল হয়, তাহ'লে তার ব্যক্তিত্বও তেমনি ক'রেই ফুটবে। আমরা প্রত্যেকে জীবনের নানান্ প্রশ্নের মুখোমুখি হই। কেউ কেউ প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দেয়, আর সেটাকে একটা মূল্যবোধের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। এইভাবে যার চিন্তা যতো সুবিন্যস্ত ও প্রত্যেকটা প্রত্যেকের সঙ্গে সচেতনভাবে গ্রথিত — তারই ব্যক্তিত্ব ততো বেশী, এবং ততো পরিস্ফুট। বেশীরভাগ লোক আমরা চিন্তার জট

ছাড়ানোর কষ্ট করতেই চাই না, তাই আমরা এক সময়ে দৈব ও আরেক সময়ে পুরুষকার দুটোয় সমান জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করি। অর্থাৎ এ-রকম লোকের জীবনের বোধের কোনো মূল নেই।

কিন্তু শিল্পী হ'তে গেলে আমাদের দায়িত্বসম্পন্ন হ'তে হবে। চিন্তা দিয়ে প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা করা শিল্পীর কাজ, কেবল ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে গেলে প্রকৃতিরই ক্রীতদাস হ'তে হয়। এবং এই একটি পথে যদি কোনো অভিনয়-শিশিক্ষু মন চেষ্টা শুরু করে তাহ'লে আমার প্রবন্ধে আমি যতো ভুল-বা অসম্পূর্ণ কথাই ব'লে থাকি না কেন তাতে তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না, বরঞ্চ আমার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই তার অগ্রসৃতিকে সাহায্য করবে।

চর্চ্চা ও শিল্পসম্ভোগ

মঞ্চাভিনয়ে নাটকের সংলাপ ও তার বাচনভঙ্গী নিশ্চয়ই খুব একটি বিশিষ্ট অংশ, কিন্তু সেটাই সব নয়। বেতার-অভিনয় কেবলমাত্র শোনার, কিন্তু মঞ্চাভিনয় শোনার ও দেখার। এবং সেই দেখার ক্ষমতাটা কিন্তু সহজাত নয়। আয়াসসাধ্য, ও আমাদের সর্বাঙ্গীন সংস্কৃতিসাপেক্ষ। কেবল নাট্যোপলব্ধির ক্ষেত্রেই যে এই দর্শনক্ষমতাটা প্রয়োজনীয় তা নয়, অনেক শিল্পের ক্ষেত্রেই এটা আবশ্যিক। চর্চা ছাড়া শিল্পসম্ভোগ সম্ভব নয়।

কথাটা হঠাৎ শুনলে, আমরা দেখেছি, অনেক লোকের সন্দেহ জাগে। তাঁদের মনে হয় যে, 'তাহ'লে কি আমাদের সকলকে সবরকম শিল্প সম্বন্ধে চর্চা ক'রে তবে সাহিত্য পড়তে হবে, বা ছবি দেখতে হবে, বা গান শুনতে হবে, বা নাটক দেখতে হবে? সে-সব কেবল যাঁদের "হবি" আছে তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, সাধারণ পাঁচটা লোকের অতো সময় কোথায়? আর তাছাড়া সত্যিই যদি সাধারণ দর্শক ও পাঠককুল মনে মনে ঠিক করেন যে আগে সমস্ত শিল্পের ইতিহাস ও আঙ্গিক বুঝে নিই, তারপরে শিল্প উপভোগের চেষ্টা করবো, তাহ'লে ভেবে দেখুন হঠাৎ একেবারে আপনাদের সমস্ত আধুনিক বিক্রী বন্ধ হ'য়ে যাবে, ছবির প্রদর্শনীতে লোক যাবে না, থিয়েটার বায়স্কোপের বাড়ীগুলো খাঁ খাঁ করবে। ফলটা কি শিল্পীদের পক্ষেই ভালো হবে? অতএব শিল্পীদের বোঝা উচিত যে তাঁদের আঙ্গিকের কৌশল সম্পর্কে সাধারণ দর্শকের কাছে বোধ আশা করা বৃথা। তাঁরা কোন্ রাগে দুটো মধ্যম পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন, বা কোন্ ছবিতে রেখা বা রঙের কী বিন্যাস ঘটিয়েছেন, বা বিরাট লং শটের পরেই হঠাৎ কেমন একটি বিরাট ক্লোজ-আপ দিয়েছেন, বা মঞ্চের ওপর অভিনেতৃ বিন্যাসে কি সুছন্দ 'ফ্লুইডিটি' এনেছেন, এ-সমস্তর আবেদন হচ্ছে মুখ্যত বুদ্ধিমার্গে, যাকে বলি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল। কিন্তু সাধারণ মানুষ শিল্পের কাছে চায় হৃদয়াবেগ, ইমোশন। অতএব অসাধারণ বুদ্ধির প্রত্যাশা না-রেখে হৃদয়াবেগ দিয়ে মুগ্ধ করবার চেষ্টা করুন, লোকে মুগ্ধ হবে।'

এর উত্তরে বলা যায় যে, চর্চার পরিমাপ কিছু হয়তো বাঁধা যায় না, কিন্তু ন্যূনতম চর্চার প্রয়োজন একটা আছেই। বর্তমান লেখক কিশোর বয়সে বাড়ীর একটি গেঁয়ো চাকরকে একটি ফটো দেখিয়েছিলো। ফটোটি ছিলো মুখের একটি পোর্ট্রেট : অন্ধকারের মধ্যে একটু হেলানো কেবল একটি মুখ তাকিয়ে আছে, কোনো ব্যাক্-লাইট দিয়ে মাথাটিকে অন্ধকার থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা তাতে ছিলো না। চাকরটি অনেকক্ষণ ধ'রে ছবিটি বোঝবার চেষ্টা ক'রে শেষে অপ্রতিভ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ কীসের ছবি ?' বল্লাম, 'একটা মুখের।' তাতেও ফল হ'লো না দেখে নাক, চোখ, কপাল সব আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগলাম। বেশ কয়েকবার বলবার পরে মনে হ'লো সে আবছায়া দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ব'লে উঠলো, 'তাহ'লে হাত কই ? পা কই ? '

ঠিক এইরকম কথাই আবার শুনেছি বছর আষ্টেক আগে এক বৃদ্ধার কাছে। তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের বায়স্কোপ টায়স্কোপ দেখে আমি কিছু বুঝতে পারি না। হঠাৎ দেখায় যে একটা মানুষের আধখানা ধড় ঘরের মধ্যে ঘুরছে। আরে মর্, তার পা কই ? ঠ্যাং নেই, মেঝে নেই, খালি আধখানা ধড় ঘরের এ-পাশ যাচ্ছে আর ও-পাশ যাচ্ছে। আমার তো বাপু দেখলে ভুতুড়ে কাণ্ড মনে হয়। দূর, দূর।'

অথচ রোজ যাঁরা টিকিট কিনে বায়স্কোপের এইসব রীতিগত কৌশল অবলীলাক্রমে মেনে নিয়ে ছবি উপভোগ করছেন তাঁদের খুব কম লোকই সাধারণ বুদ্ধিতে এই বৃদ্ধার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। অর্থাৎ এই চাকর আর বৃদ্ধার ছবি দেখা সম্পর্কে কোনোরকম চর্চা না-থাকাতেই রসোপভোগে ব্যাঘাত ঘটেছিলো।

এবং খালি ফ্রেম মিলিয়ে ছবিটি দেখতে পাওয়াই নয়, আরো একটু বেশী চর্চার প্রয়োজন। বালক বয়সে নিজের কানে শুনেছি কোনো এক বাড়ির রোজগেরে রাশভারি কর্তা বলেছিলেন, 'ও-সব অবন ঠাকুরদের ইণ্ডিয়ান আর্ট-মার্ট আমি বুঝি না, যতো ম্যালেরিয়া রুগীর মতো কাঠি-কাঠি হাত পা। তার চেয়ে রবি বর্মার ছবি দেখে বুঝতে পারি। মানুষগুলো মানুষের মতো।'

এই যে অজ্ঞানতা ও আত্মম্ভরিতা, এতে কার লোকসান হয় ? যে-লোকেরা ভালো জিনিসের ভালোটা দেখতে পেলো না তাদের লোকসান তো হ'লোই,

কিন্তু শিল্পী যদি দেখেন যে তাঁর চারপাশের মনগুলো এমনই আড়ষ্ট, এমনি সংবেদনহীন, তাহ'লে তাঁর পক্ষেই কি নিজের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস পাওয়া সম্ভব? কাকে বলবার জন্যে তিনি কথা বলবেন, গান গাইবেন, বা ছবি আঁকবেন? এবং সে-ক্ষতি কি দেশের সংস্কৃতিরই নয়?

তাছাড়া ইমোশন তো বটেই। শিল্পীমাত্রেই আবেগ প্রকাশ করতে চান। কিন্তু সেটা না-বুঝে 'আবেগ চাই' 'আবেগ চাই' ব'লে উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিলে ব্যাপারটা পেড়ে ধরার প্রয়োজন ঘটে। কারণ হৃদয়াবেগ জিনিসটাই হয়তো আসলে বুদ্ধিভিত্তিক। কেঁচোর ছেলে মরলে কেঁচো কষ্ট পায় না। গরুতে খানিকটা পায়, মানুষে তার চেয়ে ঢের বেশী পায়। এই তফাৎ ঘটেছে হয়তো তাদের ঘিলুরই তারতম্যের জন্যে। আর সেই ঘিলুর তারতম্যেই মানুষ, দেখা যায়, অনেক সূক্ষ্ম আবেগ অনুভব করতে পারছে। যেমন, পাওয়ার মধ্যে না-পাওয়া, অনধিকৃত ভালোর জন্যে উন্মনা হওয়া, জীবনের অর্থ খুঁজে খুঁজে ঘোরা।

এই অনুভূতিগুলো যে মানুষ জন্মের মুহূর্ত থেকেই বোধ করছে তা তো নয়, এগুলো সংস্কৃতিলব্ধ। এই যে সত্যকার মানবিক অনুভবের সংস্কৃতি এটি কোনো শ্রেণীবিশেষের সম্পত্তিও নয়। অনেক চাষাভূষো, গরীব গেঁয়ো, বা ফকিরজাতীয় লোকের মধ্যে এই অনুভবের এমন প্রখরতা দেখা যায় যা তথাকথিত 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল' মহলে অনুপস্থিত। সমাজে সেই মানবিক সংস্কৃতির আশা করবার অধিকার নিশ্চয়ই শিল্পীর আছে। এবং চারপাশে সেই বোধের অভাবে তাঁকে বাধ্য হ'য়ে সস্তা হ'তে হ'লে অভিমান করবারও অধিকার আছে। বলবার অধিকার আছে যে, সমাজ হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির মার্জনার পথ দেখাবে না, বিশ্ববিদ্যালয় দেখাবে না, জাতীয় নেতারা দেখাবেন না, আর যতো দায়িত্ব পড়েছে কেবল হতভাগ্য শিল্পীদের ওপর! তাঁদের ওপর দেখি কেবলই নেমে আসার আদেশ! কোনো রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা, বা শিক্ষানেতা তো উন্মুক্ত গলায় বলতে পারেন না যে, এগিয়ে যান আপনারা জীবনবোধের দিকে যতোদূর পারেন, আমরাও উন্নততর জীবনপরিকল্পনা ক'রে আপনাদের বোধকে চ্যালেঞ্জ করতে করতে যাবো।

এই কথাগুলো আমি কিছু নতুন বলছি না। এবং সকল সংস্কৃতমনা লোকই মোটামুটিভাবে এ-সব কথা মানেন। কিন্তু যেমনি এই কথাগুলো থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়, অমনি অনেকের মধ্যে গণ্ডগোল লাগে। কারণ, তাঁরা সত্যিই থিয়েটার দেখতে জানেন না, অনেকেই। দর্শকের একাংশ কিছুই ভাবেন না। যা ব'লে দেওয়া হয় তাই-ই বিশ্বাস করেন, নিতান্ত অসহ্য না-হওয়া পর্যন্ত। আর অপর একটি অংশ নিজের মন-গড়া চেহারাটি দেখতে না-পেলেই বেজার হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু এর কোনোটাই তো শিল্পীকে সাহায্য করে না। শিল্পী তাঁর নিজের উপলব্ধি দিয়ে একটি চরিত্রের তলদেশ পর্যন্ত বিশ্লেষণ ক'রে নিজের সেই বোধটা দর্শকদের বোঝাতে চান, যাতে দর্শকরা তাঁর যুক্তি জীবনের টীকা হিসাবে বোঝে। ঠিক যেমন ক'রে উপন্যাসকার গল্প লেখেন, ভালো অভিনেতাও ঠিক তেমনি ক'রেই চরিত্র ফোটান। আত্মপ্রদর্শন নয়, উপলব্ধি দিয়ে জীবনবোধ প্রকাশ।

এইখানে বর্নার্ড শ দুজে সম্বন্ধে যে-সব নানা কথা বলেছেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করলে হয়তো আমার পঙ্গু ভাষার বাধা অতিক্রম ক'রে ব্যাপারটি বোঝা যাবে।

"... Duse has been helped to her supremacy by the fortunate sternness of Nature in giving her nothing but her genius... The extraordinary richness of her art can only be understood by those who have studied the process by which an actress is built up. You offer a part to a young lady who is an enthusiastic beginner. She reads it devoutly, and forms, say, half a dozen great ideas as to points which she will make... The great actress has a harder struggle. She goes on inventing her points and her business determinedly, constantly increasing the original half-dozen, and constantly executing them with greater force and smoothness. A time comes when she is always making points, and making them well; and this is the finishing point with some actresses. But with the greatest artists there soon commences an

integration of the points into a continuous whole, at which stage the actress appears to make no points at all, and to proceed in the most unstudied and 'natural' way. This rare consummation Duse has reached. An attentive study of her Marguerite Gauthier, by a highly trained observer of such things, will bring to light how its apparently simple strokes are combinations of a whole series of strokes, separately conceived originally, and added one by one to the part, until finally, after many years of evolution, they have integrated into one single highly complex stroke. Take, as a very simple illustration, the business of Camille's tying up the flowers in the third act. It seems the most natural thing in the world ; but it is really the final development of highly-evolved dance with the arms — even, when you watch it consciously, a rather prolonged and elaborate one. The strokes of character have grown up in just the same way. And this is the secret of the extra-ordinary interest of such acting.... It is the rarity of the gigantic energy needed to sustain this work which makes Duse so exceptional ; for the work is, in her case, highly intellectual work... ."

এখন, এই যে স্ট্রোক দেওয়া, এই ইঙ্গিত, বোঝবার জন্যে দর্শকদেরও কিঞ্চিৎ হৃদয়বান ও দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া দরকার। উপন্যাসে বা গল্পে চরিত্রের সম্বন্ধে লেখক তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে দেন, যা প'ড়ে পাঠকরা আন্দাজ করবার একটা সুবিধে পান। কিন্তু অভিনয়ে যখন কোনো চরিত্র আসে তখন তার কোনো বর্ণনা ব'লে দেওয়া হয় না, সেটাকে দর্শকদের নিজের বোধ দিয়ে অনুভব করতে হয়। এমন-কি অন্যান্য চরিত্র যদি ঐ উপরোক্ত চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলেও, তাহ'লেও দর্শককে বুঝে নিতে হবে যে এটি সেই অন্যান্য চরিত্রদের নিজেদের মেজাজ অনুযায়ী কথা, নাট্যকারের কথা না-ও হ'তে পারে। সময়ে সময়ে ও-সব কিছুই বলা থাকে না, চরিত্রটি সোজা উপস্থাপিত করা হয়। তখন

অভিনেতারা দর্শকদের বোধকে সাহায্য করবার জন্যে কিছু ইঙ্গিত দেন। কিন্তু অনেক সময়েই এমন হয় যে দর্শক সেটা লক্ষই করেন না। তাঁদের লক্ষ্য থাকে গল্পের ওপর, নাটকীয় ঘটনার ওপর, এবং বড়ো আবেগ প্রকাশের সময়টির ওপর। কিন্তু সেই যে বড়ো আবেগ যেটি একটি নাটকীয় মুহূর্তে নাটকে আসবেই, সেটি যে কেমন ক'রে একটি চরিত্রে অনিবার্য হ'য়ে উঠছে সেই লজিকটাই তো লক্ষনীয়। নইলে কেবল গল্প তো মহিলাদের অপর-বাড়ী সম্পর্কে পরচর্চ্চার মতো। অভিনয়ে পাঁচটি চরিত্র একই সঙ্গে নিজের নিজের অন্তর্নিহিত মানসিক গঠনের বেগে বিভিন্নভাবে একই ক্রাইসিসে এসে পৌঁছয়, অনিবার্যভাবে। তাই প্রত্যেক চরিত্রের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন সম্পর্কে যে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা সেটা যদি দর্শক অনুভব না-করতে পারেন তাহ'লে সঙ্কটমুহূর্তের অনিবার্যতাও তিনি দেখতে পাবেন না। তাতে লোকসান উভয়ত। যেমন ধরা যাক, 'এ ডল্‌স্ হাউস' নাটক শুরু হওয়ার পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই নোরা তার মিষ্টি খাওয়াটা স্বামীর কাছে গোপন রেখে মিথ্যে ক'রে বলে, 'তোমার যা খারাপ লাগে তা আমি কখনো করি?' এবং স্বামী আত্মতৃপ্তভাবে বলে, 'না। তা আমি জানি।' নাট্যকারের এই এক ইঙ্গিতেই চমক লাগে, মনে হয় যে এদের এই সুখী-দম্পতিভাব কতোটুকু ভর সইবে? এতো সহজ মিথ্যের উপর যার বনেদ?

এইরকম ইঙ্গিত নাট্যকার দেন গল্পের উপপাদ্য বিষয় সম্পর্কে, নির্দেশক ইঙ্গিত দেন মুড আর পরিবেশ সম্পর্কে, যা এই উপপাদ্যকে অনিবার্য ক'রে তুলবে, আর অভিনেতা ইঙ্গিত দেন চরিত্রের রূপের, যা আবার এই পরিবেশের মধ্যে ঐ-উপপাদ্যের অনিবার্যতা প্রমাণ করবে। কিন্তু এইসব শিল্পীরা যদি দেখেন যে তাঁদের এই 'স্ট্রোক'গুলো কেউ নজর করে না, তখন হাজার প্রশংসা পেলেও তাঁদের মন ভেঙে যায় এবং ক্রমশ তাঁরাও সূক্ষ্ম কারুকার্য করা ছেড়ে দেন। যেমন হয়েছে, আমার বিশ্বাস, শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ক্ষেত্রে।

মনে করা যাক 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে তাঁর প্রথম প্রবেশের কথা। চলনভঙ্গী তিনি এমন করেছিলেন যেন দিনের বেশীরভাগ সময় তিনি ঘোড়ার ওপরেই থাকতে অভ্যস্ত। জীবনে আমরা দেখি যে 'জকি'র হাঁটা এবং — ধরুন একজন বিচক্ষণ ডিপ্লোম্যাটের হাঁটা এক নয়। কিন্তু নাদির শাহ্ অভিজাত-বংশীয় অমায়িক ডিপ্লোম্যাট ছিলেন না, তিনি ছিলেন মেষপালক। যোদ্ধা, ও

সহজাত বুদ্ধির অধিকারী। তাই তাঁর চলাফেরায় ও ভাবেভঙ্গীতে শার্দূলের মতো বন্যতা ও ক্ষিপ্রতা এনেছিলেন শিশিরকুমার। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই চরিত্রে ট্র্যাজেডি ফোটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দর্শকসাধারণ তা বোঝেননি এবং কেউ তাঁদের বুঝিয়েও দেননি। ফলে কেউ যদি কোনো ভালো অভিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, কেন সেটা ভালো, তাহ'লে শতকরা নব্বইজন লোকই ঠিক জবাব খুঁজে পান না। বলেন, 'খুব natural লাগলো। ওঁকেই সেই চরিত্র ব'লে মনে হ'লো। নিজের সত্তাকে লুকিয়ে একেবারে চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়ার নামই তো ভালো অভিনয়...।' ইত্যাদি।

অর্থাৎ শিল্পের আসল দিকটির প্রতি — যেখানে অভিনেতার বুদ্ধি ও আবেগ সংযত ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে জীবনের জটিল গভীরতা উন্মোচন করতে চেষ্টা করেন সেই দিকটা স্পষ্ট উপলব্ধি না-ক'রে দর্শক একটি ভুল দিকে ঝোঁক দেন। — ন্যাচারল্ কী? আজকের দিনে একটি গাছের ছবি দেখে কেউ যদি বলে, 'খুব ন্যাচরল্, ঠিক গাছ ব'লেই মনে হ'লো।' তাহ'লে লোকে তাকে কী বলবে? তবে অভিনয় দেখতে এসে কেবল ঐ-কথাটিই ওঠে কেন? আসলে, অভিনেতা চরিত্রটির প্রকাশে কতকগুলো পয়েন্ট আনতে চান যা সর্বাঙ্গীন নাটকের সঙ্গে যুক্ত।

এইখানে সাল্‌ভিনি নামক বিখ্যাত অভিনেতার ওথেলো সম্পর্কে স্তানিস্লাভস্কি কী লিখেছেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করলে প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি লিখেছেন, "There were his large, pointed moustaches, his wig that looked too much like a wig, his figure, too large, too heavy, almost fat, great eastern daggers that dangled at his waist and made him look stouter than he was, specially when he donned a Moorish cloak and hood. All of this was not much typical of the soldier Othello." তারপর যখন ক্রমশ ইয়াগোর মন্ত্রণায় স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছে, যখন একবার তার প্রতি রূঢ় হচ্ছে এবং পরক্ষণেই অনুতপ্ত হ'য়ে বেশী ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু আবার সন্দেহের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ছে, সেই তৃতীয় অঙ্কে যখন ওথেলো ইয়াগোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই সম্পর্কে স্তানিস্লাভস্কি লিখেছেন, "He throws Iago to the floor and is

on him in one leap, pressing him to the ground, leaps up, lifts his foot above Iago's head to crush it like a snake's, remains in that pause, becomes confused, turns away, and without looking at Iago, offers him a hand, lifts him, and falls himself on a couch, crying like a tiger in the desert when he has lost his mate.

"At that moment the likeness of Salvini's Othello to a tiger was self-evident. I understood now that even before, in the embraces of Desdemona and in the subtle, feline manners of the speech in the Senate, even in his very method of walking, I had guessed in him the presence of a beast of prey."

'দিগ্বিজয়ী'র অভিনয় যাঁরাই দেখেছেন তাঁরাই মনে করতে পারবেন যে এ-রকম কলা-কৌশল সে-নাটকেও বড়ো কম ছিলো না। শিশিরকুমারের আর-একটি অভিনয়ের দৃশ্য প্রচণ্ডতায় ও গভীরতায় অতুলনীয়। সে হ'লো 'রঘুবীর' নাটকে যখন রঘুবীর রঘুয়াতে পরিণত হয়। অনেকে হয়তো আজকাল সে-নাটক সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাই গল্পটা একটু বলা দরকার। এক রাজ্যের দেওয়ান একটি ভীলশিশুকে পুত্রের মতো স্নেহে পালন করেন। এবং তাকে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রে, ব্রাহ্মণের ক্ষমা ধর্মে, দীক্ষিত ক'রে তোলেন। তারপর দেশের নবাবকে হত্যা ক'রে একজন বদ লোক সিংহাসন অধিকার করে। এবং দেওয়ান মৃত নবাবের মেয়ে ও নিজের সন্তানাদি নিয়ে বনের মধ্যে পালিয়ে যান। সেইখানে নতুন নবাবের অত্যাচারের কাহিনী যতো পৌঁছুতে থাকে ততোই দেওয়ানের আপন সন্তান রাগে প্রতিহিংসায় উত্তপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকে। কিন্তু পালিত পুত্র রঘুবীর এদের সংযত হবার উপদেশ দেয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শে। এমন-কি তার নিষ্ক্রিয়তায় সবাই যখন তার উপর রেগে উঠতে থাকে তখনও সে পালকপিতার শিক্ষা মনে রেখে নিজেকে ব্রাহ্মণ্যে অটল রাখে। কিন্তু ক্রমশ তার মনেও সন্দেহ ঢোকে। এবং নবাবের এক চরম অত্যাচারে একদিন রঘুবীরের এতোদিনের ক্ষমা ও অহিংসার ভিত্তি হঠাৎ ভেঙে পড়ে। — অন্ধকার এক প্রান্তরের মধ্যে রঘুবীরের নিজের পালকপিতার সঙ্গে দেখা হয়। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বসে যে ব্রাহ্মণের আদর্শ আমার জন্যে নয়,

আমি জাতিতে ভীল, আমার শিরায় ভীলের রক্ত, যে-ভীল সিংহের সঙ্গে, হাতীর সঙ্গে লড়াই ক'রে বাঁচে। আমার মন্ত্র সংহার। আর আমি রঘুবীর নই, আমি রঘুয়া, আমি ভীল।

এই দৃশ্যের অভিনয়ে অনেক অতুলনীয় গুণের সঙ্গে একটি জিনিস শিশির-কুমার অসামান্য ক্ষমতায় প্রকাশ করেছেন! সে হ'লো প্রায় হাস্যকর ভঙ্গী দিয়ে একটি প্রচণ্ড কবিতা রচনা করার পদ্ধতি। একজন পঞ্চাশ বৎসরের লোককে পায়ে মল প'রে কথার তালে তালে মঞ্চের ওপর নাচতে দেখলাম, 'সংহার, সংহার' ব'লে দুই পা তুলে লাফাতে দেখলাম। এ-সব স্বাভাবিক নয়, শহুরে নয়, sophisticated নয়। কিন্তু এর প্রবল ভীষণতায় আমার মনে হয়েছিলো যে আমি ম'রে গেছি। আমার জীবনে বিরাট শিল্প আমাকে যে ক'বার মুহ্যমান ক'রে দিয়েছে এটি তার মধ্যে একবার।

কিন্তু এই দৃশ্য অকস্মাৎ এক রগ্‌রগে বাটি-চচ্চড়ির মতো পরিবেষণ করা হয়নি। এই সঙ্কটকে শিশিরকুমার নাটকের প্রথম থেকে গ'ড়ে তোলেন রঘুবীরের শান্তি দিয়ে, — কষ্ট মেনে নেওয়া শান্তি দিয়ে, বিচলিত সহজ শান্তি দিয়ে, বিক্ষুব্ধ অশান্ত মনকে চেপে জোর ক'রে শান্তির কথা বলবার চেষ্টা দিয়ে, নিজের কথায় নিজের সন্দেহ দিয়ে। তবেই হঠাৎ ঝোড়ো সমুদ্রের মতো যখন রঘুবীর উত্তাল এবং উদ্দাম হ'য়ে ওঠে আমরা আতঙ্কে স্তব্ধ হ'য়ে যাই, — আমার নিজের কথা ভেবে, মানবনীতি কী — সেই প্রশ্নের কথা ভেবে।

এইরকম দুর্ধর্ষ প্রতিভাধর ছিলো এই বাঙলাদেশে। দেশ তাঁকে পয়সাও দিয়েছিলো প্রচুর। সুখ্যাতিও দিয়েছিলো অপরিমেয়। তিনি তার মর্যাদা রেখেছেন কিনা সে-তর্ক এখানে অবান্তর। কিন্তু বর্তমান লেখকের স্পষ্ট মনে হয়েছে যে তাঁর ভিতরকার শিল্পী-আত্মা সুবিবেচিত গুণবিচারের অভাবে কষ্ট পেয়েছে, মরেছে।

এই দৃষ্টির অভাব ছিলো ব'লেই তাঁর অভিনয়ও লোকে যেমন দেখেছে, 'কেদার রায়', 'বঙ্গে বর্গী'ও তেমনি ভীড় ক'রে দেখেছে। আর তাই শেষ-পর্যন্ত টিঁকে গেলো সস্তা থিয়েটারি থিয়েটার, আজ যা বাজার ছেয়ে আছে।

সুতরাং একবার বোধহয় আমাদের ভাবা উচিত যে হবুচন্দ্রের প্রজাদের মতো মুড়িমিছরির একদর করলে এই ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে, তখন কেবল ব্যক্তিবিশেষকে গালি পেড়ে ইতিহাসের এজলাসে ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

আজ তাই পেশাদারী থিয়েটারের বাইরে যে 'জাতীয় নাট্যশিল্পী' রূপ পরিগ্রহ করছে, নাট্যান্দোলনের বহু দলের বিভিন্ন চেষ্টায়, তার গুণাগুণও যদি দেশ সু-বিবেচনার সঙ্গে না-দেখে তাহ'লে আবার এর দামও দিতে হবে। পিঠ চাপড়ানো নয়, সবারি নয়, খালি সত্যকার গুণটাকে গুণ ব'লে বোঝা।

যাই হোক্, এতো গেলো কেবল অভিনেতাদের অংশের কথা। এ ছাড়া আরও জিনিস দেখবার আছে। যেমন মঞ্চসজ্জা, আলো।

মঞ্চসজ্জা বা আলো সম্পর্কে এখানে বেশী কথা বলার প্রয়োজন নেই, কারণ, এই দিকগুলোয় দর্শকের চোখ এখন গেছে। তবু সেই দেখা যে কতোটা সূক্ষ্ম হওয়ার দরকার তা আর-একজনের দেখার বিবৃতি দিলে হয়তো সাহায্য করবে। সে লোক হচ্ছেন Eric Bentley। তিনি Tennessee Williams-এর *Cat on a hot tin roof*-এর অভিনয় সম্পর্কে একটি সমালোচনা লিখেছেন।

লিখেছেন, "Jo Mielziner's setting for CAT ON A HOT TIN ROOF consists of a square and sloping platform with one of its corners, not one of its sides, jutting out towards the audience . . The whole stage is swathed in ever-changing light and shade....Such is the world of Elia Kazan [নাট্য-নির্দেশক] as we know it from his work on plays by more authors than one. The general scheme is that not only of *A Street car named desire* but also of *Death of a salesman :* an exterior that is also an interior — but, more important, a view of *man's* exterior that is also a view of his interior, the habitat of his body and the country of his memories and dreams. A theater historian would probably call this world a combination of naturalism and expressionism, yet one has no impression that it was arrived at by mixture, or even by choice, of styles : it is a by-product, or perhaps end-product, of a certain sort of work which has its own history and

identity. It is one of the distinctive creation of American theater."

অর্থাৎ এখানেও সামগ্রিক সংস্কৃতিবোধের সংবেদনশীলতা, ও নাট্যশিল্পের বিবর্তনের পারম্পর্যজ্ঞান না-থাকলে এ-বিভাগের strokes-ও নজর এড়িয়ে যায়। ফলে প্রত্যেক নতুন শিল্পকৌশল যে সংস্কৃতির অঙ্গ পুষ্ট ক'রে দেশেরই উত্তরাধিকার ঐশ্বর্যমণ্ডিত করছে, সেই উত্তরাধিকার সম্পর্কে দেশের লোকই অজ্ঞান থেকে যায়।

কিন্তু এ ছাড়া আরো একটি দিক আছে নির্দেশকের কাজের। সেটি হ'লো মঞ্চের ওপর অভিনেতৃ সংস্থাপনের কৌশল। নাটকে যে-কথাগুলো বলবার সেগুলো ডাইনে দাঁড়িয়ে বলা যায়, বাঁয়ে দাঁড়িয়ে বলা যায়, মাঝখানে দাঁড়িয়েও বলা যায়। নির্দেশক যে কোন্ সময়ে কাকে কোথায় দাঁড় করাচ্ছেন বা বসাচ্ছেন তার ওপরে নাটকের ঘটনার গুণগত পার্থক্য ঘটে। এবং এই যে সমস্ত টুকরো টুকরো ছবি, এইগুলো গেঁথে গেঁথেই ক্লাইম্যাক্স-এর ক্ষণটা রচিত হয়। আইসেন্‌স্টাইন তাঁর বইয়ে বর্ণনা করেছেন যে কেবলমাত্র কম্পোজিশনের ছন্দে মানুষের মনে আবেগ জাগানো যায়। মঞ্চেও সেই কাজ। অতি দ্রুত অভিনেতাদের স্থান পরিবর্তন করিয়ে মুহুর্মুহু মঞ্চের ওপর তাঁদের বিন্যাসের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে হঠাৎ একটি নাটকীয় কথায় যদি তাঁদের স্থানু ক'রে দেওয়া যায়, এবং একটু পরে একজন সামনে আস্তে আস্তে হেঁটে একদিকে স'রে যায়, ও পিছনে একজন দুম্‌দুম্ ক'রে ক'রে মঞ্চের একদিক থেকে অন্যদিকে বেরিয়ে যায়, তাহ'লে এই বিন্যাসের ও ছন্দের বৈচিত্র্যে নাটকীয় মুহূর্তের যে-রূপ প্রকাশ পায় সেটাও নাট্যশিল্পের একটি অঙ্গ। আবার কেবলমাত্র স্টান্টের জন্য যখন মঞ্চের ওপর অভিনেতাদের অকারণ চালাচালি করা হয় তখন সেটার প্রশ্রয়ও নাট্যশিল্পের পক্ষে ক্ষতিকারক।

বিলিতি সিম্‌ফনিতে যেমন নানান্ যন্ত্রের বিভিন্ন ব্যবহার একটি জটিল নাটকীয়তা সৃষ্টি করে, মঞ্চের অভিনয়েও সেইরকম। এখানে, যেমন একটি মাথার বা একটি হাতের ক্লোজ-আপ নেই, তেমনি এর বিস্তৃত ভূমিকায় একই সঙ্গে কয়েকটি চরিত্রের বিভিন্ন সুরের সংঘাতে জটিল বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার সুযোগ অপার। সে-বৈচিত্র্য আসে অভিনেতাদের স্বর বৈপরীত্যে, যা আনন্দ দেয় কানে। আবার সে-বৈচিত্র্য আসে প্রতি মুহূর্তে কম্পোজিশনের সূক্ষ্ম

পরিবর্তনে, যা আনন্দ দেয় চোখে। এবং সর্বোপরি বৈচিত্র্য আছে একই ঘটনায় বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায়, যা আনন্দ দেয় মনকে। যাই হোক্, Eric Bentley-র উপরোক্ত লেখা থেকে আরো-কিছুটা উদ্‌ধৃত করলে হয়তো আমার সাহায্য হবে।

"...He has departed further from naturalism: just as there is less furniture and less scenery, so there is a less natural handling of actors, a more conscious concern with stagecraft, with pattern, with form. Attention is constantly called to the tableau, to what, in movies, is called the individual 'frame'. You feel that Burl Ives has been *placed* center stage, not merely that he *is* there; in the absence of most of the furniture, a man's body is furnishing the room....All the groupings are formalized. My review should probably be accompanied by diagrams showing where Mr. Kazan put everybody, by twos, by threes, this one over here moon-gazing through the imaginary window, this one over there ego-gazing at the imaginary mirror.... The lights are handled with equal formality." ইত্যাদি।

গোরেলিক নামক এক বিখ্যাত মঞ্চসজ্জাকর তাঁর বইয়ে বলেছেন যে আদিকাল থেকে থিয়েটার খানিকটা illusion এবং খানিকটা convention। অর্থাৎ খানিকটা সে বিভ্রম ঘটাতে চায় এবং খানিকটা সে রীতি অনুযায়ী মেনে নিতে বলে।

যেমন, আমাদের যাত্রায় প্রাসাদ বা অরণ্য কল্পনা ক'রে নিতে বলে, সংস্কৃত মঞ্চে মুদ্রা ক'রে ব'লে দেওয়া হ'তো, — এইগুলো হ'লো convention। কিন্তু রাজাকে রাজার পোষাকই দিয়ে আনা হয়, সেখানে কল্পনার ওপর নির্ভর করা যায় না। সে যাত্রাই হোক্ বা সংস্কৃত নাটকই হোক্। কিন্তু এই যে মিশ্রণ, এর মাপটা দেশ ও কাল অনুযায়ী পৃথক্। তাই আমার দেশের ও আমার কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই মশলার মাপ বের করার দায় শিল্পীর। এবং তার সফল মিশ্রণে, শুধু অচেতন আনন্দ নয়, সচেতন আনন্দ পেলে তবেই শিল্পের উন্নতি।

পপুল্যারিটি

শিল্পীর মহলে 'পপুল্যারিটি' একটা বিদ্যুৎগর্ভ কথা। একে এড়ানো অসম্ভব। শিল্পী স্বভাবতই চায় তার চিন্তার কথা, তার আনন্দের কথা সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে উপভোগ করতে। এবং যতোই সেই উপভোক্তার সংখ্যা বাড়ে ততোই মধ্যপথে ব্যবসায়ীর অভ্যুত্থান ঘটে। এবং যতোই সে-ব্যবসায়ীদের আর্থিক উন্নতি ঘটে ততোই তাঁরা সুস্পষ্টভাবে একটা জিনিস বোঝেন যে কাট্‌তি বাড়লেই লাভের অঙ্ক বাড়ে। অতএব তাঁরা কাট্‌তির কারণের একটা ফরমূলা তৈরী করেন, এবং শিল্পীর ওপরে চাপ দেন সেই ফরমূলা অনুযায়ী সৃষ্টি করতে। কারণ শিল্পী হ'লো তাঁর মুনাফা আনার মেশিন। সুতরাং নিজের কথা অপরকে জানানোর যে-আবেগে শিল্পী শিল্প রচনায় রত হয়েছিলো সেটা উবে যায়, থাকে কেবল মধ্যপথবর্তী দালালদের অনুজ্ঞা আর অনুশাসন।

এদিকে আবার দেশে দেশে জনগণের জয়ধ্বনির জোয়ার। জনসাধারণের রায়ই হ'লো সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিচার। এ-সব কথা সকল বামপন্থীদের মুখেই সোচ্চারিত। সুতরাং সকল সৎমনা শিল্পীও লোকপ্রিয় হওয়ার আগ্রহে উৎসুক, ঊর্ধ্বশ্বাস। অথচ একদিকে শিল্পনিষ্ঠায় অতীতের মহান শিল্পীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবো, অপরদিকে লারে লাপ্পার মতো লোকপ্রিয় হবো, এ-আকাশকুসুম বাস্তবের মাটিতে ফুটছে না। আবার এতো সাহসও নেই যে মুখ ফুটে বলি জনসাধারণের রায় মানি না। তাহ'লে যে একঘরে হ'তে হবে।

বই লিখে পয়সা করা যায় এ-তথ্য যখন অভিজ্ঞতায় এলো, তখন ক্রমশ এ-ও প্রতিভাত হ'লো যে সিনেমায় নিলে আরো পয়সা করা যায়। কাজেকাজেই সিনেমা কোম্পানীর ফরমূলা মেনে কলম চলতে লাগলো। এই ব্যাধি সর্বত্র।

তার ওপর, যতোগুলি লোক বই কিনলে এক সংস্করণ নিঃশেষ হয় প্রায় ততোগুলি লোকই একটি সন্ধ্যাতেই একসঙ্গে নাট্যাভিনয় দেখেন। এবং মঞ্চ-

নাটকের চেয়ে বায়স্কোপ একই জায়গায় অনেক বেশী ক'রে দেখানো যায়। তাতে খরচ কম, কিন্তু লাভ অনেক বেশী।

এদিকে কোনো-না-কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে মানুষ প্রচারের সাহায্য পায় অনেক বেশী। কাজেকাজেই পপুল্যারিটি। এ-ঘটনা আমাদের এই বাঙলাদেশেই বহুবার ঘটেছে যে, দলবিহীন মহত্তর শিল্পীকে তুচ্ছ ক'রে, অবজ্ঞা ক'রে, নিন্দা ক'রে, অনেক নিম্নস্তরের শিল্পীকে নিয়ে মাথায় ক'রে নাচা হয়েছে। যে-কোনো স্মৃতিশক্তিবান লোকেরই এ-সব কাহিনী মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ যে এ-রকম কতো গোষ্ঠীর শিকার ছিলেন তার তো ইয়ত্তা নেই। ম'রে গিয়েও রক্ষা পাননি। একদা শুনেছিলাম সুকান্ত নাকি ঐ-ক'টি কবিতা লিখেই তাঁকে বহুদূরে মেরে গেছে। মারুক। আমাদের দুঃখ এই যে, বেচারী সুকান্তও ম'রে গিয়ে এই অ-শ্লীলতার মধ্যে জড়িত হ'য়ে পড়েছিলো। কারণ সে নিজে খুব ভদ্র ছিলো।

যাই হোক্ এই এক পপুল্যারিটির পন্থা। কোনো গোষ্ঠীর বা ব্যবসায়ীর স্বার্থসিদ্ধি ক'রে দেওয়া। এ-রকমভাবে শুনলে অবশ্য আমাদের সকলেরই খারাপ লাগে। তবু এর আকর্ষণ দুর্নিবার। যখনি শুনি অমুক লোককে বস্তির থেকে নিয়ে এসে ফিল্মের নায়ক বা নায়িকা ক'রে দেওয়া হয়েছে, যখন তার পূর্বজীবন সম্পর্কে নানা অসম্ভব ও অসঙ্গত কাহিনী মুখে মুখে পল্লবিত হচ্ছে, যখন তার সাম্প্রতিক জীবনের সামাজিক বা অসামাজিক প্রেমের কথা ছাপিয়ে ফিল্ম-ম্যাগাজিনে নির্লজ্জ ন্যাকামি করা হচ্ছে, যখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে তার ছবি প্রকাণ্ড কাপড়ের ওপর টাঙানো হচ্ছে, খবরের কাগজে প্রত্যহ তার নাম বেরোচ্ছে, তখন মাথা ঠিক রাখা শক্ত। যে-জনসাধারণ দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক, পটুয়া, বা বিজ্ঞানীকে চেনে না, তারা কিন্তু ফিল্মের প্রেমিক-প্রেমিকার মুখ এতো ঘনিষ্ঠভাবে চেনে যে দর্শনমাত্রেই ভীড় হ'য়ে জমতে শুরু হয় এবং নানাপ্রকার অশালীন চীৎকার ক'রে নিজেদের অপরিতৃপ্ত যৌনক্ষুধার কাদা ছিটোয়। বহুর মধ্যের এই যে-অপরিতৃপ্তি সেটা একটা vicarious তৃপ্তি পায় এই সমস্ত নর-নারীকে আশ্রয় ক'রে। কাজেকাজেই পপুল্যারিটি। এবং এই লোকপ্রিয়তা বজায় রাখবার জন্যে হলিউডের বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী শুনেছি হঠাৎ হঠাৎ কোনো একজনের সঙ্গে পালিয়ে যায়, বা বিয়ে ক'রে ফেলেই সাতদিনের মধ্যে ডাইভোর্স করে। কারণ

তাহ'লে কাগজে বেরুবার মতো একটা খবর হয়। এবং যতো কাগজে নাম বেরুবে ততোই তো প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হবে।

আর-একদিকে আছে বহু সাধারণ মানুষের অসাধারণ বিশিষ্টতা লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা। তার ফলে জন্ম দেয় রাজনৈতিক নেতাদের। তাঁদেরও কিছুদিন অন্তর অন্তর ভেবেচিন্তে এমন এক একটা চমকপ্রদ কাজ ক'রতে হয় যে তাই নিয়ে কাগজে-পত্রে আবার হৈ-চৈ চলে।

আসলে বড়ো করুণ এই দৃশ্য। আমরা প্রত্যেকেই মাত্র কয়েকটা বছর এই পৃথিবীতে বাঁচবার ইজারা নিয়ে এসেছি। 'তারই মধ্যে সব খেলার সীমা, সব কীর্তির অবসান।' যৌবন পর্যন্ত বেঁচে যাই অচেতনভাবে, প্রকৃতির তাগিদে। তখন মনে হয় আমরাই বেঁচে আছি, এবং আমরাই বেঁচে থাকবো চিরকাল। কিন্তু সূর্য যতোই পশ্চিমে ঢলতে থাকে ততোই বুঝতে পারি যে জীবনের অবিরাম খরস্রোতে একটু-একটু ক'রে আমাদের পারের দিকে ঠেলে দিচ্চে যেখানে নানান্ 'অর্থলুপ্ত ইতিহাসের অবশেষ'। আর তখনই শুরু হয় এক টাগ-অব্-ওয়ার। স্টাণ্ট্ মেরে, বেলেল্লা প্রকাশ ক'রে, কোনোরকমে লোকচক্ষুর সম্মুখে নিজেকে খাড়া রাখা। এবং কথায় বলে, সাধারণের স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল। অতএব কোনো লোকের নাম যদি পনেরো বিশ বছর ধ'রে খবরের কাগজে প্রায়ই বেরোয়, তা সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দেবার জন্যেই হোক্ বা অজস্র বেলেল্লায় যুক্ত থাকার জন্যেই হোক্, সাধারণ মানুষ স্বতঃই ধ'রে নেয় যে লোকটা নিশ্চয়ই দামী হবেন, আরে আমরা কতোদিন থেকে ওঁর নাম শুনছি।

এইভাবে যে-সভ্যতায় চিন্তাশীল লোকদের চাইতে চিন্তাবিহীন লোকেরা বেশী পাব্লিসিটি পায় (এবং নির্বিরোধে) সে-সভ্যতার কতো দাম ?

এ ছাড়া জনসাধারণের অজ্ঞতার, কুসংস্কাররের ও ছেলেমানুষির একটা ব্যাপার আছে। ওস্তাদি গান শুনতে লোক রাত্তিরে ফুটপাথে ব'সে থাকে দেখে আমরা সবাই আশ্চর্য হয়েছি, প্রায় অভিভূত হ'য়ে গিয়েছি কৃতজ্ঞতায়। কারণ, সাধারণত লারে-লাপ্পাই-ই তাদের মুখে মুখে দ্রুত সংক্রামক মড়কের মতো গজিয়ে ওঠে। উদয়শঙ্করের নাচের চেয়ে 'শ্যামলী'ই বেশী চলে কলকাতার বুকে। শিশিরবাবুর শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলো পর্যন্ত ম্লান হ'য়ে যায় 'শ্যামলী'র বিক্রীর হিসাবের সামনে। অবশ্য বহু জ্ঞানী ও রসিক লোক

এ দের শ্রদ্ধা করেন অনেক বেশী। এবং সেই শ্রদ্ধাটা আবছায়া ও ধোঁয়াটে হ'য়ে 'জনসাধারণের' মনের মধ্যেও আছে। কিন্তু টাকা তথা ভীড়ের অঙ্কে যে-পপুল্যারিটি, সেটা পায় অনেক মোটা দাগের বোকা লোকেরা।

ব্যবসায়ীরা সিনিক্ হন। তাঁরা হেসে বলেন, 'তাইতো। একটু হৈ-হৈ ক'রে কান্না, একটু ভাঁড়ামি ক'রে হাসি, বেশ ঝকঝকে পোষাক, আর এক থাবা সেক্স-অ্যাপীল, — ব্যাস্ জ'মে কুল্‌ফি হ'য়ে যাবে। মশাই, এটা কমার্শিয়াল ব্যাপার। জনসাধারণের মনের মতো না-হ'লে পয়সা দেবে কেন ?'

রাজনৈতিক নেতারা বলেন, 'পিপল্ স্বর্গ, পিপল্ ধর্ম, পিপল্‌হি পরমন্তপ'। পপুলার না-হ'লে সার্থকতা নেই। ভোটের ওপরেই ইলেক্‌শন্ জেতা। দেখেন না, আচারে-ব্যবহারে খাঁটী য়ুরোপীয়ান যে জিন্নাসাহেব তিনিই হলেন মুস্লিম কৌমের জন্মদাতা! এবং নেহ্‌রুজীরা গেলেন কুম্ভের জল মাথায় দিতে!

বিশেষ ক'রে মার্কস্‌বাদী কোনো নেতা যখন এইধরনের কথা বলেন তখন বড্ডো আশ্চর্য লাগে। কারণ, আমরা যতোদূর জানি মার্কস্‌সাহেব নিজের জীবদ্দশায় জগতের প্রলিটেরিয়েটের কাছে পপুলার হ'য়ে উঠতে পারেননি।

যাই হোক্ এই অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে না সমাজের কর্তাদের কাছে তারিফ পেয়ে, না সাধারণ লোকের কাছে নাচানাচি পেয়ে বহু নাট্যকার বা নাট্যগোষ্ঠী দিশেহারা হ'য়ে যাচ্ছে। এবং ভুল করছে। পৃথিবীতে কোনো জিনিস তো অকস্মাৎ হয় না, তার একটা পরিবেশ থাকে, কারণের একটা পারম্পর্য থাকে। নাটক করতে গেলে পয়সা লাগে। কাজেকাজেই দেখতে হয়, সে-পয়সাটা দেবে কে ? কারণ খরিদ্দার বুঝেই জিনিস তৈরী হয়। ফিল্মের কর্তারা মোটরগাড়ী, ড্রইংরুম আর কোটপ্যাণ্ট সম্বলিত একরকম ছবি করেন, সেটা হ'লো ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের ও যাঁদের একটু 'আধুনিক আধুনিক' বাই আছে তাঁদের জন্যে। আর একরকম ছবি হয় পৌরাণিক দেব-দেবীদের নিয়ে। সেগুলোর আসল লক্ষ্য মফঃস্বলের মেয়েরা। ঠিক তেমনি কোনো নাট্যগোষ্ঠী যদি দেখেন তাঁর তনু-মন-ধন নির্ভর করছে রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক নেতার ওপরে, তাহ'লে তাঁকে সেই রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক

অনুশাসনগুলো অনুসরণ করতেই হয়। হয় পলিটিক্যাল লেকচার, নয় সেক্স-অ্যাপীল। কোনো কোনো চালাক লোক দুটোই করেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় জগতে বার বার এক উল্‌টো বিপত্তি দেখা দিয়েছে। শিল্পীরা স্পর্ধা ক'রে বলেছে যে, আমার শিল্প কেবল আমারই জন্যে। কিংবা কেবল আমার ছোট্টো গোষ্ঠীর জন্যে। ফলে সাধারণ জীবনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আঙ্গিকসর্বস্ব কাগজের ফুল হ'য়ে পড়েছে। পৃথিবীর মহত্তম শিল্পীরা কিন্তু এ-ভুল করেননি।

পারিপার্শ্বিক জীবন শিল্পীর মনে আলোড়ন জাগায়। যে-সব ঘটনা তার অন্তস্তলের গভীরে গিয়ে ঘা দেয় সেইগুলোকেই সে রাঙিয়ে রসিয়ে অপরকে জানাতে চায়। কিছু গভীর কথা যদি গভীরভাবে বলবার থাকে তার, তবেই সে শিল্পী। আর কেবলই যদি লোকের কোল কেড়ে চেপে বসবার চেষ্টা করে সে, কেবল যদি মনোহরণ করাটাই উদ্দেশ্য হয় তার, তাহ'লে সে ভাঁড় মাত্র। উদ্দেশ্য তো নয় সকলের মন যুগিয়ে চলা, উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের মনোমত কথাটা সকলকে বুঝিয়ে তাদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেওয়া। এ ছাড়া সভ্যতার অগ্রগতির তো কোনো মানে নেই। অগ্রগতি মানেই বিপ্লব। প্রতি পদক্ষেপেই নূতনের সঙ্গে পুরাতনের বিরোধ। নির্বিচার মানার বিরুদ্ধে বিচারসহ বিদ্রোহ।

এই বিদ্রোহের বীজ সমাজের সকল ক্ষেত্রেই সমস্ত সময়ে উপ্ত থাকে। ক্রমে ক্রমে একদিন সে ডালপালা প্রসার ক'রে বিরাট মহীরুহের মতো সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন তাকে স্বীকার করতেই হয়। তারপর সেই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই মহীরুহকে ঘিরে গোঁড়ামির বেদী তৈরী হ'তে থাকে। দেবতাকে চেপে রেখে মহান্তদের আসন তৈরী হয় একেবারে অগ্রগতির পথের ওপরে। এঁরা রবীন্দ্রনাথের মতো জন্ম-বিদ্রোহীকেও গোঁড়ামির বেদী দিয়ে ঢেকে ফেলতে চান। নইলে 'বহুরূপী'র 'রক্তকরবী' অভিনয় করার অনুমতি নিয়ে এতো অস্বাভাবিক গণ্ডগোল হ'তে পারে কখনো? 'জলজলা'র পর? 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র পর? 'মালঞ্চে'র পর।

কিন্তু কিছুতেই এঁদের ইচ্ছা পূরণ হবে না। অতীতের সেই বিশালমহীরুহ মহান্তের বেদীতে বন্দী হ'য়ে বীজের মুখে বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছে বর্তমানের কাছে। সেই বীজ অজস্র শিকড়ের চাপে একদিন ফাটিয়ে ভেঙ্গে ফেলবে

গোঁড়ামির এই মার্বেল পাথরের শ্রেণী। এই হ'লো পপুল্যারিটি, এই হ'লো সার্থকতা, রবীন্দ্রনাথের। মহান্তেরা যেদিন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মিশিয়ে যাবেন অবহেলার ধূলোয়, সেদিনও আমাদের সন্ততির কাছে রবীন্দ্রনাথের যৌবন স্পর্শগ্রাহ্য, দৃষ্টিগ্রাহ্য, প্রেমগ্রাহ্য থাকবে।

অথচ এই রবীন্দ্রনাথ কি কেবলমাত্র লোকপ্রিয় হবার চেষ্টা করেছিলেন? সে-চেষ্টা যেমন তিনি করেননি, তেমনি তিনি বহুদিন পর্যন্ত মোটেই লোক-প্রিয় ছিলেন না। সে-কথা তিনি নিজেও জানতেন। তাই শুনেছি যে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর যখন একগাড়ী বড়োলোক-সব শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে মালা দিতে তখন সে-মালা রবীন্দ্রনাথ ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তিনি নিজেই লিখেছেন যে, ইচ্ছা করলে দেশের লোকপ্রিয় হওয়া তাঁর পক্ষে শক্ত ছিলো না।

তবে কি শিল্পী কেবল নিজের মনেই মশগুল হ'য়ে সৃষ্টি করবে? লেখক কি তার পাঠককে বোঝবার চেষ্টা করবে না, অভিনেতা বা নাট্যকার তার দর্শককে? নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা যখন আমাদের বন্ধুর সঙ্গে বা প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলি তখন কি কেবল তার মন জুগিয়ে কথা বলতে চাই, না আমার মনের কথাটা তাকে বুঝিয়ে বলতে চাই? মন জুগিয়ে কথা বলে তো মোসাহেবরা, ভাঁড়েরা।

আমরা কি আমাদের শিল্পসম্ভার সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলবোনা ভোক্তাদের ভালো লাগাবার জন্যে! নিশ্চয়ই, যতোটা পারি। স্ত্রীও তো সাজে তার স্বামীর জন্যে। 'চুল বাঁধে, গা ধোয়, পরিষ্কার একটা শাড়ী প'রে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়, পান খায়, আর টুকিটাকি ঘরের কাজ করতে করতে উন্মনা হ'য়ে অপেক্ষা করে। আর বারনারীও তো কতো প্রসাধন ক'রে অপেক্ষা করে। কিন্তু দুটো কি এক?

অবশ্য সময়ে সময়ে এমন অবস্থা আসে সমাজের, যখন স্ত্রীর ঐ শুচিস্মিত পরিচ্ছন্নতা স্বামীর মন টানে না। তার মন তখন লুব্ধ হ'য়ে ওঠে উগ্র প্রসাধনের ঔজ্জ্বল্যের জন্যে, অশালীন উল্লাসের অভদ্র চীৎকারের জন্যে। তারও কারণ অনুসন্ধান করলে হয়তো দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রে সেই স্ত্রীদের শান্ত পরিবেশ স্তিমিত হ'তে হ'তে ক্রমে একটা জীবনীশক্তিহীন নীরক্ত আবহাওয়ায় পরিণত হয়েছে। প্রেমের জ্বালা সেখানে থাকে না, তাব

উত্তরোল উদ্দামতা থাকে না, থাকে শুধু নিস্তরঙ্গ গোষ্পদের সঙ্কীর্ণ মৃত আবহাওয়া। তখনই মানুষের মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। 'সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।' কাজেকাজেই চরিতার্থতা খোঁজে ভুল পথে। এবং সেই ভুল পথের নির্যাস পান ক'রে কিছুদিন মাতলামি ক'রে ঘোরে। সেই সময় যদি কেউ তাকে শান্ত জীবনের বলিষ্ঠতার কথা বোঝাতে চায়, যদি স্নিগ্ধ পানীয়ের পাত্র তার মুখে তুলে ধরতে যায়, তাহ'লে তাকে ব্যঙ্গ ক'রে, বিদ্রূপ ক'রে, এমন-কি ক্রুদ্ধ হ'য়ে মাতলামির ঝোঁকে মেরেও বসে। কিন্তু তখন কি শিল্পীর দোষ? সেটা তার দুর্ভাগ্য হ'তে পারে, কিন্তু দোষ নয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন সমাজ নিয়ত পরিবর্তমান। কোনো-একটা নিগড়ে বেঁধে একে চিবকালের মতো স্থির করা যায় না। এবং সেই পরিবর্তনের প্রয়োজন জ'মে জ'মে অকস্মাৎ একদিন বিপ্লবে আত্মপ্রকাশ করে। আবার কিছুদিন সেই একই ধারায় চলে। এবং বিদ্রোহের বীজ গোপনে উপ্ত হ'য়ে ধীরে ধীরে শক্তিসংগ্রহ ক'রে বাড়ে।

এই যে বারে বারে বিপ্লব, এর প্রয়োজন ঘটে কেন? নিশ্চয়ই সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কতকগুলো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটতে দেওয়া হয় না ব'লে। কেন ঘটতে দেওয়া হয় না? কারণ কতকগুলো লোক অবস্থিত বিধিব্যবস্থায় সুবিধে পায় এবং সেই সুবিধে বজায় রাখবার জন্যে বিস্তর লোককে বাক্যের জাল বুনে ভুলিয়ে রাখে ব'লে। সেইজন্যে কোনো শিল্পী যখন ভবিষ্যতকে অনুভব করে প্রাণের মধ্যে, তখন তার কথা সেই বিস্তর লোকেরা বোঝে না, আর সুবিধাপায়ীরা তাকে সন্দেহের রক্তচক্ষে দেখে। এই দুর্ভাগ্য ঘটতে বাধ্য, বারে বারে ঘটবেই। কারণ চিরকাল এ-যুদ্ধ চলবে রক্ষণশীল আর অগ্রচারীদের মধ্যে। হয়তো রক্তক্ষয়ী হবে না কোনো-এক ভবিষ্যতে, কিন্তু যুদ্ধ থাকবেই।

আমাদের দেশের নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস দেখলে এই পপুল্যারিটির একটা প্রতিফল দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় এক শতাব্দীকাল বাঙলাদেশে মঞ্চ চলেছে। এবং বহু নাটক বহু রাত্রি অভিনীত হ'য়ে মুদ্রারূপ স্নেহলাভে ধন্য হয়েছে। কিন্তু আজও গৌরব ক'রে বলবার মতো নাটক কটা জন্মালো! যাঁরা ছিলেন এর আদি স্রষ্টা তার মধ্যে কয়েকজন নিঃসন্দেহে সেই শক্তিধর

ছিলেন। কিন্তু তারপরেই সেই গভীর কথা গভীর ক'রে বলবার লোক মারা গেলেন, আর মঞ্চও গভীর আনন্দ দেওয়ার ক্ষেত্র থেকে চমক দেওয়ার ক্ষেত্রে নেমে এলো। এবং ক্রমশ সেটা এমন জায়গায় পৌঁছুল যে নাটকের বক্তব্য চুলোয় গেলো, তার সমগ্রতা চুলোয় গেলো, রইলো শুধু বিশিষ্ট অভিনেতাদের নিজস্ব প্যাঁচ দেখাবার কয়েকটি দৃশ্য। এই কি শিল্পসৃষ্টির পদ্ধতি! এর ফলে এক একটা দৃশ্যে চমকানির ফুলঝুরি কাটে, অত্যুক্তির তুবড়ীবাজী। তাতে মানে না-থাক, মজা আছে। সেই মজা খেতে খেতে দর্শকের মন বেশ ম'জে আছে। এ যেন খুব লঙ্কা তেল দিয়ে গর্‌গরে ক'রে রাঁধা ব্যঞ্জন। এর স্থানে অত্যুক্তিবিহীন জীবনপ্রতিম নাটক লিখলে বা অভিনয় করলে সেইসব দর্শকের মনে আলুনি লাগবে। আমি দেখেছি তারা সম্পূর্ণ ওড়াতে পারে না, প্রশংসাই করে, কিন্তু, — তবু ঐ একটা কিন্তু থেকে যায়।

বাঙলা মঞ্চ পপুল্যারিটি হারাবার ভয়ে কোনো বিধবাকে সমাজের প্রতিকূলে দাঁড় করিয়ে প্রেমে পড়াবে না। যা একজন আধজন বিধবা নায়িকা দেখা গেছে সে কেবল শরৎচন্দ্রের দয়ায়, এবং মঞ্চের বাইরের জগতে যখন সেটা সকল সৎলোকদ্বারা স্বীকৃত। এবং তা-ও করবার সাহস পেয়েছেন মাত্র সেই এক-আধজন যাঁদেব আমরা বাঙলা মঞ্চের দিক্‌পাল মনে ক'রে থাকি। সাধারণভাবে তো মোটেই হয়নি। অসবর্ণ বিবাহ আজও অসম্ভব। স্টেজের ওপর রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে আরো অসম্ভব। এইরকম আরো অনেক অসম্ভব তালিকায় আছে। এগুলো ব্যঙ্গের জন্যে আমদানি হ'তে পারে, সত্যচিত্র হিসাবে না। তাঁরা বলেন, 'এইগুলো করলে মশায়, লোক খ'চে যাবে, বিক্রী হবে না।'

হয়তো তাই। এ-রকম অভিজ্ঞতা তো আমার অজস্র আছে যে বাড়ীর লোকের মন রাখতে অসবর্ণ বিয়েতে রেজিস্ট্রিও হ'লো, আবার পুরুতকে পয়সা দিয়ে সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে একটা লোকদেখানো বিয়েও হ'লো। এমনও দেখেছি যে, মুখে আলট্রা-আলট্রা মডার্ণ থিয়োরী কপচান অথচ বিয়ের সময় চেলি গায়ে, মুখে চন্দনেব ফোঁটা, হিঁদু বিয়ে ক'রে এলেন। এঁরা সবাই অবস্থাপন্ন ঘরের উচ্চশিক্ষিত লোক। মঞ্চমালিকরা তো ব্যবসায়ী লোক, এদের গোঁফ দেখেই খরিদ্দারের ধরনটা বুঝে নিয়েছে। আশ্চর্য লাগে, যখন এইসব ভণ্ড শিক্ষিত লোকেরা আমাদের মঞ্চকে নিন্দা করে।

যাই হোক্‌গে, আমাদের মাথা গরম করায় কাজ কী! মোটকথা হচ্ছে যে এইরকম লোকেদের মন জুগিয়ে পয়সা বানাতে গিয়ে মঞ্চ জাতিভ্রষ্ট হয়েছে। অথচ নির্ভীকভাবে প্রেমের কথা, জীবনবেদের কথা বলতে চেষ্টা করলে আজ তার অবস্থা অনেক বেশী গৌরবের হ'তো।

মাতালবাবুদের মাতলামির প্রশ্রয় দিয়ে তাদের মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টার মধ্যে বহু বারনারীর শেষজীবনে পান বিক্রী ক'রে বাঁচার কাহিনী দাগা আছে। এবং এই খ্যাতি তথা অর্থের ঝোঁকে পড়লে এই সমস্ত আনন্দদানের ক্ষেত্র গল্পের অছিলায় সুন্দর যুবক ও সুন্দরী যুবতীকে নানাভাবে প্রদর্শনের ক্ষেত্র হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। অর্থাৎ শিল্প নয়, উচ্ছৃঙ্খলতার দালালি। মেয়ে দেখিয়ে যারা পয়সা নেয় তাদের আমরা সমাজের নিকৃষ্টতম দালাল ব'লে মনে করি না কি ?

তবু, অনেককেই তো এই ক্ষেত্রেই পয়সা রোজগার করতে চেষ্টা করতে হয়। এ বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করি। কারণ, পৃথিবীতে বাঁচার চেয়ে বড়ো পুণ্য নেই। কিন্তু বাঁচতে হবে এই অশ্লীল অবস্থাকে নিন্দা ক'রে নতুনকে গড়বার সাহায্য করার প্রেরণায়। নইলে কেবলমাত্র পপুলার হবার চেষ্টা করলে যে নিজের আত্মমর্যাদাই নষ্ট হবে।

১৯৬৩

একটি অন্বেষণে

আমরা একটা যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। স্বাধীনতার পর আমরা জাতি হিসেবে নিজেদের একটা বিশিষ্ট পরিচয় অর্জন করবার চেষ্টা করছি। যাতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা আমাদের সেই ভারতীয় বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে। কিন্তু ভারতীয়ত্বের সেই বিশিষ্ট আধুনিক পরিচয় যে কী হবে তা বোধহয় এখনো আমরা সঠিক ধরতে পারিনি।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বহু প্রকাশই আমাদের সকলের কাছে খুব গৌরবের। কিন্তু জীবনধারণের সেই প্রণালী আমাদের আজকের দিনের পক্ষে অসম্ভব। চেষ্টা ক'রে সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। তাহ'লে কি আমাদের দেশের যন্ত্রশিল্প যেমন য়ুরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে বিস্তৃত হচ্ছে, তেমনিই আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি আচার ব্যবহার সবই তাদের নকলে গ'ড়ে উঠবে। যেমন ঐতিহ্যবিহীন যে-কোনো অনুন্নত জাতি য়ুরোপীয় পোষাক থেকে ধর্ম পর্যন্ত সবই নিজেদের সমাজে মেনে নেয়? নাকি আমরা বিচার ক'রে গ্রহণ করবো ও বর্জন করবো? তা যদি করি তাহ'লে সেই বিচারের কেন্দ্র কী? — সন্দেহ নেই, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার ওপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ তৈরী হবে। এবং ইতিহাস তার রায় দেবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিল্পকর্মেরও প্রত্যেক স্তরে বহুল ও বহুধা পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। তার একটি কথা আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

নাটকে আজকাল স্বগতোক্তি থাকে না। থাকলে আমাদের দর্শকদের হয়তো অবাস্তব লাগে। সেকেলে ব'লে মনে হয়। অনেক অভিনেতাও বলেন যে, কাউকে উদ্দেশ্য ক'রে কথা বলা যায়, কিংবা বুড়োবুড়ীদের মতো আপন মনে একটু-আধটু বক্‌বক্ করাও যায়, কিন্তু গম্ভীর হ'য়ে নিজের মনের কথা গড়্ গড়্ ক'রে ব'লে যাওয়া — ভীষণ অস্বাভাবিক লাগে। আবার এ-কথাও শুনেছি যে, এতে নাট্যকারের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়, যে-কথাটা ঘটনার মধ্যে

প্রকাশ করা গেলো না সেটা চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়ে সহজে প্রকাশ ক'রে দেওয়া হ'লো।

কিন্তু হ্যামলেটের স্বগতোক্তি সম্পর্কে আমরা জানি যে সেগুলো অক্ষমতার প্রকাশ নয়, বরঞ্চ তাইতেই সত্যের আর-একটা গভীরতর স্তর আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়। 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের স্বগতোক্তিতেও তাই মনে হয়।

অর্থাৎ একধরনের নাটক হয় যার মধ্যে ঘটনাই নায়ক। সেখানে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চরিত্রগুলো যে-আচরণ করে তাতেই তাদের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু আর-একধরনের নাটকে — অন্তত, একটা মূল চরিত্র — বাইরের ঘটনার সংঘাতে জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধির চিন্তাস্রোত বাইরের ঘটনাগুলোকে ছাড়িয়ে এক নতুন নাটকীয় অর্থ বহন করে।

অর্থাৎ একটাতে যেন আমরা তৃতীয় ব্যক্তির মতো বাইরে থেকে একটা অনবস্থিত দেয়ালের মধ্য দিয়ে কেবল আচরণটা দেখি। আর অপরটাতে যেন নাটকের চরিত্রের নিকটবর্তী হ'য়ে তার subjective জগৎটার মধ্যে চ'লে যাই।

বাস্তবকে দেখবার এই যে objective দৃষ্টি (প্রথমোক্ত ধরনের নাটকে যেটা প্রকাশ পায়) সেটা য়ুরোপে শুরু হয়েছিলো ঐতিহাসিক কারণে। আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে। তাই সেখানে অভিনয়েও বাস্তবানুকরণ প্রচুর বৃদ্ধি পায়। বিরাট চরিত্রের অভিনয়ের চেয়ে যৌথ অভিনয়ের প্রয়াস বাড়তে থাকে। দৃশ্যপট ও মঞ্চসরঞ্জামের দ্বারা পরিবেশকেও নাটকের একটা চরিত্র হিসাবে প্রকাশ করা হ'তে থাকে।

এই নতুনযুগের কলাকার হিসেবে Antoine, Stanislavski প্রভৃতি নাট্য প্রযোজনায় নতুন রূপ ও নতুন আস্বাদ আনলেন। (তারপরে এই যৌথ অভিনয়ের ওপর আবার একটা ঝোঁক আসে রুশ বিপ্লবের পর।) কিন্তু এই নব্যরীতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এর বাঁধন কাটবার চেষ্টাও শুরু হ'য়ে যায়। অর্থাৎ চেষ্টা চলতে থাকে যে ব্যক্তিগত মানুষের গভীর ও মৌল প্রশ্নগুলো কী ক'রে প্রকাশ হ'তে পারে। সমাজগত মানুষ আর ব্যক্তিগত মানুষের সমন্বিত প্রকাশ কী ক'রে নাট্যরীতিতে সম্ভব হ'য়ে উঠতে পারে। আর তাই, বাস্তবানুকরণের পথে সত্যপ্রকাশের যে-বাধা সৃষ্টি হয়েছে সেই বাধা ভেঙে গভীরতর সত্যপ্রকাশের একটা নাট্যরীতির অনুসন্ধান চলেছে। এবং তার

ফলে বলা যায় পুরনো নাট্যরূপ যেন অনেকটাই ভেঙে গেছে। এখন Martin Esslin প্রমুখ কিছু নাট্যবিদ্ আশা করছেন যে Brecht ও Absurdistদের নাট্যরূপের সমন্বয় যদি কেউ ঘটাতে পারেন তাহ'লেই পাশ্চাত্যে নাট্যসৃষ্টির একটা সার্থক যুগ আসবে।

আমাদের দেশের পরিবর্তনের ছন্দটা কিন্তু ভিন্ন। এবং অনেক ক্ষেত্রেই বেশ কুটিল। আমরা বিজ্ঞানের সে-অভ্যুদয় দেখিনি যাতে সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদী হ'য়ে উঠতে পারি নাটকে। আমাদের দৃশ্যপট বা মঞ্চসজ্জা কখনোই বাস্তবের বিভ্রম ঘটাতে পারে না। মস্কো আর্ট থিয়েটার কতোযুগ আগে চেখভের নাটকের বাস্তবানুগ রূপারোপ করেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে হ্রদ দেখা যাচ্ছে, আকাশে বিকেল থেকে সন্ধ্যা হ'লো, নিস্তব্ধ প্রান্তরে দূর থেকে ভেসে-আসা একটা নিঃসঙ্গ আওয়াজ, বৃষ্টি, এমন-কি ট্রেন আসা — এ-রকম অনেকানেক বাস্তববিভ্রম ঘটিয়ে দর্শককে পরিবেশের মুড্ ও কাব্য অনুভব করিয়েছে। সে অনেকদিন আগে।

কিন্তু আমাদের দেশে পার্শী থিয়েটারে, ও তারই অনুকরণে কিছু বাঙলা থিয়েটারে, অশ্বপৃষ্ঠে ওস্‌মানের প্রবেশ হ'তো, রাস্তার দৃশ্যে মোটরগাড়ী ঢুকতো (শুনেছি, কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে নাকি ট্রাম-গাড়ীও চালানো হ'তো), মহাদেবের তৃতীয় নয়ন জ্ব'লে উঠতো, অপ্সরীরা আকাশে উড়ে যেতো, সুদর্শন চক্র ঘুরতে ঘুরতে এসে শিশুপালের শিরশ্ছেদন করতো। 'কেদার রায়' নাটকে নৌকা ক'রে সোনা-র অপহরণ, দুর্গ আক্রমণ ক'রে জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি করতালিপ্রদ দৃশ্য ছিলো। যতোদূর মনে পড়ে শ্রী শচীন সেনগুপ্ত মশায়ের একটি নাটকে ভূমিকম্পে মঞ্চের উপরে বাড়ী ঘর দোর ভেঙে পড়তো, এবং শ্রী মনোজ বসুর একটি নাটকে প্লাবনের মধ্যে একা শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী একটি টিলা আঁকড়ে বাঁচবার চেষ্টা করতেন আর স্টিমারের তীব্র আলো ঘুরে ঘুরে যেতো। এই শেষোক্ত নাটকটায় প্লাবনের পরবর্তী অবস্থা দেখাতে একটুকরো বায়স্কোপও দেখানো হ'তো ব'লে যেন মনে পড়ছে।

অর্থাৎ আমাদের ব্যবসায়িক থিয়েটার বাস্তবরূপের কাব্যকে ফুটিয়ে তোলার পরিবর্তে কেবলই রোমহর্ষক করতালিলুব্ধ অপকৌশল ঘটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। য়ুরোপীয় বাস্তবানুকৃতির মধ্যে জীবনকে নাট্যরূপের মধ্যে অনুবাদ করবার যে-নিষ্ঠা ছিলো, যে-শ্রদ্ধা ছিলো, তা আমাদের মঞ্চে সম্ভব

হ'লো না। তার চেয়ে হঠাৎ এক একটা দৃশ্যে ইন্দ্রজাল ঘটানো অনেক সহজ উপায় ব'লে মনে হয়েছে এঁদের কাছে। এবং যখনি এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তখনি বাঙলা রঙ্গমঞ্চ কলাশিল্প হিসেবে দেউলে হ'য়ে গিয়েছে। আজ আবার সেইরকম দুর্যোগ যেন শুরু হচ্ছে।

আর তাই বিদেশ থেকে কেউ মঞ্চাভিনয় দেখে এলে তাকে সবচেয়ে বেশী এই প্রশ্ন করা হয়, — 'ওখানে আঙ্গিক কীরকম দেখলেন? দারুন, না?' — অর্থাৎ নাট্যাভিনয় যে একটা কলাশিল্প, তার কাছে যে আমরা কিছু গভীর কথা শুনতে চাই, এ-সব চিন্তা আমাদের মন থেকে কতো সহজেই মুছে দেওয়া যায়।

অথচ এদিকে আমরা সেই বাস্তবানুগ অভিনয়ের কথা শুনেছি যেখানে অভিনেতা আর অভিনেয় চরিত্রকে এক ব'লে প্রতীয়মান হবে। সেটাই নাকি অভিনয়শিল্পের চরম।

আবার বিরাট চরিত্র বাদ দিয়ে সামান্য সাধারণ চরিত্রসমূহের যৌথ অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত লেখা পড়েছি। জেনেছি সেটাই নাকি শিল্পোৎকর্ষের চরম।

একক অভিনেতার অলৌকিক অভিনয় প্রতিভার কথাও শুনেছি। আবার এ-কথাও শুনেছি যে অভিনেতা যদি সর্বদা তাঁর অভিনেয় চরিত্র থেকে দূরত্ব বজায় না-রাখতে পারেন তাহ'লেই দুর্বলতা। তাঁকে যেন কখনো চরিত্রটি ব'লে ভুল না-হয়।

আমরা থিয়েট্রিক্যাল থিয়েটার সম্পর্কেও এমন কোটেশন-কন্টকিত কথা শুনেছি যে না-মানবার সাহস হয়নি। আবার যা দেখে চোখে জল আসে তাকেই এতো নিশ্চিত নির্ঘোষে 'মেলোড্রামাটিক' বলতে শুনেছি যে চোখের জলের জন্যে লজ্জা বোধ করেছি। তখন আবার subdued acting সম্পর্কে বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে সেইটাই বোধহয় আসল আর্ট। শেষপর্যন্ত উদ্‌গ্রীব হ'য়ে খবর নেবার চেষ্টা করি যে পশ্চিম থেকে একেবারে শেষ ডাকে কী খবর এসেছে, সেখানে কী বলছে। কারণ তাহ'লেই বুঝতে পারবো যে কোনটা আমাদের ভালো লাগা উচিত।

আমাদের পরিচয়ভ্রষ্টতার এটাই তো একটা বড়ো কারণ এবং নিদর্শন। কিন্তু এই হীনমননকে পেরিয়ে গিয়েই তো আমাদের নিজস্ব পরিচয় জয় ক'রে

আনতে হবে। এবং সেই অভিযানে আমাদের ডুবে যেতেই হবে আমাদের দেশের বোধের গভীরে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্পকর্ম বাস্তবের অন্তর্নিহিত সত্যকে রূপ দিতে চেয়েছে, এ-আলোচনা আমরা শুনেছি। সেইযুগে নাটক ও নাট্যাভিনয় আমাদের-থেকে-ভিন্ন-এক-রীতিতে মানুষের এই অন্তরঙ্গ পরিচয় মঞ্চে প্রকাশ ক'রে কলাশিল্পের মর্যাদা পেতো। এবং সে-শিল্প বোধকরি উপেক্ষণীয় ছিলো না।

কিন্তু নিঃসন্দেহে ভিন্ন ছিলো। ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগের নাট্যশিল্প গ্রীকদের নাট্যশিল্পের মতো সংঘাতভিত্তিক ছিলো না। অথচ দুই দেশের সঙ্গেই দুই দেশেব পরিচয় ছিলো। ব্যবসাবাণিজ্যের আদানপ্রদানও ছিলো। কিন্তু শিল্প-প্রকাশের ক্ষেত্রে এ-ব্যবধান কেন? চিত্রে, ভাস্কর্যে, — সর্বত্রই এই পার্থক্য। আধুনিক য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে গ্রীক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। আর ভারতবর্ষের নানান্ লোকনাট্য সংস্কৃত নাট্যের দ্বারা প্রভাবিত। অত্যাধুনিক যে Ionesco তিনিও বলেন যে সংঘাত ছাড়া থিয়েটার হয় না। অথচ গুজরাতের ভাওয়াই থেকে বাঙলাদেশের কৃষ্ণযাত্রা পর্যন্ত সংঘাতভিত্তিক নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকও সংঘাতভিত্তিক নয় সেইভাবে। অর্থাৎ এ-ভিন্নতা যেন জীবনকে দেখার ভিন্নতা। দর্শনের ভিন্নতা।

এ-সকল বিশ্লেষণ আমাদের বোধহয় করতেই হবে। না-ক'রে উপায় নেই ব'লে। তাই আশাকরি আমাদের নাট্যোৎসাহী যুবকেরা এ-তত্ত্ব অনুসন্ধানের কাজে লাগবেন।

গ্রীসীয় সভ্যতার মধ্যে তবু প্রাচ্যের সঙ্গে বহু মিল ছিলো, কিন্তু পরবর্তী য়ুরোপে খৃষ্টীয় সভ্যতার সঙ্গে এ-পার্থক্য আরো গভীর হয়েছে। সেটাও দর্শনের ভিন্নতা। এদেশের দর্শনের মধ্যে ঈশ্বর ও শয়তানের দুটো চিরন্তন পৃথক সত্তা সৃষ্টি হয়নি। এখানে ঈশ্বরই ভয়ঙ্কর। তাঁরই দয়াহীন তাণ্ডবের ফলে পৃথিবীতে সংহার আসে। তিনি কেবল পালনকর্তা নন, তিনি রুদ্রও। ভালোমন্দ উভয়েরই জন্মদাতা তিনি। তিনি সর্বপ্রজ্ঞঃ। (এই দর্শনের বৈশিষ্ট্যের কথা ঐতিহাসিক টয়েনবি-ও উল্লেখ করেছেন।)

এই দর্শনের ভিত্তিতে তাই সংঘাত তার শেষ কথা নয়। বিরোধের সমন্বয়ে জীবন যে একটা নতুন স্তরে উত্তরিত হয় এইটেই বোধহয় প্রকাশ পেয়েছে।

কামকে অতিক্রম ক'রে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ভালোবাসা প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছে, এবং সেই সূত্রে ভরতের দেশ ব'লে ভারতবর্ষ তার পরিচয় পেয়েছে, এ-কবিবর্ণনা এ-যাবৎকাল এদেশে নন্দিত হ'য়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা সম্পর্কে লেখাই আমাদের সেই দিশা দেখাবার পক্ষে অমূল্য।

কিন্তু মাঝখানে এলো আমাদের অন্ধযুগ। আর তারপর হ'লো ইংরেজের আগমন।

সেই থেকে আমাদের সমাজ অতি দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। আমাদের সমাজে যেন ভূমিকম্প লেগে গেলো। প্রত্যেকটি স্তরে যেন শুরু হ'লো প্রচণ্ড সংঘাত। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেলো। তার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেলো একত্র বাস করার নৈতিক অনুশাসনগুলো। জীবনের কেন্দ্রে যে-সব ধর্মাচরণ ছিলো সে-সব ভেঙে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় যে-সব অবাধ অধিকার ছিলো উচ্চবর্ণের হাতে সে-সবও হারিয়ে গেলো। মেয়েদের এক-বিবাহের শাসন উড়ে গেলো। কী না-গেলো! এমন-কি ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত যে-শ্রেণীবিন্যাস ছিলো এখন তা-ও আমাদের চোখের সামনে কতো দ্রুত পরিবর্তিত হ'য়ে যাচ্ছে। এবং এই প্রত্যেকটা পরিবর্তনের মধ্যে যে কঠোর সংঘাত, যে কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে, সে-সমস্তেরই অনুভব আমাদের চেতনায় এসেছে। সুতরাং সেই স্বর্ণযুগের সংস্কৃত নাটকের মধ্যে আমাদের মন আর মুক্তি পাচ্ছে না। আমরা সংঘাত আর আলোড়ন দেখতে চাচ্ছি আমাদের নাটকে। অথচ এখনো মণিপুরী নাচ, বা রবীন্দ্রনাথের গান, বা ঐ-রকম কোনো স্থির শান্ত উদ্দাতভঙ্গী রসের প্রকাশ দেখলে আমরা মুগ্ধ ও আবিষ্ট না-হ'য়ে পারি না। আমাদের যে নাড়ীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সেই সুছন্দ শান্তির। আমরা যে জানি রুদ্রের দক্ষিণ হস্তেই বরাভয়। তাঁর একমুখে পালন একমুখে ধ্বংস। আমাদের ধর্ম তো য়ুরোপীয় 'religion' নয়। আমরা নিরীশ্বর ন্যায়শাস্ত্রের কথাও জানি, সাংখ্য জানি, বৌদ্ধ-ন্যায় জানি। নাড়ীর মধ্যে এইসব অনুভব নিয়েই তো আমরা ভারতীয়। কিন্তু আমরা সেতু-স্থাপন করতে পারছি না। আমাদের নিজে-দেরই সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে।

কেবল একজন নাট্যকার এই সংঘাতের মধ্যে থেকেও সেই স্বর্ণযুগের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নাটকে আমরা

আধুনিক সমাজের কাহিনী পাই, কিন্তু য়ুরোপীয় ভঙ্গীতে নয়। তাইতো বিদেশী নাট্যশাস্ত্রীদের এতো অসুবিধে হয় তাঁকে বুঝতে। তাইতো John Gassner কতো সহজে এক লাইনে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে পেরেছেন যে — Tagore proved to be a cross between Maeterlink and a Hindu Sage. (*Theatre in our times*)

অথচ আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের নাটক কী পরিমাণ অনুপ্রাণিত করে আমাদের, কী ভীষণ ভালো নাটক ব'লে মনে হয় সেগুলোকে। তাইতো অনেক সময়ে আমার মনে হয় যে আমাদের সংস্কৃতির যে গভীর রূপটি আছে — যেটি যেমন সরল তেমনি sophisticated -- রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমীর মতো -- সেটা সাহেবদের পক্ষে বোঝা যেন সহজ নয়। সাহেবদের শিষ্যদের পক্ষেও।

'রক্তকরবী' আধুনিক সমাজের যন্ত্রসভ্যতার কাহিনী। এই সভ্যতা নিজের মধ্যে যে-বিরোধের জন্ম দিচ্ছে সেই সংঘাতের প্রকাশ আছে এই নাটকে। 'মুক্তধারা'তেও এক আধুনিক কাহিনী। অথচ য়ুরোপীয় নাটকের রূপ নয় এদের। বাস্তবানুসৃত যে-চরিত্রাঙ্কনপদ্ধতি তা একেবারেই অবলম্বন করা হয়নি এই সমস্ত নাটকে। অথচ অভিনয় করলে বুঝতে পারি যে এর বহু চরিত্রের বহু জায়গাটাই ভীষণ বাস্তব। এর কৌশলটা কী?

একটা কৌশল হ'লো ভাষা। এই ভাষাটা বাজারচলিত ভাষা নয়। যেমন, ধরা যাক একটা জায়গা, — কিশোর বলে, 'একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতোবার মনে মনে ভাবি।'

এই ভাষা ব'লে অভিনয় করতে আমাদের বহু অভিনেতারই বিশেষ অসুবিধে হয়। মনে হয়, এটা অনুভব হয়তো কিশোর করতে পারে, কিন্তু সে-কথাটা এমন ক'রে বলতে পারে কি কেউ! অর্থাৎ অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ হিসেবে এটা ঠিক, কিন্তু উচ্চারিত সংলাপ হিসেবে ঠিক নয়। এভাবে কথা বলতে গেলে যেন ন্যাকা ন্যাকা শোনায়। -- এই চিন্তা মনের মধ্যে থাকে ব'লেই রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা বলতে আমাদের এতো কষ্ট হয়।

কেন যে আমাদের দৈনন্দিন ভাষা এতো পরুষ হয়েছে, কেন যে আমরা আমাদের অনুভবের কথা সহজভাবে উন্মুক্তভাবে বলতে পারি না, সে-আলোচনা এড়িয়ে আমরা বলতে পারি যে, কোনো উপায়ে যদি এই

uninhibited উন্মুক্তভাব প্রকাশ করতে পারি তাহ'লে কি সেটা কিশোরের অন্তরঙ্গ প্রকাশ হবে না ?

'চার অধ্যায়' অভিনয়কালেও আমরা দেখেছি যে প্রেমের মুহূর্তে ঐ-ধরনের কথা আমরা কেউ বলি না।— 'আলো কমে গিয়েছে, এস আরো কাছে এস। আমার চোখদুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোট তার আয়তন···।' কিংবা 'এই যা দেখছি এইটিই আশ্চর্য্য সত্য, এর মানে কী, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না, কোনো এক অদ্বিতীয় কবির হাতে ধরা দিতে পারলো না ব'লেই এর অব্যক্ত মাধুর্য্যের মধ্যে এতো গভীর বিষাদ।'

বলি না ঠিকই। কিন্তু আমাদের মনের গভীরে যে প্রেমের আবেগ আমরা অনুভব করি তার যদি কোনো ভাষা থাকতো তাহ'লে সে হয়তো এই ভাষা। যে-ভাষায় আমরা কথা কইতে পারি না, কিন্তু যেটা আমাদের অন্তরের আবেগের ভাষা, সেইটাই তো কবিতা। সেই ভাষা যিনি আমাদের শোনাতে পারেন তিনিই তো কবি।

তাই অভিনয়টাই এমনভাবে করা দরকার যাতে অন্তরের আবেগের কাব্য অবলীলায় প্রকাশ পায়। এবং সেটা কেবল naturalistic ভঙ্গীতেই চেষ্টা করলে আমরা পারবো না। চেষ্টা করতে হবে যে স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গেই যেন অন্তরের কথাগুলোও অতি সহজে অনর্গল হ'য়ে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এই দুটো স্তরে সঞ্চরণ খুব যেন সহজে হয়। বাইরের জীবন আর অন্তর্জীবন, দুটোই যেন গায়ে গায়ে মিশে অঙ্গাঙ্গিভাবে বর্তমান থাকে। ঠিক যেমন আগেকার দিনের নাটকে হ্যামলেটের পক্ষে স্বগতোক্তিতে চ'লে আসাটা একেবারে নির্বাধা ছিলো।

এই বোধ নিয়ে যদি আমরা রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়ের চেষ্টা করি তাহ'লে দেখবো যে আধা-রিয়ালিস্টিক ছাঁচে লেখা নাটকগুলো আমরা যেভাবে অভিনয় করি সেভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায় না।

আমাদের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে ছেলেদের যদি তিক্তভাবে রাগারাগি করার দৃশ্যে অভিনয় করতে দেওয়া হয় তাহ'লে তারা অতি সহজেই সে-অভিনয় ক'রে দিতে পারে। মেয়েরাও ঠিক সেইরকম। কলহের দৃশ্য হ'লে প্রায় কিছু দেখাতেই হয় না। (তাই বুঝি ট্রামেবাসে প্রাত্যহিক কলহের

মধ্যে আমাদের বঙ্গসংস্কৃতি অমন ক'রে প্রকাশ পায়।) কিন্তু যদি গভীর অনুভবের মধ্যে কথা বলতে হয়, যদি প্রেমের কথা সহজভাবে বলতে হয়, তাহ'লে ঐ-কলহপটুতার তিক্ত কণ্ঠস্বরে তো সেটা হবে না। যে ভালোবাসে তার কণ্ঠস্বরে মিষ্টত্ব লাগে, সুর লাগে, কাব্য আসে। অত্যন্ত চেনাজানা সাদাসিধে পাঁচীও যখন প্রেমে পড়ে তখন তার চোখে কটাক্ষ আসে, দেহের ভঙ্গিমায় কাব্য আসে। এইটাই তো প্রকৃতির কীর্তি। সেইজন্যেই তো প্রেমে-পড়া ছেলেমেয়ে যেন আহ্লাদে সর্বক্ষণ খুসী হ'য়ে থাকে; তাদের দেখলেও তখন অতো ভালো লাগে।

কিন্তু সেই কাব্যের প্রকাশ করতে গেলে ঝঙ্কার থাকা চাই। কবিতায় যেমন প্রত্যেকটি কথা কী একটা রসে টস্‌টস্ করে, যাতে সে নিজেকে ছাড়িয়ে আরো অনেক-কিছু যেন প্রকাশ করে, এ-কণ্ঠও সেইরকম রসাভিষিক্ত হওয়া চাই নাকি?

কিন্তু কথাটা কেবল প্রেমপ্রকাশের কথা নয়। 'রক্তকরবী'র কিশোর কেবল প্রেমপ্রকাশ করছে না। কথাটা হ'লো আদ্যোপান্ত মানুষটাকে প্রকাশ করার। কিশোরের অন্তরটাকে অন্তরঙ্গভাবে প্রকাশ করার। তাই আমাদের সেই কণ্ঠের দরকার হয়, সেই ভঙ্গীর দরকার হয়, যাতে আমরা অত্যন্ত সহজভাবে আমাদের মনের অনুভব প্রকাশ করতে পারি। এবং সেই চেষ্টা করলে আমরা দেখতে পাবো যে চরিত্রের কতোখানি বলিষ্ঠতা থাকলে তবে মানুষ এতো সহজে নিজেকে অনর্গলিতভাবে প্রকাশ করতে পারে। তখন বুঝতে পারবো যে, এটা ন্যাকা-র কার্য নয়। এই সরলতা হ'লো গভীর sophistication-এর ফলস্বরূপ।

এটা খালি কিশোরের কথা নয়, প্রেমের কথাও নয়। এটা হ'লো আমাদের নাট্যাভিনয়ে আমরা কেমন ক'রে চরিত্রগুলোর বহির্জীবন আর অন্তর্জীবন একই সঙ্গে প্রকাশ করতে পারি সেইটে বোঝবার একটা প্রয়াস। আমাদের নাট্যপ্রচেষ্টার একটা নিজস্ব পথ খুঁজে পাওয়ার কথা, আমাদের একটা নিজস্ব পরিচয় লাভ করার কথা। এবং সে-চেষ্টা যদি এখুনি সাহেবগ্রাহ্য না-হয় তাতেও কিছু না-এসে যাওয়ার কথা।

আমাদের দেশের ভালো নাটক বলতে প্রথমেই নাম করতে হবে রবীন্দ্রনাথের। এবং সে-নাটক বাহ্যিক অ্যাকশনের ওপর নির্ভরশীল নয়।

যদি আমরা একটু মনোযোগের সঙ্গে পড়ি তাহ'লে দেখবো 'রক্তকরবী'তে মেজ সর্দারের ঐ অত্যল্প ভূমিকার মধ্যেও কী স্পষ্টভাবে একটা মানুষ প্রকাশ পেয়েছে। কেন যে সে-মানুষটা নাচওয়ালী আর বাজনদারদের রওনা ক'রে দিতে বেশী আগ্রহী, কীভাবে যে সে নিজের সম্বন্ধে বলে — 'রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাকবে না। এখনো সে আশা আছে', এ-সব যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এইরকম একটা নতুনধরনের চরিত্র এতো স্বল্প জায়গার মধ্যে প্রকাশকরারর আর-কোনো উদাহরণ আমার জানা নেই। তেমনি 'মুক্তধারা'র প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো চরিত্র, তেমনি 'রাজা'র। সবাই অত্যন্ত বাস্তব।

এই প্রকাশপদ্ধতিকে আত্মসাৎ ক'রে যদি আমরা আমাদের যুগকে প্রকাশ করতে পারি তবেই আমরা আমাদের বিশিষ্ট পরিচয় খুঁজে পাবো। এবং তার ওপরেই আমাদের আত্মসম্মান থাকবে। সে-কাজ কেবল রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়েই হবে না। কারণ তিনি তো আমাদের পথের শেষ নন, তিনি আমাদের পথের পাথেয়। আমাদের মহার্ঘ দিশারী।

এবং এর জন্যে আমাদের বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন। কারণ আমরা এখনো কেউ জানি না যে আমাদের নাট্যাভিনয়ের সেই বিশিষ্ট ভারতীয় রূপটি ক্রমশ কী হবে।

১৩৭২

আজকের বাঙলা নাটকের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ

নাটকের আলোচনায় এ-কথা বারবার উল্লেখ হয়েছে যে অভিনয় ব্যতিরেকে নাটকের সম্পূর্ণ রূপটা স্পষ্ট হ'য়ে প্রকাশ পায় না। অতএব মঞ্চ-উপস্থাপনার চিন্তা বাদ দিয়ে নাটকের আলোচনা সঙ্কীর্ণ ও ভ্রমাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। তাই নাট্যকার, অভিনয়শিল্পী ও নির্দেশক ইত্যাদি সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় যে-নাট্যসৃষ্টি সম্ভব হয় সেই নাট্যকে স্মরণ রেখেই যদি আমরা আলোচনায় অগ্রসর হই তাহ'লে হয়তো আজকের নাটকের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো-এক ধারণায় পৌঁছুনো আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

আজ কিছু বৎসর থেকে আমাদের দেশে নতুন নাটকসৃষ্টির কাজ শুরু হয়েছে এবং প্রসার পেয়েছে। ব্যবসায়িক মঞ্চের বাইরে এই যে-নাট্য-প্রচেষ্টা, এর শুরু হয়েছে আজ থেকে তেইশ-চব্বিশ বছর আগে। ইংরেজ শাসনের আমলে। শ্রী বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটকের উপস্থাপনার সঙ্গেই এই নতুন নাট্যসৃষ্টির প্রথম প্রকাশ, এবং সেই থেকেই এই নতুন যুগের শুরু। তেইশ-চব্বিশ বছর ধ'রে যে-সৃষ্টির ধারা চলেছে তাকে আর কেবল নতুন আখ্যা দিয়ে পিঠচাপড়ানো চলে না, বা অবহেলা করাও চলে না। আজ নাট্যশিল্পের নানান্ ক্ষেত্রে যাঁরা যশস্বী তাঁদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোকই এই নতুন সৃষ্টিধারার সঙ্গে যুক্ত আছেন। বা কোনো-না-কোনো সময়ে যুক্ত ছিলেন। তাই আজ একটা হিসেব নিকেশ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই এসেছে।

নাট্যের সমস্যা দ্বিবিধ। এক হ'লো শিল্পতাত্ত্বিক, আর হ'লো অর্থনৈতিক। আমাদের দেশে প্রায়শই এ-কথা বলা হ'য়ে থাকে যে, আমাদের নাট্যসাহিত্য দুর্বল। যদিও কিছু কিছু নাট্যকর্মী বা নাট্যস্রষ্টা এর প্রতিবাদে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে আমাদের নাট্যসাহিত্য যথেষ্ট সবল, তবু সাধারণভাবে এ-কথা স্বীকৃত নয়। এই তর্কের মধ্যে যদি আমাদের নাট্যসাহিত্যের মান বিচার করতে হয়, তাহ'লে দেখতে হবে যে আমাদের আধুনিক নাট্যশিল্পীরা, — যাঁরা গভীরভাবে নাটকের ক্ষেত্রে নিযুক্ত, — তাঁরা অতীতকালের কোন্

কোন্ নাটকে উৎসাহী, কোন্ কোন্ নাটককে তাঁরা আধুনিককালে অভিনয়োপ-যোগী ব'লে মনে করেছেন। দেখা যাবে, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ অতীতের খ্যাতনামা নাট্যকারদেরও তাঁরা পাশ কাটিয়ে চলেন। কেন? অথচ ইংলণ্ডে নাটমঞ্চ প্রত্যেকযুগে শেক্সপীয়রকে সমসাময়িককালের আলোতে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছে। জর্মানীতে গ্যয়টে ও শীলারকে আশ্রয় ক'রে সেই আত্মবিকাশ ঘটেছে। স্কান্দিনেভীয় দেশে স্ট্রিণ্ডবার্গ ও ইবসেনকে নিয়ে ঘটেছে। কিন্তু আমাদের দেশে কোন্ নাটক ক্লাসিকের সেই সম্মান পেয়েছে, যার কাছে যুগে যুগে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে? একমাত্র রবীন্দ্রনাথ সেই সম্মান পেয়েছেন। আজও আধুনিক নাট্যশিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের নাটকে ক্লাসিকের সেই চিরনূতন আস্বাদ পায়। আজও তাঁর নাটককে নতুন নতুন ভাবে করবার আগ্রহ জাগে। অথচ রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর নাটকগুলো লিখছিলেন, আমাদের নাটমঞ্চ তখন তাঁকে আত্মভুক্ত করতে পারেনি। কয়েকটা নাটকের অভিনয় হয়েছিলো বটে, কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট নাটকগুলোকে আমাদের নাটমঞ্চ গ্রহণ করতে পারেনি। এটা কোনো দোষারোপের কথা নয়। ঐতিহাসিক কারণেই এই বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিলো। তখন আমাদের মঞ্চে বাস্তববাদী নাটকের যুগ এসেছে। এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটক অবাস্তব, কাব্যময় ও নাট্যগুণ-বিবর্জিত ব'লে বোধ হয়েছিলো। তাতেও কিছু এসে যেতো না, যদি অন্যধরনের নাট্যকাররা এমন-কিছু সৃষ্টি করতেন যাতে আজও আধুনিক মন তাতে উৎসাহী হ'তো। কিন্তু তা হয়নি।

কেন যে তা হয়নি তার কারণ নিশ্চয়ই বহুবিধ। তবু একটা কথা খুব বেশী ক'রেই মনে আসে। সেটা হ'লো নাটকের রূপ। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ শিল্প তার দেশের মূল থেকে উদ্ভূত হয়। দেশের অনুভবের যে গভীর অবচেতন স্তর সেইখান থেকে শিল্পের রূপ নির্ধারিত হয়। তাইতো প্রাচীন ভারতবর্ষের নানান্ দূরবর্তী অংশেও তক্ষণশিল্পে একই শৈলী অনুসৃত হ'তে দেখি। বাস্তবকে প্রকাশ করার এই যে stylization এটা চৈনিক নয়, নিগ্রোীয় নয়, আবার গ্রীসীয়ও নয়। এটা বিশিষ্টভাবেই ভারতীয়। ভারতীয় মানসের গভীর স্তর থেকেই এর উদ্ভব। জনমানসের এই গভীর অনুভবই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিকে তার নিজের বিশিষ্টরূপে মণ্ডিত করে।

সেইরকম য়ুরোপে যে বাস্তববাদী যুগ এসেছিলো, সেটা এসেছিলো

বিজ্ঞানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে। শুধু নতুন নাটক নয়, গল্প লেখার নতুন ধারা এলো, নতুন ছবি আঁকার পদ্ধতি এলো। তাই নতুন নাট্যশৈলীও এলো, যার তাগিদে নতুন নাটমঞ্চ তৈরী হ'লো, দৃশ্যসজ্জার নতুন পদ্ধতি এলো, নতুন অভিনয়প্রণালী এলো। এ-সবই হয়েছিলো আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের দেশের নাট্যকলা বাস্তববাদী হয়েছিলো য়ুরোপের দেখে। দেশে বিজ্ঞানের প্রভাবে এই রূপ গ'ড়ে ওঠেনি। তাই পাশ্চাত্যের নাট্যকাররা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যেমন ক'রে সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন, মানুষকে বিশ্লেষণ করেছেন, সে বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের নাটকে ছিলো না। এবং বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণচক্ষু অনুসন্ধিৎসা যদি না-থাকে, তাহ'লে তার স্থান অধিকার করে আবেগ। এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সে-আবেগ পর্যবসিত হয়েছে শুধুমাত্র সেন্টিমেন্টাল উচ্ছ্বাসে।

বিপরীত দিকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীতে এক যুক্তিভিত্তিক অনুসন্ধিৎসা ছিলো। তিনি বাস্তব পৃথিবীকে শুধু মন দিয়ে জানতে চাননি, প্রাণ দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। তাই সমাজ সম্পর্কে ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর কিছু অরিজিন্যাল বক্তব্য ছিলো। এবং সেই বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন এমন এক নাট্যরূপে যা বাস্তববাদীদের চোখে অবাস্তব লাগে। তাই য়ুরোপের লোক যেমন তাঁর নাটক বুঝতে পারেনি, তেমনি য়ুরোপের নাট্যদীক্ষায় দীক্ষিত ভাবতীয়ও তাঁর নাটক অবহেলা করেছে। অথচ সেই নাট্যরূপ আমাদের দেশজ নাট্যসংস্কৃতিরই রূপ, সেটা বিদেশ থেকে আমদানি করা নয়।

তারপর পাশ্চাত্যেও বাস্তববাদী নাট্যের প্রভাব ক্ষুন্ন হ'তে থাকলো এবং নানাধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হ'লো। সেই নতুন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের নাটকীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করলাম।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাদেশের নাট্যকর্মীদের মধ্যে এই চিন্তা প্রবল হ'লো যে, — তাহ'লে আমাদের নিজস্ব নাট্য-রূপটি কী? তাকে আমরা কোন্ পথে উপলব্ধি করবো?

তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। এবং নবলব্ধ স্বাধীনতার মধ্যে মানুষের প্রয়োজন পড়ে নিজেকে বোঝবার, নিজের সত্য পরিচয়টা খুঁজে পাবার। তাই আমাদের নাট্যকর্মীদের মনে এই প্রশ্ন জাগলো যে, আমাদের দেশের নাট্য কোন্ বিশিষ্ট রূপে জগৎসভায় নিজের পরিচয় প্রকাশ করবে? আমরা

কি পাশ্চাত্য নাটমঞ্চের অক্ষম অনুকরণ করতে করতে যাবো, নাকি নিজেদের কোনো বিশিষ্ট নাট্যচিন্তা প্রকাশ করতে পারবো।

এটা কেবল বাইরেকে দেখানোর জন্যে নয়, কেবল জগৎসভায় নিজেকে অন্যরকম ব'লে চালিয়ে দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেও নয়। এটা নিজের ঘরে নিজে আত্মস্থ হবার কথা। নইলে আমাদের নাটককে গভীর অনুভবের বাহন ক'রে তুলতে পারবো না আমরা।

জাপানে আছে বহুশতাব্দীর পুরানো নাট্যরূপ। তাদের আছে নো, তাদের আছে কাবুকি, তাদের আছে কিয়োগেন। তবু জাপান এক সময়ে নিজের দেশজ নাট্যরূপ পরিত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণ বিদেশী ছাঁচে বিদেশী ও দেশী নাটক অভিনয় করতে আরম্ভ করে। কিন্তু আজও সেই বিদেশী ছাঁচের কোনো নাট্যসৃষ্টি জগতে সম্মান লাভ করতে পারেনি। অথচ তাদের নো বা কাবুকি দেখে মানুষ উচ্ছ্বসিত হয়। তাই আজ সেখানে চেষ্টা চলেছে যে এই দুয়ের সমন্বয় কোন্ পথে হ'তে পারে, কোন্ পথে প্রাচীন দেশজ নাট্যরূপকে আশ্রয় ক'রে আধুনিক নিপ্পনী মন প্রকাশ পেতে পারে।

সেই সমস্যা আমাদেরও। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে আমাদের অন্তরের তৃপ্তি পাই না। নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত মুদ্রা আজ আমাদের কাছে কোনো অর্থ বহন করে না। অথচ সেই সংস্কৃতযুগ থেকে আজ পর্যন্ত নানান্ লোকনাট্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের নাট্যচিন্তার যে-ধারা প্রবহমান তার গভীর অনুভব আমাদের প্রাণ দিয়ে বুঝতে হবে, নইলে আমাদের দেশের নাটমঞ্চ দেশীয় নাটমঞ্চ হবে না।

এই কথা আজ আরো বেশী ক'রে বলবার দরকার এই জন্যে যে স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে অনুকারী প্রবৃত্তি কমার পরিবর্তে হয়তো বেড়েছে। তাই পশ্চিমের আধুনিক ফ্যাশন অনুকরণে নাটক করাটাই আমরা অনেক সময়ে প্রগতির চরম লক্ষণ ব'লে মনে করি। কিন্তু তদ্দ্বারা তো আমাদের চিন্তা বুদ্ধিভিত্তিক হয় না, আমাদের দৃষ্টিও বিজ্ঞানসম্মত হয় না। তাই একালে যেমন আমরা সেন্টিমেন্টাল দেশাত্মবোধের নাটক করেছি, যেখানে প্রবল বক্তৃতার পরে বন্দেমাতরম্ ব'লে চীৎকার করামাত্র দর্শকবর্গ শিহরিত হ'য়ে হাততালি দিয়ে উঠেছে, তেমনি আজ সেন্টিমেন্টাল সাম্য-বাদের নাটক করি, যেখানে ঠিক সেই একইধরনে ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

ব'লে হাততালি সংগ্রহ করা হয়। কিংবা অ্যাবসার্ডিস্টদের অনুকরণে নাটক করি।

কিন্তু শিল্প তো নিছক প্রমোদের, বা আপ্তবাক্যের আফিম হিসেবে ব্যবহৃত হবার নয়। শিল্প মানুষের বোধের একটা হাতিয়ার। বিজ্ঞান যেমন পৃথিবীকে বোঝবার অস্ত্র, শিল্পও তেমনি মানুষকে বোঝবার, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বোঝবার একটা অস্ত্র। চারিদিকের নানারকম সস্তা তামাশার মধ্যে সেই গভীর নাট্যোপলব্ধির দেশজ রূপটা গ'ড়ে তোলার সমস্যা আমাদের প্রধানতম শিল্পগত সমস্যা।

এই সমস্যা সমাধানের জন্যে যে-পরীক্ষা ও -নিরীক্ষার প্রযোজন তার সুযোগ এবং সুবিধা কোথায়? এই প্রশ্ন হ'লো নাটকের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রশ্ন। বাগানে ফুল ফোটাতে গেলে মাটি চালতে হয়, তাতে সার দিতে হয়, আগাছা তুলে ফেলতে হয়, ও ভালো চারাগুলোকে বাঁচাতে হয়। নইলে একখণ্ড জমির সামনে দাঁড়িয়ে আমি যতোই কেন না বক্তৃতা দিই সে-জমি বাগানে পরিণত হবে না, এবং ফুলও ফুটবে না। অবশ্য কলাশিল্প যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হবে তখন যে সে কী রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে তা আমরা কেউ জানি না। আমরা শুধু জমিটা পরিষ্কার রাখতে পারি, যাতে আগাছার চাপে ভালো বীজ নষ্ট না-হ'য়ে যায়। যাতে ফুল আপনরূপে ফুটে ওঠবার অবকাশ পায়। কিন্তু ততোটুকু সহায়তা আমাদের সমাজ দেয় কি? এখানে খুব স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার যে আমাদের দেশের সাধারণ লোক সে-সাহায্য করেন। তাঁরা যদি আগ্রহভরে দেখতে না-যেতেন তাহ'লে ব্যবসায়িক মঞ্চের বাইরে নাট্যসংস্কৃতির এই ধারা গত চব্বিশ বছর ধ'রে বাঙলাদেশে বেঁচে থাকতে পারতো না। চব্বিশ বছর বড়ো কম সময় নয়। এই সময়ের মধ্যে বাঙলা তথা ভারতের গৌরব করার মতো নাট্যসৃষ্টি অবৈতনিক সম্প্রদায়ের দ্বারাই হয়েছে। এবং আজও তারা অবৈতনিক, আজও তাদের কোনো মঞ্চ নেই।

অবস্থাটা আমাদের সকলেরই একটু স্পষ্ট ক'রে বোঝা দরকার। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি যে এক এক বছরে সাধারণ দর্শক এই-রকম নতুন নাটক দেখতে লক্ষাধিক টাকা দিয়ে থাকে। কিন্তু মঞ্চভাড়া বিজ্ঞাপন ও আনুষঙ্গিক সাধারণ খরচ মিটিয়ে এইসমস্ত অবৈতনিক সম্প্রদায়ের

হাতে যে-টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তা অতি সামান্য। তার থেকে বেতন দেওয়া তো দূরের কথা, অনেক প্রয়োজনীয় খরচও কুলিয়ে ওঠা যায় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্যবসায়িক মঞ্চগুলো চালায় কী ক'রে? ব্যবসায়িক মঞ্চ সপ্তাহে সবচেয়ে ভালো তিনটি দিনে অভিনয় করে। যে-দিনগুলোতে সাধারণভাবে মানুষের অবসর থাকে ব'লে বিক্রী বেশী হয়। তাছাড়া ছুটির দিনগুলোতেও তারা অভিনয় ক'রে থাকে। কিন্তু কোনো অবৈতনিক সম্প্রদায় সেই মঞ্চ ভাড়া করতে গেলে তাকে অভিনয় করতে হয় অন্য দিনগুলির মধ্যে, যে-দিনগুলোয় অফিসকাছারী বা দোকানপাট খোলা। ফলে, বিক্রী আপনা থেকেই কম হ'তে বাধ্য। তবু সেইসমস্ত দিনগুলোর ভাড়া এতো উচ্চহারে বাঁধা যে, তার দ্বারাই সেই ব্যবসায়িক মঞ্চের সারামাসের ভাড়া উঠে গিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে। তার উপর চায়ের দোকান ইত্যাদির কাছ থেকে ভাড়া বা সেলামি বাবদ যে-অর্থাগম হয় তাতে সারা মাসের অনেক খরচা উঠে যায়। তারও উপর সপ্তাহে অন্তত চারটি অভিনয়ের জন্যে তারা কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় সপ্তাহে ছ-দিন। আর অবৈতনিক সম্প্রদায়কে একটি অভিনয়ের জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে হয় অন্তত চারদিন। ফলে, ঢাক পিটানোর জন্য নয়, কেবল লোককে জানানোর জন্যেই বিজ্ঞাপনের খরচ পড়ে অনেক বেশী গুণ। এরও উপরে আছে কর্পোরেশনের খাজনার তারতম্য, জিনিস-পত্র নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়ার খরচা, ইত্যাদি অনেক টুকিটাকি।

একটা কথা এখানে বলা দরকার যে ব্যবসায়িক মঞ্চ সম্পর্কে তথ্য উদ্ঘাটন করা এ-নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাদের সম্পর্কে কোনো ক্রোধ বা অসূয়াবশত এইসব কথা বলা হচ্ছে না। কেবল অবস্থাটা বোঝার জন্যেই এই বর্ণনা। এবং এই বর্ণনায় এইটুকু অন্তত বোঝা গেছে যে নতুন নাট্যসংস্কৃতিচর্চার যদি কোনো প্রেক্ষাগৃহ থাকতো তাহ'লে এই বিসদৃশ অবস্থার উদ্ভব হ'তো না। বিসদৃশ এইজন্য বলছি যে পৃথিবীতে আর-কোথাও এতো লড়াই করতে হয়নি। মস্কো আর্ট থিয়েটারকে বাঁচাবার জন্যে কিছু ধনী ব্যবসাদার এগিয়ে এসেছিলেন। ব্যবসায়িক মঞ্চের বাইরে একটা সম্মানীয় নাট্যসংস্থা গড়ার জন্যে Stratford-এ Shakespeare Memorial Theatre প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। আজ সেটা রানীর প্রসাদে Royal Shakespeare Company। তাছাড়া সরকারী আনুকূল্যে সেখানে জাতীয় থিয়েটার

স্থাপিত হয়েছে। পূর্ব জর্মানীতে ব্রেখ্‌ট্‌কে একটা থিয়েটার দেওয়া হয়েছিলো, পশ্চিম বার্লিনে পিসকাটর-কে। আমেরিকায় শ্রেষ্ঠীর দানে Lincoln Centre স্থাপিত হয়েছে। জাপানে জাতীয় থিয়েটার। ফ্রান্সেও এ-ঘটনা ঘটেছে কতোদিন আগে। প্রত্যেক দেশেই সুস্থ থিয়েটারকে বাঁচাবার জন্যে হয় সরকারী ব্যবস্থা আছে, নয় বেসরকারী উদ্যোগ আছে এক আমাদের দেশে ছাড়া।

আশা ছিলো যে সুস্থ সংস্কৃতি-সম্পন্ন নাট্যচর্চার কাজ যদি দেশে চলতে থাকে তাহ'লে দেশের লোক নিজের থেকে এগিয়ে এসে এই শিল্পকর্মের প্রচেষ্টাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন ক'রে দেবে। কারণ দেশের সংস্কৃতির ভালোমন্দের দায়িত্ব তো কেবল শিল্পীর নয়। আজ কোনো শিল্পী যদি নাট্যের মধ্যে স্থূলতা আমদানি করে তাহ'লে তো আমরা কাগজে পত্রে সভায়-সঙ্গতে তাকে ধিক্কার দিয়ে থাকি। এবং সেটা কিছু অন্যায় করি না। কারণ দায়িত্বটা আমাদের সকলের। কিন্তু দায়িত্ব তো কেবল উপদেশ আর ধিক্কার দেবার হ'তে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে বাঁচাবার দায়িত্বও থাকে, সে-দায়িত্ব সমাজগতভাবে আমরা পালন করিনি।

আবার এ-কথা ঘোষণা করা দরকার যে সাধারণ লোক তার দায়িত্ব পালন করেছে। একমাত্র 'রক্তকরবী' দেখার জন্যে সাধারণ দর্শক যতো অর্থ দিয়েছেন তাতে যদি এইরকম অস্বাভাবিক পাওনা শোধ করতে না-হ'তো তাহ'লে সেই টাকাতে 'বহুরূপী' রবীন্দ্রনাথের নামে একটি আধুনিক মঞ্চ তৈরী ক'রে দিতে পারতো। অর্থাৎ সাধারণ যা করবার তা করেছে, কিন্তু সমাজের নেতারা করেননি। আমাদের সমাজের নেতারা — তা সে তাঁরা সরকারেই থাকুন বা সরকারের বিপক্ষেই থাকুন — এখনো পর্যন্ত দেশে সৎ ও সুস্থ নাট্যশিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্যে কোনো আগ্রহ দেখাননি। নইলে মাত্র বিশজন ধনী ব্যক্তি যদি পঞ্চাশ হাজার ক'রে টাকা দিতেন তাহ'লে এইরকম একটি প্রেক্ষাগৃহ তৈরী হ'তে পারতো। এবং সেটা কারোর ব্যক্তিবিশেষের মুনাফার জন্যে না-হ'য়ে ট্রাস্টি মারফৎ দেশকে দান ক'রে দেওয়া যেতো।

এই বিশ-চব্বিশ বছরের মধ্যে কিছু ছিটগ্রস্ত লোক নিজেদের বাতির দু-পাশ জ্বালিয়ে এই কাজ ক'রে গেছে। এতোদিনের মধ্যে তাদের

একটা ক্ষেত্র ক'রে দেওয়া যেতে পারতো যেখানে তারা একটু স্বচ্ছন্দে নিজেদের কাজ ক'রে যেতে পারে, যেখানে আরো নতুন নতুন পরীক্ষা চলতে পারে, যেখানে নাট্যসাধনার একটা পীঠ গ'ড়ে উঠতে পারে। সাধারণ লোক তা চেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তো নিতান্তই সাধারণ লোক। তাঁদের হাতে তো বিপুল অর্থও নেই ক্ষমতাও নেই। কিন্তু যাঁদের হাতে অর্থ আছে, বা যাঁদের হাতে ক্ষমতা আছে তাঁরা কেউ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেননি।

অথচ শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ী এমনিই একটা মঞ্চের কল্পনায় সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মূর্তি স্থাপন করার কথা হয়, অথচ সেই নাট্যপীঠটা হয় না। এ এক অদ্ভুত ভণ্ডামি আমাদের।

এই কথাগুলো আজ আরো বেশী ক'রে ভাববার দরকার পড়েছে আমাদের। আমাদের সকলের। কারণ এই অবস্থা যদি আর বেশী দিন চলে তাহ'লে দেখতে পাওয়া যাবে যে বহু নতুন নতুন নাট্যকর্মী এই ব্যর্থতায় দিশাহারা হ'য়ে সহজ সার্থকতার পিছল প'থে চ'লে গিয়েছেন। অর্থাৎ চব্বিশ বছরের এই চেষ্টা, গভীর নাট্যসৃষ্টির এই অনুপ্রেরণা কেবলমাত্র প্রমোদ বিতরণের বস্তু হবে, আর নয়তো রাজনৈতিক দলা-দলিতে কুৎসা প্রচারের অস্ত্র হবে।

সেই অপমৃত্যুর দায়িত্ব যদি আমরা বহন করতে না-চাই তাহ'লে আমাদের সকলের চিন্তা করা প্রয়োজন যে কী উপায়ে সুস্থ নাট্যপ্রয়াসকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি। কারণ সেইটেই যদি না-পারি তাহ'লে নাটকের ক্ষেত্রে শিল্পগত যে সমস্ত গভীর সমস্যা আছে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা হবে কোথা থেকে? ভারতবর্ষের নিজস্ব যে-নাট্যভাষা সেটা তাহ'লে কী ক'রে প্রকাশ পাবে?

১৯৬৭

ন্যাশনাল থিয়েটার

'ন্যাশনাল থিয়েটার' কথাটা আমি প্রথম শুনি শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মুখে। তার পূর্বে হয়তো এক-আধ জায়গায় প'ড়ে থাকতে পারি ইংরেজিতে, কিন্তু সে-সম্পর্কে কোনো সম্যক্ বোধ হয়নি। মনে হয়েছিলো ওটা একটা বিলিতি ব্যাপার! কিন্তু শ্রী শিশিরকুমারের মুখে যখন শুনলাম তখন কথাটা একটা রূপ পেলো প্রথম।

তাঁর মুখেই শুনেছি যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে একটা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ক'রে দেবেন বলেছিলেন দার্জিলিং যাবার আগে। কিন্তু দার্জিলিং-এ দেশবন্ধু মারা যান এবং আজও পর্যন্ত বাঙলাদেশ তার জাতীয় রঙ্গমঞ্চ তৈরী করতে পারেনি। অথচ চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো ছোট্টো একটা দেশ পরাধীন অবস্থাতেই একটা জাতীয় নাট্যমন্দির তৈরী করেছিলো সাধারণের চাঁদায়।

আমাদেরই দেশে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষ্য ক'রে অনেকগুলো নাট্যগৃহ তৈরী হ'লো সরকারী অর্থে। তার বেশীরভাগই ত্রুটিপূর্ণ। যে-সমস্ত সরকারী দপ্তর থেকে এই নাট্যগৃহগুলো নির্মিত হয়েছে তাঁরা স্থানীয় মঞ্চপ্রচেষ্টার কোনো সংবাদ রাখেন ব'লে মনে হয়নি। যাই হোক্, তবু কলকাতায় আমরা শুনেছিলাম এবং এখনও শুনি যে এই রবীন্দ্রসদনটি জাতীয় নাট্যশালারূপে পরিণত হবে।

গোড়াতেই বোঝা দরকার যে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' মাত্র একটি নাটমঞ্চ কিনা। আশা করি, বেশীরভাগ লোকই বিশ্বাস করেন যে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' কেবলমাত্র থিয়েটার-হাউস নয়, বরঞ্চ এমন একটা নাট্যশালা যেখানে উৎকৃষ্ট নাট্যাভিনয়ের সুযোগ আছে।

এইখানে একটা কথা ব'লে নেওয়া দরকার। দিল্লীতেও অনেক লোকের ইচ্ছে যে একটা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' তৈরী হোক্, এবং তার জন্যে একসময়ে সরকারী দপ্তর থেকে কিছুটা উদ্যোগও হয়েছিলো। যদিও এখনও সেটা হয়নি, তবু যে-কোনোদিন সেটা কেন্দ্রীয় আনুকূল্যে তৈরী হ'য়ে যেতে পারে। এবং

তৈরী হ'তে আরম্ভ করলেই কিন্তু তারই নাম হবে ভারতবর্ষের 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। তখন কলকাতার রবীন্দ্রসদন কি বাঙলা ন্যাশনাল থিয়েটার হবে? অর্থাৎ বাঙালী কি তখন আলাদা জাতি হবে? যেমন রাজনৈতিক স্লোগানে মুসলমান পৃথক্ জাতি ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছিলো?

দিল্লীতে বহু লোক ভাবেন যে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' তো দেশে মাত্র একটাই হ'তে পারে, যেমন ইংলণ্ডে আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইংলণ্ডের চেয়ে আয়তনে বড়ো এবং য়ুরোপ যদি একটা ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হ'তো তাহ'লে যেমন তার একটিমাত্র ন্যাশনাল থিয়েটার হ'তে পারতো না, তেমনি ভারতেও কেবলমাত্র দিল্লীতে একটা নাট্যশালা নির্মাণ ক'রে তাকে ন্যাশনাল নাম দিলেই বোধহয় সেটা সত্যিই ন্যাশনাল হ'যে উঠতে পারবে না। কিন্তু আমরা যতোদিন কলকাতায় তুচ্ছ কোঁদলে ব্যাপৃত থাকবো তার মধ্যে যে-কোনো সময়ে দিল্লীতে 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র কাজ শুরু হ'য়ে যেতে পারে। তখন আমরা ঠেকাবো কী ক'রে? যেমন অস্বাভাবিক ব্যয়ে অকর্মণ্য রবীন্দ্রনাট্যগৃহগুলোর নির্মাণও আমরা ঠেকাতে পারিনি। একবার একটা ঘটনা হ'য়ে গেলে তখন আর তো সেটাকে ওড়ানো যায় না, বরঞ্চ চেষ্টা করতে হয় মানিয়ে নেবার। এবং সে মানিয়ে নেওয়ায় তো সৌজন্য থাকে না, ফলে সহাবস্থানের সঙ্গে চিরকালীন একটা খেয়োখেয়িও চলে। আধুনিককালের আদর্শ দাম্পত্যজীবনের মতো আর কি।

উদাহরণস্বরূপ আরো বলা যায় যে, দিল্লীতে একটা জাতীয় নাট্যশিক্ষণালয় আছে। তার নাম 'ন্যাশনাল স্কুল অফ্ ড্রামা'। বছরে কয়েক লাখ টাকা খরচ হয়। অথচ সেখানে অভিনয় শেখানো হয় হিন্দীতে, যদিও আমাদের সংবিধানে অনেকগুলি ভাষাকেই স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ অভিনয়-শিক্ষার বিদ্যালয় প্রত্যেক ভাষায় আলাদা আলাদা হওয়া উচিত, কারণ নিজের মাতৃভাষায় ছাড়া অভিনয়ের সূক্ষ্মতা বোঝা বা প্রকাশ করার অভ্যাস শুরুই হ'তে পারে না। এবং নাট্যসৃষ্টির দিক থেকেও দিল্লী, মারাঠী বা বাঙলার তুলনায়, কিছু-একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবী করতে পারে না। তবু সেখানে ন্যাশনাল ইস্কুল স্থাপিত হ'য়ে গেছে, এবং প্রচুর ব্যয়ে সেটা চালানোও হচ্ছে। যদিও তার দ্বারা, অন্তত বাঙলা নাট্যপ্রচেষ্টা, এতোটুকুও সহায়তা পেয়েছে ব'লে আমরা জানি না। অথচ প্রয়োজন ছিলো কলকাতায়

একটা ঐ-ধরনের অভিনয়শিক্ষণালয় প্রতিষ্ঠা করার যাতে আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় সম্পর্কে এখানকার শিশিক্ষুরা হাতেকলমে কিছু শিখতে পারে। তাতে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বাঙলা নাট্যপ্রযোজনার মান উন্নত হ'তো। কিন্তু এখানে যখন আমরা কলহ করি, তখন অন্য জায়গার লোক ব'সে থাকে না, তারা কিছু-একটা শুরু ক'রে দেয়। কিন্তু আমরা কোঁদলে এতো ব্যাপৃত থাকি যে এ-সব আমাদের চোখেও পড়ে না। তারপর 'কেউ আমাদের দেখতে পারে না' ব'লে নাকি-কান্নার অবকাশ তো রইলই।

যাই হোক্, উপরের উল্লেখগুলোতে একটা জিনিস স্পষ্ট হয় যে 'ন্যাশনাল' একটা নাম মাত্র, ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে এর অর্থ বিভিন্ন। তেমনি, আমরা যখন 'ন্যাশনাল থিয়েটার' বলি তখন অনেকক্ষেত্রেই এর ব্যবহার ধোঁয়াটে এবং বিচারহীন। কী হ'লে একটা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল হয় এবং সেই ন্যাশনাল থিয়েটারটা কীধরনের থিয়েটার, এটা আমাদের বিচার করা উচিত।

সরকারী উদ্যোগে যা করা হয় সেটাই কি ন্যাশনাল? তাহ'লে সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান করায় শিশিরকুমারকে অতো প্রশংসা করা হয়েছিলো কেন? সে-খেতাবও তো তা হ'লে জাতীয় খেতাবই ছিলো? এবং শিশিরকুমারের পরে অন্য অনেকেও সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছে। অর্থাৎ বোঝা যায় যে পদ্মশ্রী বা পদ্মভূষণ ইত্যাদি খেতাব যদিও সরকারী উদ্যোগে দেওয়া হয়, তবু অনেকে সেটাকে জাতিপ্রদত্ত সম্মান ব'লে মনে করেন না।

১৯০৮ সালে বিলেতে লাইসিয়ম নাট্যশালার সামনে এক জনসমাবেশ হয়েছিলো এই দাবীতে যে শেক্সপীয়রের স্মৃতিতে একটা ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হোক্। সেই দাবীর সমাবেশে বর্নার্ড শ'-ও যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি লক্ষপতিদের কাছে টাকা চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির কিছু অংশ আজও উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি লিখেছিলেন —

"...the newspaper reports of civil and criminal trials, especially those dealing with divorce, murder and suicide, prove that the morality of the town is becoming more and more a sensational and romantic morality inculcated in the

commercial theatres ; and that our profusely endowed free libraries, however well-stocked with highclass literature, act mainly as circulating libraries of romantic and essentially theatrical fiction. To continue in the face of these facts ... leaving the theatre to prostitute itself further and further on the plea that 'they who live to please must please to live' is really to abandon the most potent factor in the formation of our national conscience and character to the survivors in a competition in which the most scrupulous go to the wall. No European nation neglects this grave fact as England does."

পরে বিলেতের লোকেরা চাঁদা তুলে শেক্সপীয়র মেমোরিয়াল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। (অনেক পরে অবশ্য।) আজ তার নাম রয়্যাল শেক্সপীয়র কোম্পানী। এবং আধুনিক ইংরেজি নাট্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের নাম প্রথম সারিতে।

এইরকমভাবেই শ্রেষ্ঠীর অর্থসাহায্যে নিউ ইয়র্কে শুরু হয়েছে লিঙ্কন সেন্টার যাদের প্রথম প্রযোজনা হয়েছিলো, যতোদূর মনে পড়ে, আর্থার মিলারের লেখা 'আফটার দ্য ফল', নির্দেশ দিয়েছিলেন ইলিয়া কাজান। জর্মানীতে এইধরনের সাহায্যপুষ্ট নাট্যকর্মের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি বা ব্যুরো কাউন্সিল বা বিভিন্ন রাজ্য নাট্যসৃষ্টিকে সাহায্য ক'রে এসেছে। জাপানে এই শতাব্দীর গোড়ায় কাবুকি নাট্যভঙ্গীর অধঃপতন রোধ করবার জন্যে শ্রেষ্ঠীরা চাঁদা তুলে কাবুকি নাট্যসম্প্রদায়গুলোকে সাহায্য দেওয়া শুরু করেন। তার ফলেই আজ আমরা কাবুকি বা নো-র মতো নাট্যরূপ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের দেশে মিউনিসিপ্যালিটি বা ধনীব্যক্তিরা কেউই নাট্য সম্পর্কে সেই দায় অনুভব করেননি।

আজ বিলেতের ন্যাশনাল থিয়েটার হয়েছে, এবং তাঁরা ও রয়াল শেক্সপীয়র কোম্পানী ইংরেজ নাট্যজগতের পথপ্রদর্শক। অর্থাৎ কেবল সরকারের পয়সায় যেমন তেমন ক'রে একটা নাট্যগৃহ চালালেই সেটা জাতীয় হ'য়ে ওঠে না, জাতির মনে হওয়া চাই যে এই থিয়েটার আমাদের গৌরবের

বস্তু, এখানকার নাট্যসৃষ্টি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সম্পদ। নইলে 'লোক-রঞ্জনী শাখা' তো এখনই ন্যাশনাল হ'য়ে ব'সে আছে।

এই কথাটিই আমরা গোড়াতে ঠিক করেছিলাম যে এমন একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন যেখানে উৎকৃষ্ট নাট্যাভিনয়ের সুযোগ আছে।

কেউ কেউ মনে করেন রবীন্দ্রসদন যদি সস্তায় অনেক নাট্যসংস্থাকে ভাড়া দেওয়া যায় তাহ'লেই ন্যাশনাল থিয়েটার হিসেবে এর মর্যাদা সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু কলকাতা শহরে ও কাছাকাছির মধ্যে তিনশো পঁয়ষট্টিটা সংস্থা পাওয়া শক্ত হবে না। তার ফলে, প্রত্যেক সংস্থা বছরে একদিন ক'রে অভিনয়ের সুযোগ পাবে। বছরে একদিন ক'রে অভিনয় ক'রে নাট্যকলার মানকে কীভাবে ক্রমশ উন্নত করানো যায় এটা সাধারণ-বুদ্ধির অগোচর। তার ওপর কলকাতা ও তার কাছাকাছি ছাড়াও আরো অনেক জায়গা আছে বাঙলা-দেশে, সেখানেও অনেক নাট্যসংস্থা আছে, তাঁদেরও দাবী থাকবে রবীন্দ্র-সদনের ওপর, ফলে, 'নীলদর্পণে'র ভাষায়, 'আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাযেই ফাটে'।

এবং এর ফলে যারা নাট্যকর্মকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ ক'রে আত্মনিয়োগ করতে চায় তাদের তো কোনো সাহায্যই হবে না, উপরন্তু যারা থিয়েটারের ক্লাব বানিয়ে বছরে একদিন অভিনয় ক'রেই খুশি তাদের দলকেই পুষ্ট করা হবে। আর, যারা নিজের জোরে অন্যত্র বারবার দর্শকদের মুখোমুখি হ'তে পারেন, তাঁরা এ-হরিহরছত্রের মেলায় আদপেই-বা যাবেন কেন?

বর্নার্ড শ 'কোর্ট থিয়েটার' নামক এক অব্যবসায়িক নাট্যপ্রচেষ্টার উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে, যে-কাজ এই নাট্যশালা করেছে এবং যে-সাফল্য এ অর্জন করেছে, সেই সফল কাজকে অর্থসাহায্য ব্যতীত আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশেও অব্যবসায়িক নাট্যপ্রচেষ্টা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধ'রে যে-মান সৃষ্টি করেছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারাটাই জাতীয় দায়িত্ব। অর্থাৎ এমন একটা থিয়েটার, যেখানে যারা তাতে কলমে প্রথম শ্রেণীর নাট্যসৃষ্টির কাজ ক'রে এসেছে তাদের কিছু বলবার থাকবে, তাদের আরো কাজ করবার কিছু সুযোগ থাকবে। নইলে এটা তো সরকারী পয়সায় দরিদ্রনারায়ণ ভোজন করানোর মতো, তাতে দরিদ্রেরও দারিদ্র্য যায় না, আর নারায়ণও তুষ্ট হন না।

কিন্তু কে সেই লোকেরা যাঁদের কর্মের সুযোগের জন্য এই ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হবে? এইখান থেকেই যতো বিবাদের শুরু, — যতো 'লাভক্ষতি টানাটানি, অতিসূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ'। যখন দেশবন্ধু বলেছিলেন শিশিরকুমারকে, তখন পরিকল্পনা ছিলো থিয়েটারই হবে, এবং শিশিরকুমারই সেটা পরিচালনা করবেন। এবং তাঁদের কারোরই মনে হয়নি যে তাতে জাতীয় নাট্যশালা জাতীয় হ'তে আটকায়।

কিন্তু এখন ব্যাপারটা নাকি অন্যরকম। অর্থাৎ নাচ আছে, গান আছে, পুতুলনাচ আছে, নৃত্যনাট্য আছে, ও সোজাসুজি নাট্যাভিনয়ও আছে। এবং সকলেরই দাবী আছে রবীন্দ্রসদনের ওপর। সুতরাং কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র নাট্যাভিনয়কে নাকি এর মধ্যে প্রাগাধিকার দিতে পারেন না।

খুব 'ডিমোক্র্যাটিক' কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে 'আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে' যা হয় তাহাই হইতে আছে। অর্থাৎ কাজে-কাজেই ফাটিতেছে। না নাচ, না গান, না অভিনয়, কারোরই উন্নতির জন্যে কোনো ভিত্তিস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। যদি বিদেশী ব্যালে থিয়েটারের মতো এটাকে নতুন নৃত্যপরিকল্পনার জন্যেই সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হ'তো, এবং শ্রী উদয়শঙ্করের মতো কোনো অসাধারণ শিল্পীর হাতে এই কাজের ভার ন্যস্ত হ'তো তাহ'লেও আমরা খুশি হতাম এবং অজস্র সরকারী অপব্যয়ের মধ্যে এই একটা ব্যয় আমাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত ও গৌরবময় ব'লে মনে হ'তো। তেমনি আবার যদি এর একপেশে মঞ্চকে ভেঙে বিদেশী কনসার্ট হলের মতো একে কেবলমাত্র আধুনিক বাজনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র করা হ'তো, যেখানে ভারতীয় সঙ্গীতের নতুন প্রকাশভঙ্গী আবিষ্কারের জন্যে এক অর্কেস্ট্রা সৃষ্টি করা হ'তো, এবং সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ভার যদি ন্যস্ত হ'তো শ্রী আলি আকবর বা শ্রী রবিশঙ্করের মতো সঙ্গীতবিদের ওপ'র, তাহ'লেও আমরা, বাঙলাদেশের সাধারণ লোকেরা, রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম।

এমন-কি তারা যদি সত্য সত্যই মনে করতেন যে, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য, এই তিনটি কলাশিল্পের সাহায্য করাই তাঁদের 'ডিমোক্র্যাটিক' দায়িত্ব, তাহ'লে কেবলমাত্র ভাড়া দেবার জন্যে রবীন্দ্রসদনকে ফেলে না-রেখে এতোদিনের মধ্যে তাঁরা এই তিনটি কলাশিল্পের সৃষ্টির কাজে সাহায্য করা শুরু ক'রে দিতে

পারতেন, এবং সে-রকম পরিকল্পনা করলে বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে প্রায় সওয়া শ দিন পেতো এক-একটি শিল্প, দর্শকদের মুখোমুখি হবার। অর্থাৎ মাসে দশ দিন ক'রে নাচের প্রযোজনা লোকে দেখতে পেতো, দশ দিন ক'রে শুনতে পেতো সঙ্গীতসৃষ্টি, আর দশ দিন ক'রে দেখতে পেতো উচ্চমানের নাট্যাভিনয়।

কলকাতার ব্যবসায়িক মঞ্চগুলো সাধারণভাবে মাসে বারো দিন আন্দাজ অভিনয় ক'রে থাকে। সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো উচ্চমানসম্পন্ন নাট্যসৃষ্টি মাসে দশ দিন ক'রেও হ'তে পারতো সেটাও কিছু কম হ'তো না। কিন্তু সেটা করা হয়নি। ফলে, যে-সমস্ত শিল্পী বুকের রক্ত জল ক'রে নাট্যোন্নতির প্রচেষ্টা ক'রে আসছেন বহু বৎসর ধ'রে, তাঁরা রবীন্দ্রসদনকে আপনার জিনিস ব'লে ভাবতে পারেননি। বরঞ্চ মনে হয়েছে যে, ওটা কুৎসিত দলাদলির একটা আখড়া মাত্র।

কথা উঠতে পারে যে, এইরকম একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করলে যে বিপুল ব্যয়ভার কাঁধে এসে পড়বে তার ঝুঁকি নেবে কে। এ-কথার উত্তর বাইরের লোকের পক্ষে এক কথায় দেওয়া শক্ত। কিন্তু যাঁরাই সরকারী ব্যয়ের পদ্ধতি জানেন তারাই বলতে পারবেন যে, সরকারের যখন কোনো বিষয়ে খরচ করবার ইচ্ছে না-থাকে তখনি টাকার টানাটানির কথা ওঠে, অন্যথায় বিপুল অঙ্ক ব্যয় করতে তাঁদের বাধে না। তার প্রমাণ ঐ রবীন্দ্রসদনেই আছে। বিপুল ব্যয়ে যে-সাইক্লোরামা (আকাশপট) তৈরী করা হয়েছে সেটা ভুল জায়গায় তৈরী হয়েছে, ভুলভাবে তৈরী হয়েছে। এ-রকম অনেক ত্রুটির কথা বলা যায়, কিন্তু এখন ব'লে কোনো লাভ নেই, কারণ একটা ঘটনা ঘ'টে গেলে তারপর সেটাকে মানিয়ে নিয়েই কাজ করতে হয়। কিন্তু টাকার অভাবের কথাটা বোধহয় সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ আমরা মাঝে মাঝেই তো খবরের কাগজে পড়ি যে, অনেক টাকা ব্যয় করা হয়নি ব'লে ফেরৎ গেছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার একবার স্থির করেছিলেন যে, রবীন্দ্রমঞ্চগুলো যদি নিয়মিত অভিনয় আরম্ভ করে তাহ'লে প্রত্যেক বৎসরে তার ক্ষতির অর্ধাংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে, এক লাখ টাকা পর্যন্ত। এইরকম নানান্ উপায় ছিলো টাকা সংগ্রহের। তাতেও যদি না-হ'তো তাহ'লে দেশের লোক চাঁদা তুলে দিতো, যদি তাদের বিশ্বাস জন্মানো যেতো যে, রবীন্দ্রসদন সত্য সত্যই জাতীয় প্রতিষ্ঠান হবে। কিন্তু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর একটা মুশকিল আছে যে,

দেশের লোককে কখনোই সে আপনার মনে ক'রে বিশ্বাস করে না। গার্জেন-সুলভ ভঙ্গীতে সে ভাবে যে, সে যেটা করবে সেটাই সবচেয়ে ঠিক। আর তাই বিপদে পড়লে সে একা বোধ করে, কারণ সাধারণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখাই তার পদ্ধতি।

কিন্তু যাঁরা গত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধ'রে উন্নতমানের নাট্যপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা লোকসাধারণের সাহায্যেই এতোদূর আসতে পেরেছেন, লোকসাধারণের বিশ্বাস তাঁরা অর্জন করতে পেরেছেন। নইলে লোকে তাঁদের অভিনয়ই দেখতে আসতো না অতো শ্রদ্ধা ক'রে বা এটাকে জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ ব'লে মনে করতো না। তাই আরো বেশী প্রয়োজন ছিলো এইসমস্ত নাট্যকর্মীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা করার। যাকে ইংরেজিতে বলে কন্‌ফিডেন্সে নেওয়া। তাহ'লে একটা-না-একটা পথ বেরিয়েই যেতো, অন্ধগলির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হ'তো না।

বর্নার্ড শ যখন ন্যাশনাল থিয়েটারের কথা বলেছিলেন তখন তিনি কোর্ট থিয়েটারের প্রচেষ্টাকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছিলেন। তার-পর যখন সেখানে ন্যাশনাল থিয়েটার হ'লো তখন সেটা নাট্যাভিনয়ের জায়গাই হ'লো, কভেন্ট গার্ডেনও সেখানে ঢোকা উচিত ব'লে কোনো 'ডিমোক্র্যাটিক' থিয়োরী আবিষ্কৃত হয়নি। জাপানে যখন ন্যাশনাল থিয়েটার হ'লো সেটাও নাট্যাভিনয়ের জন্যে হ'লো, নাচ বা গানের জন্যে নয়। অথচ আমাদের এখানে হঠাৎ এক ভীষণ 'ডিমোক্র্যাটিক' থিয়োরী আবিষ্কৃত হ'লো যে, এই আধ আঙ্গুল চুঙ্গিতে নাকি আট আঙ্গুল বারুদ পুরিতেই হইবে নহিলে পক্ষপাতিত্ব হইয়া যাইবে। ফলে, দেখা যায়, এই থিয়োরী কাজের সহায়ক না-হ'য়ে স্ট্যাটাসকুয়োর সাহায্য করছে। অর্থাৎ অবস্থা যেন না-বদলায়, যেমন আছে তেমনিই থাকুক। এবং স্ট্যাটাসকুয়ো বজায় রাখতে তাঁরাই চান যাঁদের বর্তমান অবস্থায় সুবিধা আছে।

কলকাতা শহরে মঞ্চাভিনয় যে সপ্তাহে অন্তত চারবার ক'রে হ'তে পারে ও তদুপরি ছুটির দিনগুলোতেও যে হ'তে পারে, এটা একটা ঘটিত ও ঘটমান ব্যাপার। কিন্তু এইরকম নিয়মিতভাবে নাচ বা গানের আসর যে চলতে পারে তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। সুতরাং

যে-জিনিসটা জন্মেছে ও বাড়ছে তাকে সাহায্য করাটাই বোধহয় প্রাথমিক কর্তব্য। তারপর ভাবতে হয় যে, যে ভালো জিনিসগুলো ঘটেনি সেগুলো কী ক'রে ঘটানো যায়। কিন্তু যে-ছেলে এখনো জন্মায়নি তার ভালো করতে হবে ব'লে যে-ছেলেটা জন্মেছে তাকে অবহেলা করা একমাত্র সৎমায়ের পক্ষেই সম্ভব, অন্যের পক্ষে নয়।

তাছাড়া মস্কো বা লণ্ডন বা বার্লিন শহরে সাহায্যপুষ্ট থিয়েটারের সংখ্যা ব্যালে বা কনসার্ট হলের চেয়ে বোধহয় বেশীই। যে-কেউ ঐ-সমস্ত শহরের প্রোগ্রাম-বই দেখলেই দেখতে পাবেন। এখানেও মঞ্চাভিনয়ের যে-ইতিহাস আছে, এবং আধুনিককালেও যে গভীর নাট্যপ্রয়াস চলেছে তাতে ন্যাশনাল থিয়েটার হ'লে সেটাকে মঞ্চাভিনয়েরই ক্ষেত্র হ'তে হবে প্রথমত, যেমন কল্পনা করেছিলেন দেশবন্ধু এবং শিশিরকুমার। এবং আজও বেশীরভাগ লোক সেইরকমই কল্পনা করে।

এরপর প্রশ্ন আসে যে, যদি এই কথা মেনেই নেওয়া হয়, অর্থাৎ জাতীয় রঙ্গমঞ্চ যদি নাট্যাভিনয়েরই ক্ষেত্র ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া যায়, তাহ'লে সেটা চালাবে কারা? কাকে কাকে এর মধ্যে নেওয়া হবে?

এই হ'লো আর-একটা বিবাদের ক্ষেত্র। কেউ কেউ বলেন যে যতো রেজিস্টারী করা দল আছে তাদের প্রত্যেককে এক একটা ভোটের ক্ষমতা দিয়ে ডাকা হোক্। তাদের ভোটের মারফতেই ঠিক হবে যে কী হবে, এবং কে কে করবে। এবং সেটাও আবার বৎসরান্তে বদলাতে হবে। যাতে কেউ মৌরুসীপাট্টা না-গাড়তে পারে।

শুনলে এটাও খুব 'ডিমোক্র্যাটিক' লাগে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে রেজিস্টারী করার সঙ্গে নাট্যমানের কোনো সম্পর্ক নেই। এমন-কি এমন সমস্ত দলও নাকি আছে যারা আমোদকর থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে যে ন্যূনতম শর্তাবলী তা-ও পালন করতে পারে না ব'লে রেজিস্টার্ড হওয়া সত্ত্বেও কর থেকে রেহাই পায় না। এই রেজিস্টার্ড দলগুলোর মধ্যে বছরে কয়েকটামাত্র অভিনয় করে এমন ক্লাব-সদৃশ সংগঠনও আছে, আবার নাট্যনিষ্ঠ ও সৃষ্টিকুশল সংস্থাও আছে। অর্থাৎ যারা সখের দল, এবং যারা নাট্যকেই জীবনের ব্রত করেছে, উভয়েই আছে। এই অবস্থায় রেজিস্টারী খাতার নিরিখের কোনো মানে হয় না।

তার ওপর এইভাবে ভোটের অধিকার দেওয়া হ'লে ফলটা কি ভালো হবে? কারণ, এতে তো নাট্যনিষ্ঠার বা কলাকুশলতার কোনো প্রশ্ন থাকছে না, প্রশ্ন কেবল 'রক্তকরবী'র ভাষায় বড়ো খাতায় নাম ওঠার। রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ কলহে যেমন অনেক নতুন সভ্য ভর্তি ক'রে নেওয়া হয়, এ-ও তেমনি নিজের বাছা বাছা লোকদের দিয়ে আলাদা আলাদা নাম রেজিস্ট্রি করাবার প্রবণতাকে সাহায্য করবে, নাটক তারা ভালো করুক আর নাই করুক।

আমরা তো দেখেছি, এই কলকাতা শহরে কয়েক বছর আগে ৬৫ কিংবা ৮৫টা দলের নাম দিয়ে এক পরিষদ তৈরী ক'রে ঝাঁঝানো বুলি আর কুৎসিত গালি ছুঁড়ে আকাশ যেন অন্ধকার ক'রে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু কোথায় গেলো সেই ৬৫ না ৮৫টা দল! ক'জন তাদের মধ্যে নাট্যের প্রয়োজনায় দর্শকের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে!

যে রাজনৈতিক খেলা খেলবার জন্যে এইসব ঘটনা ঘটানো হয় তারই কি পুনরাবৃত্তি করবার ইচ্ছে এই জাতীয় রঙ্গমঞ্চের নামে? যাতে, নাট্যোন্নতি হোক্ বা না-হোক্ দলাদলিটা বেশ ফলফলাও হ'য়ে উঠতে পারে? তখন কি ভোটে পাত্তা পাবার জন্যে সকলেই ঐ-রকম নতুন নতুন নামে দল রেজিস্টারী করবার ফিকিরে ঘুরবে? যেমন এক একটা বণিকসম্প্রদায় নানান্ নামে কোম্পানী রেজিস্টারী করায়, তেমনি নাট্যসংস্থাগুলোও কি দশটা নামে দশটা দল রেজিস্টারী ক'রে মহলাঘরের সামনে ঝুলিয়ে রাখবে এবং ভোটের দিন ভাই বেরাদর বৌ ছেলে এমন-কি চাকরকে পর্যন্ত সাজিয়ে নিয়ে ভোট দিতে যাবে?

কথাটা কিন্তু মোটেই হাসির নয়। যদি এমন একটা প্রক্রিয়া তৈরী করা হয় যাতে কাজের মূল্য থাকে না, কিন্তু ফিকিরবাজের মূল্য থাকে, তাহ'লে সেই প্রক্রিয়ায় সাধারণ ভালো মানুষও ফিকিরবাজ হ'তে বাধ্য হয়।

একটা গল্প মনে প'ড়ে গেলো। বহুদিন আগে, সেকালে, এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে আমন্ত্রণ ক'রে জমিদার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো যাত্রা দেখাবার জন্যে। যাত্রায় রাম এলো, সীতা এলো, দশরথ বিলাপ করলে, রাম পিতৃসত্য পালন করতে বনে গেলো — কিন্তু সাহেব বাঙলা

ভাষা বোঝে না, তার নাক মাঝে মাঝেই ডেকে উঠতে লাগলো। এমন সময়ে আসরে হনুমানের প্রবেশ। তার লম্ফঝম্প দেখতে ছেলেপুলেরা যখন কলরব ক'রে উঠেছে তখন সাহেবের চটকা ভেঙে গেলো। এতোক্ষণ পরে তিনি ল্যাজনাড়া ও হুপ্ হাপ্ শব্দ শুনে একটা রসগ্রহণের বস্তু পেলেন। প্রচণ্ড খুশি হ'য়ে একেবারে দশ টাকা বখসিস ক'রে দিলেন হনুমানকে। হনুমান তো নমস্কার ক'রে টাকা নিয়ে চ'লে গেলো। আবার রাম এলো সীতার বিলাপ করতে করতে, সীতা এলো অশোক কাননে বিলাপ করতে করতে, কিন্তু সাহেবের আবার চোখ ভেরে আসছে, থেকে থেকে নাক ডেকে উঠছে। খানিক পরে আর সহ্য না-হওয়াতে বললেন — বাবু কল দ্যাট হানুমান এগেন, ফির হানুমানকো বোলাও।

ফের হনুমান এলো, এবং আগের বারের চেয়ে আরো খানিকটা বেশী মাত্রায় পশ্চাদ্দেশ আন্দোলিত ক'রে ল্যাজ নাড়ালো, আরো খানিকটা বেশী লম্ফঝম্প করলো। সাহেবের আবার ঘুম ছুটে গেলো আবার উৎফুল্ল হ'য়ে তিনি মোটা মোটা হাতে করতালি দিলেন এবং আবার আর-একটা দশ টাকার নোট হনুমানকে বখসিস দিলেন।

এইরকম আরো একবার হ'তেই দেখা গেলো যে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এমন-কি সীতা কৈকেয়ী কৌশল্যা পর্যন্ত এক একটা ল্যাজ লাগিয়ে আসরে নেমে ল্যাজ নাড়তে থাকলো ও হুপ্ হাপ্ শব্দ করতে থাকলো।

আশা করি, গল্পটা সর্বৈব মিথ্যা, কিন্তু আমাদের চারপাশে তাকিয়ে এটাকে এতো সত্যি মনে হয় যে ভয় করে। মনে হয় যে, এতো অধঃপতনের পরেও তো বাঙালী হিসেবে আমাদের খানিকটা জ্ঞানোদয় হওয়া উচিত। একটু তো মনে হওয়া উচিত যে, যা সৎ, যা সুস্থ, যা সুন্দর, তাকে আমরা কী ক'রে খানিকটা বাঁচবার সাহায্য করতে পারি। কারণ, এরপর তো আর সময় থাকবে না। ইতিহাস আর সময় দেবে না।

তারপর বৎসরান্তে সমস্ত ঢেলে সাজাবার কথা। এককালে জমিদারী নীলাম হ'তো প্রত্যেক বছরে। তাতে যে-লোক নীলামে ডেকে জমিদারী পেতো সে ঐ-বছরের মধ্যে যতোটা পারে মুনাফা লুঠবার ফিকির করতো, প্রজাদের সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব বোধ করতো না। সরকারের প্রশাসন

বিভাগেও উচ্চপদস্থ লোক নিয়োগ করা হয় না এক-আধ বছরের চুক্তিতে। তাহ'লে তো এক বছরের চুক্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা যেতো।

রয়্যাল শেক্সপীয়র কোম্পানীও গোড়াতে ঐ-রকম অল্প সময়ের জন্যে লোক নিয়োগ করতো। কিন্তু ক্রমশ তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁদের থিয়েটারকে যদি সত্যিই উপযুক্ত ও সম্মানার্হ ক'রে তুলতে হয় তাহ'লে বেশী দিন ধ'রে একজনকে গ'ড়ে তোলবার সুযোগ দিতে হবে। আর তাই ১৯৬০ সালে পীটার হলকে আনা হয়। এবং আজ পর্যন্ত তাঁরই নেতৃত্বে নানান্ নির্দেশকের সৃষ্টিতে রয়্যাল শেক্সপীয়র কোম্পানী একটা বিশ্ববিখ্যাত নাম। ন্যাশনাল থিয়েটার তৈরী হ'লে লরেন্স ওলিভিয়ের তার নেতৃত্ব পান, এবং সেটা এক-আধ বছরের চুক্তিতে নয়। ব্রেখ্‌ট্ যে-নাট্যশালা পান সেখানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করেছেন, এবং সেটা প্রতি বছর ভোট দিয়ে নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন করা হবে, এই শর্তে নয়।

প্রতি বছর ভোট দিয়ে যদি কোনো শিশুর নতুন নতুন মা-বাবা নির্বাচন করা হয় তাহ'লে কি সেই শিশুর পক্ষে মঙ্গল হয়? প্রত্যেক বছর যদি নতুন নতুন মা-বাবা নতুন নতুন থিয়োরীতে শিশু পালন শুরু করে তাহ'লে কি শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়।

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কেউ কারোর নয়। একটা নাটকের চুক্তি, কিংবা ছ-মাস বা এক বছরের চুক্তি। পরের নাটকে তারা থাকবে কিনা ঠিক নেই, তাই পরস্পরের মধ্যে কোনো সৌহার্দ্য জন্মায় না, মঞ্চটাকে আপনার ব'লে মনে হয় না। তাই বরঞ্চ মালিকের মন রেখে চলবার চেষ্টা হয়, যাতে আর-একবার নিযুক্ত হ'তে পারি। এই পাপচক্রকে ভাঙবার জন্যই জাতীয় রঙ্গমঞ্চের আন্দোলন শুরু হয়েছে দেশে দেশে, যাতে শিল্পীদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধে একটা বোধ জন্মায়, এবং সেই বোধ ছাড়া প্রথম শ্রেণীর নাট্যাভিনয় সম্ভব নয়। তাই নির্দেশক ও অভিনেতা অভিনেত্রী সকলকেই বেশীদিনের জন্যে নিয়োগ করা হয়। অথচ এইসমস্ত ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও বাঙলাদেশে কথা ওঠে যে বৎসরান্তে সবাইকে ভোট দিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে। এ তো আবার সেই ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের নিয়মটাই অন্য নামে জাতীয় রঙ্গমঞ্চের মধ্যে চালাবার চেষ্টা। তাছাড়া ভোটের জোরে কবে কোথায় শিল্পসৃষ্টি হয়েছে এটা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর।

এ-সব কথা তাঁরাই ব'লে থাকেন যাঁরা কখনো সংগঠন গড়েননি, বা গড়তে গিয়েও পারেননি। জাতীয় রঙ্গমঞ্চ গ'ড়ে তোলা মানে একটা সম্মানার্হ সংগঠন গ'ড়ে তোলা, সেটা যাঁরা করেছেন তাঁরা কেউই এইসব দায়িত্ববোধহীন কথায় সায় দেবেন না। অথচ দরকার সেই সমস্ত গঠনক্ষম শিল্পীদের, নির্দায়িত্বিক থিয়োরীপ্রবক্তাদের নয়।

বাঙলা নাট্যকর্মীদের এখনো অনেক-কিছু করতে বাকি আছে। তুচ্ছ দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে তাকে বাঙলা নাট্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এমন একটা নাট্যভঙ্গী আয়ত্ত করতে হবে যা একেবারে ভারতের, একেবারে বাঙালীর। যেটা দেখে বাঙালীর মন, ভারতীয়ের মন গভীরতার অনুভব পাবে, আর যেটা দেখে পৃথিবীর লোক বলবে, এ একটা অদ্ভুত গভীর নাট্যপ্রকাশ, যেটা ভারতের নিজস্ব।

এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে গেলে ন্যাশনাল থিয়েটার সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবেই ভাবা উচিত। এবং সেটা রবীন্দ্রসদনের মুখ চেয়ে নয়। জাতি তার নিজের নৈতিক জোরে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ তৈরী ক'রে নেবে, রবীন্দ্রসদনের দলাদলির ঊর্ধ্বে গিয়ে।

১৩৭৫

প্র যো জ না
প্র স ঙ্গে

বাঙলার নবনাট্য আন্দোলন

নবনাট্য আন্দোলনে নাট্যাভিনয়ের রূপরীতি কী এই আলোচনা শুরু করবার আগে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আমাদের চিন্তাকে একটু সুসম্বদ্ধ ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। নাট্যাভিনয় জিনিসটা কেবল নাটক নয়, কেবল অভিনয় নয়, কেবল মঞ্চসজ্জা বা উপস্থাপনার প্রকরণচাতুর্য নয়। এইসব মিলিয়ে নাট্যাভিনয়, বা আরো ঠিক ক'রে বলতে, নাট্য। এই নাট্যশিল্প তাই অনেকগুলি শিল্পের সুছন্দ সম্মেলন, এবং সেই মিলনে যে-রসের সৃষ্টি হয় তা বিশিষ্ট, ও আর কোনো শিল্পে তা হয় না।

এই কথা যদি আমরা মানি তা হ'লে নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাতে কোন্ নাট্যে এই ধারাগুলো মিলে একটা নতুন রূপ সৃষ্টি করেছিলো, এবং সে-রূপ পূর্বানুসৃত নাট্যভঙ্গী থেকে কী হিসাবে পৃথক্ সে-আলোচনারও প্রয়োজন। নইলে অন্ধদের হাতি দেখার মতো আমরা কেউ শুঁড়টা, কেউ-বা পা-টা, আর কেউ-বা লেজ-টা হাত বুলিয়ে দেখে সেইটেকেই সমগ্র হাতিটার রূপ মনে ক'রে তর্ক করবো।

'নবান্ন' নাটকের অভিনয় যখন হয়েছিলো তখন এইরকম গুটিকতক বিশেষ ঘটনা ঘটেছিলো। প্রথমত, নাটকটা লেখা হয়েছিলো তদানীন্তন একটা টাটকা ঘটনার ওপর, সেটা হ'লো তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তর। এমন একটা দেশব্যাপী বীভৎস দুর্ঘটনায় মানুষের লোভ আর মানুষের দুর্দশা দুই-ই যেন উলঙ্গ বিভীষিকার মতো প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিলো, এবং নাট্যকারও অত্যন্ত ধিক্কার ও অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে সেই মূর্তি তুলে ধরেছিলেন। তদানীন্তন অন্যান্য নাটকের সঙ্গে তুলনা করলে এর পার্থক্য বোঝা যাবে। নাটক সাধারণত লেখা হ'তো পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের জন্য। এবং পেশাদারী থিয়েটার নানা কারণে এই উলঙ্গ নির্মম বাস্তবের ছবি মঞ্চের উপর আনতে চাইতো না, এবং সমসাময়িক কোনো ঘটনার — যার মধ্যে রাজনীতি জড়িত আছে — তা স্পষ্টতই এড়িয়ে চলতেন পুলিসের ভয়ে। অপরপক্ষে নাটকের মূলে একটি প্রেমের গল্প, গুটিকয় গান ও পারতপক্ষে এক-আধটা নাচ

এই ছিলো নাটকের বিধান। সেই পটভূমিকায় শ্রী বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'নবান্ন' যেন শ্মশানচারী ভৈরব শিবের মূর্তি। কোনো মিথ্যে নেই, কোনো ছলাকলা নেই। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ভেরী, আর সর্বাঙ্গে ছাই লেপা। কিন্তু কী পরিপূর্ণ অন্তর, আর কী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ।

তাছাড়া, আজও যেমন সে-কালেও তেমনি তুচ্ছ পারিবারিক ও ব্যক্তিগত উপাখ্যান নিয়ে লেখা নাটক কেবল ধুতিপাঞ্জাবী পরা হয় ব'লে সামাজিক নাটক নামে চলে। সেই হিসাবে কিছু ঐতিহাসিক নাম ও সিল্ক ভেলভেটের পোষাক থাকলেই নাটক হয় ঐতিহাসিক, আর আধুনিক নাম ও আধুনিক পোষাক থাকলেই নাটক হয় সামাজিক।

এই অবস্থার মধ্যে শ্রী বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' সত্যসত্যই একটা সামাজিক নাটক, যেখানে গোটা একটা সমাজই হচ্ছে নাট্যকারে উপলব্ধির, চিন্তার ও সমস্যার বিষয়।

তেমনি আবার প্রয়োগপদ্ধতির রীতিতে নতুনত্ব ছিলো। তার আগে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটকের ঘটনা একটা স্তরেই হ'তো। যেমন ধরুন, একটা বিপ্লব ঘটছে এবং তার মধ্যে নাটকের পাত্রপাত্রী জড়িয়ে পড়েছে। সেই ক্ষেত্রে একটা টুকরো কোণে পাত্রপাত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে যতোটুকু সামাজিক বিপ্লবের ইঙ্গিত বাস্তবানুগভাবে পাওয়া যায় ততোটুকুই আনা হয়। অর্থাৎ স্তর ঐ একটা, পাত্রপাত্রীর স্তর। কিন্তু 'নবান্ন' নাট্যাভিনয়ে এই সামাজিক বিপ্লবের মূকাভিনয় রাখা হয়েছিলো পটভূমিকা হিসাবে, — মঞ্চের পিছন দিকে একটা উঁচু পাটাতনেব ওপর। তাঁর সঙ্গে নাটকের পাত্রপাত্রীদের কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিলো না, অথচ সেই পরিবেশ তাদের কার্যকলাপকে অনিবার্য ক'রে তুলছিলো। এইভাবে দুটো আলাদা স্তরে অভিনয় দৃশ্যটিকে ব্যক্তিগত পরিধির ওপরে নিয়ে গিয়ে একটা সামাজিক ব্যাপ্তি দিয়েছিলো।

তাছাড়া ঘরকে ঘর বা বাড়ীকে বাড়ী এঁকে দৃশ্যপট সাজানোর পদ্ধতি একেবারেই বর্জন করা হয়েছিলো। সমগ্র অভিনয়েই পশ্চাৎপট ছিলো চটের পর্দা। তার সামনে অল্প একটু রেলিং সাজিয়ে দিয়ে পার্কের দৃশ্য হয়েছিলো, এবং সেই চটের ওপর লাল সালুতে দাতব্য চিকিৎসালয় লিখে চিকিৎসালয়ের দৃশ্য বোঝানো হয়েছিলো। এর পূর্বে এ-রকম হ'তো না।

তাছাড়া অভিনয়ের কথা। আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সেই সময়ে

theatrical theatre-এর প্রাদুর্ভাব। তাই আবেগ প্রকাশের সময়ে সক্ষম অভিনেতার হাতে সেটা একটু বেশী থিয়েট্রিক্যাল, একটু বেশী stylized লাগতো, আর অক্ষমের হাতে হ'তো ham acting। সেই ক্ষেত্রে নবান্নের অভিনয় ছিলো অনেক বেশী — যাকে বলি naturalistic।

১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৬০ — এই ক'বছরে আমরা অনেক শিখেছি, এবং নবনাট্যের একটা রূপরীতিও গ'ড়ে উঠছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে নানান্ লোকও এসে পড়েছে তাদের অন্যরকম চিন্তাভাবনা নিয়ে, কাজেকাজেই এর মধ্যে অনেক বৈপরীত্যও দেখা যাচ্ছে।

যেমন ধরা যাক, নাটকের কথা। নবনাট্য আন্দোলনের শুরু থেকেই বার-বার একটা কথা নানান্ জায়গায় বলা হয়েছে যে নাটক সমাজসচেতন হওয়া চাই। নাট্যকার সামাজিক দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়া চাই। তার ফলে হয়তো কোথাও কোথাও একটু বেশী শ্লোগান এসে গেছে, হয়তো কোথাও-বা রাজনৈতিক অতিসরলীকরণ হ য়ে গেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিলো যে সমাজের উপলব্ধি যেন নাটকের মধ্যে প্রকাশ পায়।

তারপর অনেক লোক এলেন নবনাট্যের ক্ষেত্রে, যাঁদের কাছে সমাজের ইতিহাস বা সামাজিক বিবর্তনের নিয়ম আদৌ কোনো চিন্তনীয় বিষয় নয়। ফলে, এমন একটা মানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে আধুনিককালে যা-কিছু লেখা হচ্ছে সবই যেন নবনাট্য।

নবনাট্য আন্দোলনের গোড়ার দিকে, বা আজও, অনেক শিল্পীর ও শিল্পরসবেত্তা দর্শকের মনে এর মানে কিন্তু আলাদা। তাঁদের কাছে নবনাট্য মানে সেই নাট্য যেটা জীবন সম্পর্কে আমাদের গভীরতর বোধ এনে দেবে, সমাজের জটিল স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির সহায়ক হবে, যেটা আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে একসঙ্গে বেঁধে মহৎভাবে বাঁচবার অনুপ্রেরণা দেবে।

তাই, নবনাট্য আন্দোলনের নাটককে দেখাতে হবে ব্যক্তি ও সমাজের রূপ। আজ সারা পৃথিবীতে নাটকের এই সমস্যা নানাভাবে সমাধান করবার চেষ্টা হচ্ছে। ইব্‌সেন একভাবে শুরু করেছিলেন। তাঁর নাটকে ব্যক্তিগত কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়েই এতো সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে সামাজিক পট-ভূমিকা বেরিয়ে আসে যে আজও তাঁর ক্ষমতা দেখে চমৎকৃত না-হ'য়ে উপায়

নেই। কিন্তু আজ *Death of a Salesman*-এ, বা *Glass Menagerie*-তে নতুন ক'রে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি — এই দুটো রূপই কী ক'রে নাটকের বাঁধুনির মধ্যে যথাযথভাবে প্রকাশ পায় এই কৌশল আমাদের আয়ত্ত করতে হবে আমাদের দেশকাল অনুযায়ী। যেমন, 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' থেকে শুরু ক'রে আমরা এসে পৌঁচেছি 'রক্তকরবী'র প্রকাশভঙ্গীতে। এবং স্বীকার করতেই হবে যে 'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারা' নবনাট্যের নাটক।

কিন্তু যে-কালে সাধারণ মানুষদের কথাবার্তায় রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিয়েই বলা ভালো, তাই আমরা 'জবানবন্দী', 'নবান্নে'র কাল থেকে নবনাট্যের কাল ধরি, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়েই।

তারপর নাটক উপস্থাপনার রীতি, যাকে বলা হয় প্রয়োগপদ্ধতি। এ-সম্পর্কে নবনাট্যের লোকেরাই প্রথম কথা তুলেছিলো যে আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় আমাদেরই মতো হওয়া চাই। বিদেশীর চতুর্থ শ্রেণীর অনুকরণ যেন না-হয়।

য়ুরোপের naturalistic মঞ্চসজ্জার সবচেয়ে অক্ষম অনুকরণ করে আমাদের ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ। এবং সেইগুলো দেখতে দেখতেই আমাদের দর্শকরা অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। আজ তাই দরকার হয়েছে নতুন ক'রে মঞ্চসজ্জা করবার। যে-মঞ্চসজ্জায় বাহুল্য থাকবে না, কিন্তু গভীরতা থাকবে।

আজকাল এই সূত্রে একটা কথা উঠেছে যে আঙ্গিকের জোয়ারে নাটকের অঙ্গহানি হচ্ছে। তাই অনেকে বলছেন যে আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী সকল প্রকার যান্ত্রিকতা উড়িয়ে দিয়ে সহজ সরল নাট্যপ্রয়োগের দিনে ফিরে যেতে।

তাঁদের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। কারণ পিছনে ফিরে যাওয়াটা তো সম্ভব নয়। তাহ'লে তো দেশে যতো বড়ো বড়ো কারখানা হচ্ছে সব বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। তাহ'লে যাঁরা এ-কথা লিখছেন তাঁদের ফাউন্টেন পেনে না-লিখে খাগড়ার কলমে লেখা উচিত, এবং আধুনিক ছাপাখানার যান্ত্রিকতার সাহায্য একেবারেই নেওয়া উচিত না। মাথার উপরে পাখা ঘোরানো উচিত না, এবং ঘরে রেডিও রাখা উচিত না। তাছাড়া, ফিরে যাওয়া যদি সম্ভবও হ'তো, তাহ'লেই সকলে যে একই সময়কে লক্ষ ক'রে ফিরে

যেতো তার কী মানে? কেউ হয়তো কয়েক বছর পিছনে গিয়ে 'কেদার রায়', 'বঙ্গে বর্গী'র যুগে পৌঁছে মনে করতেন, এই ভালো, কোনো যান্ত্রিকতার আড়ম্বর নেই। আর কেউ হয়তো একশো বছর আগের যাত্রার আসরে গিয়ে থামতেন। আবার কেউ কেউ সংস্কৃতযুগে ভরতমুনির বিধান অনুযায়ী রীতিমতো নাট্যমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ চাইতেন।

কাজেকাজেই মানুষের কাজ হ'লো যন্ত্রের চেয়ে আরো বড়ো হওয়া, যন্ত্রকে পরিহার করা নয়। নাটকের বিষয়বস্তু ও নাটকের অভিনয় যদি উন্নত হয় তাহ'লেই এ-যান্ত্রিকতাকে জয় করা যাবে, নইলে যন্ত্রের কাছে মানুষ বিকিয়ে যেতে বাধ্য, এবং সেটা যন্ত্রকে গালি পেড়ে ঠেকানো যাবে না।

তেমনি আর-একটা কথা আমি বুঝতে পারি না। সেটা হ'লো বিদেশী নাটকের অনুবাদ ক'রে অভিনয় করা নাকি খারাপ! পৃথিবীর সকল দেশেই তা ক'রে থাকে। যাঁদের বলা হয় ক্লাসিক নাট্যকার তাঁদের নাটকের অভিনয় সর্বদেশে সর্বকালে হ'য়ে থাকে। আমরা কি এমন অভাগা যে সমগ্র পৃথিবীর সেই ভোজসভা থেকে আমাদের বঞ্চিত থাকতে হবে? তাছাড়া, এই সমস্ত ক্লাসিক নাটক কিছু কিছু অভিনীত হ'তে থাকলে আমাদের দর্শকদেরও বোধবুদ্ধির মান উন্নত হবে, এবং পুনরায় আর-একজন মহান ব্যক্তি 'রক্তকরবী'র মতো আর-একটা নাটক লিখলে সে-নাটককে হয়তো এতো বছর অপেক্ষা করতে হবে না।

তাই আজকে নবনাট্য আন্দোলন যদি নবনাট্যের নাম সার্থক রাখতে চায় তাহ'লে যা-কিছু যান্ত্রিকতার উপাদান সবার সাহায্যই তাকে নিতে হবে নাট্যের বুদ্ধিসম্মত আবেগকে আরো প্রবল করবার জন্যে। তেমনিই সারা পৃথিবীর নাট্য-ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ ক'রে নিজের মধ্যে জীর্ণ ক'রে তাকে ব্যবহার করতে হবে। নবনাট্যের ক্ষেত্রে কোনো সঙ্কীর্ণতার ঠাঁই নেই, ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিচার নেই। এর উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে মহৎ হ'য়ে বাঁচতে সাহায্য করা, মানুষের হৃদয়কে আর বুদ্ধিকে সুছন্দে বাঁধা।

১৯৬০

নবনাট্যের বিচার

কিছুদিন থেকেই অনেক লোকের মনে হ'তে আরম্ভ করেছে যে নবনাট্য নামে যা আমাদের দেশের চারিদিকে প্রবল উৎসাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার সবটাই কিছু ঠিক হচ্ছে না। কেউ কেউ তো এ-কথাও বলছেন যে, পুরো আন্দোলনটাই নাকি পথভ্রষ্ট হয়েছে। অন্য অনেকে অবশ্য অতো কঠিন ক'রে বলছেন না, কিন্তু তাঁদেরও মত এই যে নবনাট্যের নামে অনেক যথেচ্ছাচার হচ্ছে এবং এখন এর এক নতুন মূল্যায়ন প্রয়োজন।

বর্ষার জল আমাদের কাম্য, কিন্তু বর্ষা যখন আসে তখন সে তো কেবল আমাদের ইতস্তত রাখা কলসী, হাঁড়ি ও ধানের ক্ষেতের প্রয়োজন লক্ষ ক'রে বর্ষিত হয় না, তার বর্ষণ নিজের আইনে — আমাদের পক্ষে তা নির্বিচার। তাই বিচার করতে হয় আমাদেরই। বাঁধ দিতে হয়, খাল কাটতে হয়, ভালো জল রক্ষা করতে হয়, পচা জল নিষ্কাশিত করতে হয়। আর তাই, আজ যখন নাট্য সম্পর্কে এতোবড়ো একটা উৎসাহ এসেছে তখনই একটা বিচারেরও প্রয়োজন ঘটছে, যাতে ময়লা বেনোজল আমাদের ভালো জলকে নষ্ট ক'রে দিতে না-পারে।

এইটুকু বক্তব্যের সঙ্গে কারোর কোনো বিবাদ নেই। বিবাদ বাধে তখন যখন বিচারের পদ্ধতি ঠিক করতে বসা যায়। কেউ ভাবে, জলে আমি পাট পচাবো, সেই ময়লা করাতেই আমার লক্ষ্মী হাসে। আবার কেউ ভাবে, জলে আমি স্নান করবো, রান্না করবো, তাকে নির্মল রাখলেই আমার স্বাস্থ্য থাকে।

কাজে কাজেই বিরোধ পাকিয়ে ওঠে। এবং ক্রমশ নানারকম চরমপন্থী কথা নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ হয় যে, লক্ষ্মীর স্তবেই স্বাস্থ্য বাঁচানো যায়, না লক্ষ্মীকে বয়কট করলে তবে বাঁচানো যায়।

এ-কথা সকল বয়ঃপ্রাপ্ত লোকই জানেন যে টাকা একটা শর্তস্বীকৃত মাধ্যম। তাকে তুচ্ছ করাটাও যেমন ছেলেমানুষি, তাকে নিয়ে নাচানাচি করাটাও তেমনি অসুস্থতা। কিন্তু এ-কথা কেউ স্বীকার করবেন ব'লে

তো মনে হয় না যে, তাঁর নাট্যপ্রয়াসের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অঢেল অর্থোপার্জন। কিংবা এ-কথাই বা ক'জন বলবেন যে, তাঁদের নাট্য যতো দর্শক আকর্ষণে অসমর্থ হয়, যতো flop করে, ততোই তাঁরা আনন্দে অধীর হন এবং নিজেদের পন্থার মহত্ত্ব সম্পর্কে ততোই নিঃসন্দেহ হন? — সুতরাং তর্ক উঠলেই দেখা যায়, সত্যবাক্যের পরিবর্তে আপ্তবাক্যই ব্যবহৃত হ'তে থাকে বেশী।

এ-কথা অবিসম্বাদিত যে সকল সংস্থাই চান যে তাঁদের নাট্যপ্রয়াস জনপ্রিয় হোক্। এবং জনপ্রিয়তা হচ্ছে অর্থের সমার্থক। তাই জন-প্রিয়তার জন্যে, তথা অর্থাগমের জন্যে, অনেক নাট্যপ্রয়োজনা ঘটছে 'নব-নাট্য আন্দোলনকারী'দের দ্বারা। কিন্তু কেবল তাতেই দোষ ধরাটা অন্যায়। যদি কেউ নবনাট্য সৃষ্টি ক'রে তাকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে পারে তাতে তো প্রশংসার কথা। কিন্তু, সে-নাট্য যদি নব না-হয়? তাহ'লে 'পুরানাট্য আন্দোলনকারী' ব্যবসায়ী থিয়েটারের সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়? কেবল জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠবার কাড়াকাড়ি সেখানেও চলে, এখানেও চলবে?

তাই বোঝা দরকার যে লোকপ্রিয় হবার ইচ্ছে সকল শিল্পীরই থাকে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রিয় হবার দিকেই যার লক্ষ্য সে হ'লো ব্যবসায়ী। কিন্তু এমন তো কোনো মাপকাঠি নেই যা বগলে দিয়ে এক মিনিট রাখলেই মানুষটার কতো অংশ মহৎ ও কতো অংশ জোচ্চোর ধরা প'ড়ে যাবে। ফলে, বিচারের নামে আড়ালে নিন্দা-কুৎসাই আমাদের কণ্ঠে বেশী এসে যায়।

তাই বিচারকদের কাছে আমার নিবেদন যে, ভালোমানুষিকতার নামে নির্বিচার প্রশংসা বা সত্যবাদিতার নামে নির্বিচার নিন্দা না-ক'রে বিচারের একটা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি স্থাপন করাই মঙ্গলপ্রদ।

আমাদের দেশের মঞ্চ অনেকদিন আছে। তাতে গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার ইত্যাদি প্রখ্যাত শিল্পীরা কাজ ক'রে গেছেন। দেশের সেই মঞ্চই যদি আমাদের ঐতিহ্যের ধারাকে সগৌরবে বহন ক'রে এসে থাকে, তাহ'লে তার বাইরে অকস্মাৎ এই নবনাট্য নামধেয় নাচানাচির কী দরকার ছিলো। আর যদি এই নবনাট্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন থেকে থাকে, তাহ'লে নিশ্চয়ই

আমাদের জাতীয় মঞ্চ কোথাও জাতিভ্রষ্ট হয়েছে, তাই জাতির আর-একটা চেতনাকে স্পষ্ট করার জন্যেই এই আন্দোলন শুরু হয়েছে।

আমরা জানি যে আমাদের মঞ্চে প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এ-ও জানি যে ততোখানি গুণসম্পন্ন নাট্যকার আসেননি। বিদেশে কিছু বিরাট কবি, কিছু বিরাট সাহিত্যিক নাটকের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। অভিনয় যদি না-ও হ'তো তাহ'লেও আমরা শেক্সপীয়রের লেখা, গায়টের লেখা, ইবসনের লেখা পড়তাম। নিজেদের বাঁচার তাগিদেই পড়তাম। কিন্তু বাঙলাদেশের বেশীর-ভাগ নাটকই আমাদের সেই গভীর অন্বেষায় সাহায্য করে না। তাতে সেন্টিমেন্ট আছে, কান্না আছে, ছেলেভুলানো গল্প আছে, অর্থাৎ মঞ্চের চাকা চলন্ত রাখবার জন্যে যে-সব প্রমোদ উপকরণ দরকার হয় তারই যোগান আছে। কিন্তু টলস্টয়ের 'অন্ধকারের ক্ষমতা' কি শুধু এন্টারটেন্‌মেন্ট ? রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' কি প্রমোদ উপকরণের যোগানদার ? — তা যদি না-হয় তাহ'লে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের নাটকের ঐতিহ্যের মধ্যে বুদ্ধির ভাগ কম, হাল্কা হৃদয়াবেগ বেশী। ফলে, রবীন্দ্রনাথের নাটক আমাদের জাতীয় মঞ্চে অঙ্গীকৃত হয়নি। জোড়া-সাঁকোর প্রাঙ্গণে সে-ও এক নবনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিলো। আদ্যোপান্ত নব। মঞ্চের মধ্যে বুদ্ধিকে প্রসারিত করবার সেই যে-চেষ্টা তার সঙ্গে কি আজকের নাট্য আন্দোলনের যোগ আছে, না নেই ? এ-সব কথাও বিচারকদের বিচার ক'রে দেখতে বলবো।

আমাদের জাতীয় মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের কতো নাটক অভিনীত হয়েছে তার তালিকা দেখিয়ে এখন একটা কথা বলবার চেষ্টা হয় যে কবির সঙ্গে আমাদের 'সাধারণ রঙ্গালয়'-এর এতো-কিছু দূরত্ব ছিলো না। হয়তো-বা হবে। এ-সব মামলার বিচার জ্ঞানীজনেরা করবেন। কিন্তু আমি একজন খুব ছোটো সাক্ষী। আমি সাধারণ রঙ্গালয়ে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় দেখেছি। সেখানে দেখেছি শ্রীশ কিংবা বিপিন লাফিয়ে রসিকের কোলে চ'ড়ে বসলো, চন্দ্রবাবু রসগোল্লা খেয়ে আঙুলগুলো আমূল চাটতে লাগলেন। আমার সেই অল্পবয়সেই এগুলোকে অত্যন্ত স্থূল ও অ-রাবীন্দ্রিক ব'লে মনে হয়েছিলো। আমি কী করবো ? আমি কেমন

ক'রে মনে করবো যে সাধারণ রঙ্গালয় ও জোড়াসাঁকো — এই দুই স্রোত মিলেছিলো।

অথচ মিললে ভালো হ'তো। রবীন্দ্রনাথ অমেয় শৌর্যসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি এই সাধারণ দর্শকদের মুখোমুখি হ'লে লড়াই ছেড়ে পালিয়ে যাবার লোক ছিলেন ব'লে বোধ হয় না। বরঞ্চ তাঁর অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি তাঁর নাট্যরচনায় এমন কৌশল আনতে পারতো যে শ্রেয় এবং প্রেয় মিলে বাঙলা মঞ্চকে অনেক যুগের জন্যে বাঁচিয়ে দিতে পারতো। কেবল নিজের মননের নিঃসঙ্গতার মধ্যে নাট্যরচনার ফলে যা-কিছু ত্রুটি তাঁর লেখায় এসে গেছে সে-সব ভেসে যেতো সেই সংযোগের দ্বন্দ্বে ও উল্লাসে।

কিন্তু থাক, এ-সব কথা হয়তো নেহাতই কল্পনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে যে-নাট্যচর্চার শুরু তার মধ্যে জীবনের গভীরতা ও জটিলতা বোঝাবার যে-প্রচেষ্টা, সেটার সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের যোগ কোথায়? কেবল তাঁর কতকগুলি নাটক অভিনীত হয়েছিলো ব'লে? তাহ'লে হিন্দীতে 'জল্‌জলা' ব'লে যে-বায়স্কোপ হয়েছিলো, বাঙলাতে 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' ও আরো অনেক যে-সব ছবি তোলা হয়েছিলো তারা কি প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইসব বায়স্কোপের আত্মিক যোগ ছিলো, বা আছে?

এর মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবেই স্মরণীয়। তিনি শিশিরকুমার। তাঁর নাট্য-প্রযোজনায়, তাঁর অভিনয়ে, তাঁর বাচনভঙ্গীতে, তাঁর উচ্চারণে আমি নিজে প্রথম বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্টত অনুভব করলাম। একমাত্র তাঁর কণ্ঠেই কাব্যের কথা যেন স্পষ্ট রূপ পেতো। শুধু কাব্য কেন, কথা যে কেবল সেন্টিমেণ্টবাহী নয়, তাতে যে বুদ্ধির বিচিত্র রং ঝল্‌মল্‌ করে, সেটা কেবলমাত্র তাঁর অভিনয়েই বুঝতে পারতাম। আর-কারোর অভিনয়েই সে-উপলব্ধি আমার হ'তো না। 'জীবনরঙ্গ' নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষটায় নাট্য কেমন হবে তার একটা বর্ণনা ছিলো একটি চরিত্রের মুখে। সেটি অভিনয় করতেন শিশিরকুমার। অমন অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত হৃদয়াবেগের প্রকাশ আমি তার পূর্বে দেখিনি। আজও আমার শিশির-কুমারের ঐ-কথাগুলো বলবার ভঙ্গী খুব স্পষ্টভাবে মনে আছে। সে-স্বরবৈচিত্র্য অদ্ভুত। যতোদূর মনে পড়ে, নাটকে ছিলো যে শিষ্য জিজ্ঞাসা

করেছে নাট্যাচার্যকে, লোকে তো থিয়েটার দেখতে আসে আনন্দ করবার জন্যে, তারা তো শিক্ষার জন্যে আসে না, সুতরাং আপনি শিক্ষা দেবেন কী ক'রে? নাট্যাচার্য তার উত্তরে বলেন যে, নাটককে শুরু করতে হবে কেতুনপুরের ভূনাগ রাজার রানীর মতো ঘাঘ্‌রা দুলিয়ে, ওড়না উড়িয়ে, আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে। তারপরে অকস্মাৎ নাটকের মধ্যভাগে আসবে সঙ্কট। তখন —

বিনা মেঘে বজ্ররবের মতো
উঠল বেজে কাড়ানাকাড়া,
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী,
ঝন্‌ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তখন দ্বারের কাছে বসি
গভীর সুরে ধরল কানাড়া।

রক্ত! রক্ত! বেগে গড়িয়ে পড়বে রক্তধারা! যারা আনন্দ করতে এসেছিলো তাদের দু-চোখ যাবে অন্ধ হ'য়ে। —

এই যে-অভিনয় (যার প্রতিটি ভঙ্গী আজও আমার প্রায় মুখস্থ), এই যে বিশিষ্ট বক্তব্য — এর সঙ্গে কি দেশের সাধারণ মঞ্চ কোনো যোগ রেখেছে? — শিশিরকুমার উচ্চারণ সম্পর্কে খুব রুচিবান ছিলেন। সেই উচ্চারণস্পষ্টতা কি সাধারণ রঙ্গালয়ে অনুসৃত হয়? কিংবা তথাকথিত নবনাট্য আন্দোলনে? তাই আমি বিচারকদের অনুরোধ করবো যে, তাঁরা যেন বিশ্লেষণ ক'রে দেখেন যে শিশিরকুমারের নাট্যচিন্তার সঙ্গে কি নবনাট্য আন্দোলনের কোনো যোগ আছে, নাকি আজকের ব্যবসায়িক মঞ্চের সঙ্গে তার যোগ আছে?

অর্থাৎ আজকের নবনাট্য আন্দোলন কি হঠাৎ উদ্ভূত, না অতীতের গভীরে কোথাও তার কোনো শিকড় ছড়িয়ে আছে? যদি এটা অতীতের ধারা থেকে এসে থাকে তাহ'লে সে-ধারাটা কি বুদ্ধিদীপ্ত নাট্যপ্রয়াস নয়? বাঙলাদেশে একটা ইন্‌টেলেকচুয়াল থিয়েটার গড়বার চেষ্টা নয়?

তা যদি হয় তাহ'লে বাঙলাদেশের থিয়েটারের দু'টি ধারাকে খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝতে হবে। একটি ব্যবসায়িক, অপরটি নাট্যসাংস্কৃতিক। বাইরে তাঁরা নিজেদের যে-নামই বলুন-না কেন। এবং বিচার করবার

সময়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ত্রৈলঙ্গস্বামীর মতো সব-কিছু একাকার ক'রে দেবেন না। বাঙলায় একটা গ্রাম্য কথা আছে — 'চোর চায় গোলমাল'। এবং এরই সঙ্গে আর-একটা কথা আছে — 'এলোমেলো ক'রে দে মা লুটে-পুটে খাই'। এই গোলমাল বা এলোমেলো ক'রে দেওয়ার কাজ যাঁরা করেন তাঁরা ঐ-চোরদেরই সাহায্য করেন। তাতে গঠনের কোনো সাহায্য হবে না। যে-সমাজ সং প্রচেষ্টা ও অপচেষ্টা উভয়কেই তুল্যমূল্য জ্ঞান করে, সে-সমাজ ভেঙ্গে যেতে বাধ্য, এটা তার মৃত্যুর পূর্বের ভীমরতি।

জন্মের পরে আমাদের এক একজনের এক একটা নাম ঠিক হ'য়ে যায়, তা সে-নামটা খাপ খাক আর না-ই খাক। আমি একজনের নাম শুনেছিলাম দীপ্তিকুমার, কিন্তু তাঁর মধ্যে কোনো দীপ্তির লক্ষণ আমার চোখে পড়েনি। অপর দিকে রবি নামটা খুবই একটা সাধারণ নাম, কিন্তু মানুষটার জন্যে ঐ রবীন্দ্রনাথ নামটাই কেমন ঝল্‌মল্‌ করে। তেমনি নবনাট্য আন্দোলন নামটা এর জন্মক্ষণে কারা যেন দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এর কর্মের ওপরেই নির্ভর করবে এ-নাম ঝল্‌মল্‌ করবে কি না। কিন্তু আমরা যদি নবনাট্য আন্দোলনের প্রয়োজনের কথা একটু থিতিয়ে ভাবি তাহ'লে দেখবো যে, আসল কথাটা নবনাট্য নিয়ে নয়, নাট্যসংস্কৃতি নিয়ে, জাতীয় মঞ্চ নিয়ে। আমাদের নাট্য আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে যথার্থ প্রতিফলিত করতে পারেনি। আগে নাটকে গার্হস্থ্য গল্প ছিলো, যেমন আজও আছে; দেশাত্মবোধের বক্তৃতা ছিলো, যেমন আজও আছে, শুধু হয়তো প্রগতিবাদের মুখোস হিসাবে সাম্যবাদের বক্তৃতা এসেছে কোথাও কোথাও; প্রচুর লোমহর্ষক ঘটনা ছিলো ও অশ্রুক্ষরণের সুযোগ ছিলো, যেমন আজও আছে। তাই বুদ্ধিবাদী রঙ্গমঞ্চ গ'ড়ে তোলবার প্রয়োজন আজও মিটে যায়নি। তাই নাট্যসংস্কৃতি গ'ড়ে তোলবার কাজে অনলস সাধকের দরকার আজও আছে। এবং সেইজন্যেই নামটা নবনাট্য আন্দোলনই হোক্ আর যাই হোক্, ঘটনাটা কিন্তু আকস্মিক নয়; ইতিহাস এর আগমনের জন্যে অনেকদিন ধ'রে পথ তৈরী করেছে, এবং আজ যদি এই প্রচেষ্টা সফল হ'তে না-পারে তাহ'লে আবার অন্য প্রচেষ্টা আসবে অন্য নাম নিয়ে। আসবেই, যদি আমাদের জাতির প্রাণটাই না ম'রে গিয়ে থাকে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সেই বুদ্ধিবাদী ইন্‌টেলেকচুয়াল থিয়েটারই কি আমাদের জাতীয় থিয়েটার? তাহ'লে 'কিন্নরী', 'আত্মদর্শন', 'বঙ্গে বর্গী' থেকে আজকের দিনের 'সেতু' পর্যন্ত যে-সব নাটক শত শত রজনী ধ'রে এই জাতিরই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে উচ্ছ্বসিত ক'রে এসেছে তারা কী? তারা কি জাতীয় নয়? বুদ্ধিবাদী নাট্য হয়তো বুদ্ধিমানদের প্রতিফলিত করবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সাধারণ মানুষের খোরাকটাও তো থাকা চাই? তাহ'লেই তো তারা উভয়ে মিলে জাতীয় রঙ্গমঞ্চকে প্রকাশ করবে, নয় কি?

ব্রেখ্‌ট্‌ সাহেব বলেছেন যে, নাট্যাভিনয় যেন মানুষকে হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে দুর্বল ক'রে না-দেয়, বরঞ্চ তার বুদ্ধিকে যেন আরো জাগ্রত করে, আরো শাণিত করে। সেই ব্রেখ্‌ট্‌ সাহেবের রঙ্গমঞ্চই তাঁর নিজের দেশের জাতীয় মঞ্চের সম্মান পায়, এবং বিদেশে তাঁকে আধুনিকযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যস্রষ্টা হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়।

আমরা যখন জাতীয় সাহিত্যের কথা বলি তখন কি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্টদের সৃষ্টির কথা বলি, না স্থূলমতি লেখকদের চতুর্থ শ্রেণীর রচনাকেও অন্তর্ভুক্ত ক'রে বলি? পৃথিবীর লোকের সামনে কাকে আমরা আমাদের প্রতিভূ বলি? যে-লোক বাঙালীর গুণগুলো প্রকাশ করে, না যে বাঙালীর চারিত্রিক ত্রুটিগুলোকে প্রকাশ করে? অর্থাৎ তেলেভাজার দোকান কেউ কোনোদিন রোধ করতে পারবে না, আমাদের আলোচনা সন্দেশ সম্পর্কে — তাতে যাতে ভেজাল না-পড়ে।

অথচ মুশকিল এই যে, শিশিরকুমার 'তপতী' অভিনয় করেছিলেন, 'বিসর্জন' অভিনয় করেছিলেন, চলেনি; কিন্তু 'রীতিমত নাটক' প্রচণ্ড চলেছিলো। আজও বহু দল সরকারী সাহায্য পেয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক করেছে কিন্তু বেশীরভাগই একদম চলেনি। অনেকে তো সরকারের কাছে আবেদন করেছে শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথের নির্ধারিত নাটক বদ্‌লে তাদের অন্য নাটক করবার অনুমতি দেওয়া হোক্। অথচ এদের মধ্যে কয়েকটি দলের হাল্কা রসের নাট্যাভিনয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকের পোষকতা পেয়েছে।

এই অবস্থায় কর্তব্য কী? জাতি যদি তৈরী না-থাকে তাহ'লে জাতীয় থিয়েটার গ'ড়ে ওঠে কী ক'রে?

আমাদের দেশ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ থেকে সবে বেরিয়ে আসছে। অতীত ভারতের অত্যুজ্জ্বল ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের কোনো ধারাবাহিক বন্ধন নেই। মাঝখানের অন্ধকারযুগ সে-ধারাকে বহু অংশে ছিন্ন ক'রে দিয়েছে। ও-দিকে বাকি পৃথিবী থেমে নেই, তারা অনেক এগিয়ে গেছে। আজ তাই আমাদের অনেক কাজ খুব তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলতে হচ্ছে, সম্পূর্ণ দেশটা তার জন্যে তৈরী না-হওয়া সত্ত্বেও। যেমন ধরা যাক, বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন এবং মেয়েদের দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার স্বাধীনতা। এই বাঙলা-দেশেরই বেশীরভাগ লোক কথা উঠলে নিশ্চয়ই এই আইনের বিরুদ্ধে বলবেন। এ-আইন পাশ হওয়ার পর এই কলকাতা সহরেই সনাতন হিন্দুবিবাহের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে এবং নারীর একানুগত্যের দামামা বাজিয়ে নাট্যাভিনয় হয়েছে। এবং সে-অভিনয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকসাধারণের বিপুল করতালিতে সম্বর্ধিত। কিন্তু তবু আইন পাশ হয়েছে। এদের চোখ ফোটবার অপেক্ষা না-ক'রেই। তেমনি সৎ নাট্যপ্রচেষ্টাও কেবলমাত্র সংখ্যা-গরিষ্ঠের প্রিয় হবার চেষ্টা না-ক'রে দেশের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করবে যাতে আবেগ ও বুদ্ধিতে সঙ্গতি আসে, জীবনে বোধের গভীরতা আসে। যাতে আমাদের জাতীয় নাট্যসংস্কৃতি গৌরবান্বিত হয়।

কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, কোনো জাতি যখন গ'ড়ে ওঠে তখন সে নীচের তলা থেকেই গ'ড়ে ওঠে, কেবল ওপর থেকে সংস্কার ক'রে তাকে গ'ড়ে তোলা যায় না। এই গ'ড়ে তোলার কাজের ভার অনেকের ওপর। বিশেষ ক'রে যেগুলো জনসংযোগের মাধ্যম — যেমন রেডিও, সিনেমা, খবরের কাগজ, রাজনৈতিক সভা — এদের সকলের চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজন। এরা যদি মৌল মানবনীতি, ভদ্ররীতি লঙ্ঘন করে, বুদ্ধিচালিত পথ এড়িয়ে কেবল হুজুগ জাগাবার চেষ্টা করে, জনসাধারণের নিম্নতম বৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করে (যেমন প্রফুমো কাণ্ডে অনেকগুলি কাগজে দেখা গেছে), তাহ'লে সৎ শিল্পী ও সাহিত্যিকের পথ কঠিনতম হ'য়ে ওঠে। এমনিতেই Art is a cruel mistress। তারও পরে প্রতিবেশী যদি সবাই 'হোলি হো, হোলি হো' ক'রে কাদা ও গোবরজল নিয়ে তাণ্ডব শুরু করে, তাহ'লে গভীর কথা বলবার বা শুনতে পাবার সুযোগই থাকে না।

তাই নাট্যসংস্কৃতি যাতে আমাদের দেশের গৌরবের বস্তু হয় তার

জন্যে চেষ্টা করার দায়িত্ব অনেকের এবং অনেক প্রকারের। যদি আমরা জাতি হিসাবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারি তবেই বাঁচবো নইলে — কি জানি নইলে কী হবে!

১৩৭০

'রক্তকরবী'

রবীন্দ্রনাথ গোটাকতক নাটক লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটির সম্পর্কে আমাদের আলোচনার ইচ্ছা। প্রবন্ধের নামেই প্রকাশ যে সে-নাটক 'রক্ত-করবী'। অভিনয় করতে করতে আমাদের মনে হয়েছে যে এ-নাটকে সমাজ যেমন স্পষ্ট, ব্যক্তিও তেমনি স্পষ্ট ; ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি আবার সেই ব্যক্তি প্রতীক হিসেবে আরো ব্যাপ্ত সত্যের প্রকাশ করছে। যেমন ধরা যাক, ইব্‌সেনের 'অ্যান এনিমি অফ্‌ দি পিপ্‌ল্'। এটা শুরু হয় একজন বিশেষ ডাক্তার স্টক্‌ম্যানকে নিয়ে, কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে পৌঁছবার পর মনে হয় এটা কেবল কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, এটা সেই সমস্ত বিপ্লবীর প্রতীক যাঁরা ইতিহাসের কোনো-না-কোনো সময়ে সত্যের জন্য লড়েছেন। কিন্তু যে-কিশোর নন্দিনীকে ফুল দিতে আসে সে কি প্রতীক, না কিশোর নামধারী কোনো এক ব্যক্তিবিশেষ ? তার নাম এমন দেওয়া আছে যে শুরু থেকেই এর প্রতীকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আবার ও-সব কথা না-ভেবে যদি কেবল লাইনগুলো পড়া যায়, বা অভিনয়টা দেখা যায় তো মনে হবে এ একটি কিশোরবয়স্ক বালকবিশেষ। এইটাই রবীন্দ্রনাথের একটা শিল্পকৌশল যে জীবনপ্রতিম ব'লে চিনতে পারার মতো সমস্ত বিশিষ্টতা আরোপ ক'রেও সাধারণ প্রতীকী চেহারাটা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন। যে-বিস্তৃতির চেষ্টা করতে গিয়ে ও'নীল মুখোস ব্যবহার করেছেন, গ্রীক পুরাকাহিনীকে এইযুগের মানুষের মধ্যে বিন্যাস করেছেন, টলার 'হিঙ্কেমান' লিখেছেন, এলিয়ট কোরাসের আমদানি করেছেন, সেই বিস্তৃতি বাঙালীর নাটকে এ-রকম ক'রে এলো। কিন্তু এটা এলো কেমন ক'রে ?

বাঙলাদেশের যাত্রা ও যাত্রাজ থিয়েটারের কতকগুলো বিশেষ চিহ্ন স্মরণ করা যাক। এখানে কর্ণের সঙ্গে নিয়তি কথা ক'য়ে যায়। বা লৌকিক কাহিনীর মধ্যে রাজা যখন কোনো অন্যায় করতে উত্তেজিত তখন হঠাৎ বিবেক এসে প'ড়ে গান গেয়ে সাবধান ক'রে দেয়। বা নাদীর শাহ দিল্লী ধ্বংস করার পর লালশাড়ী-পরা আলুলায়িত কুন্তলা 'ভারতমাতা' শত

সন্তানের শোকে উন্মাদিনীর মতো হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে নাদির শাহকে অভিশাপ দিয়ে যান। এই-যে লৌকিক ও অলৌকিকের সংমিশ্রণের বৈশিষ্ট্য এটা আর-কোথাও আছে কিনা জানি না, কিন্তু বাঙলায় বিশেষ ক'রেই আছে। এর ফলে নাটক প্রতীকী হয় না, বা ফ্যান্টাসিও হয় না, বরঞ্চ সাধারণ গ্রামবাসীর খুব বাস্তব-প্রতিম সংলাপ থেকে প্রতীকী গভীরতা পর্যন্ত এর সহজ বিস্তার থাকে এবং দেশজ আঙ্গিক গ্রহণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটককে নানান্ বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অবাধ চলাচল করবার সুযোগ দিয়েছেন।

আমাদের দেশের শিল্পবিচারে সাধারণত দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হ'য়ে থাকে। এক, পুরোনো পদ্ধতির অনুকরণে যা-কিছু করা হবে সবই 'আহা মরি'; নয়তো পাশ্চাত্যের কোনো ভঙ্গিমার অনুকরণে হ'লে তবেই প্রশংসাযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি এইরকম সচরাচর মাপের চেয়ে কিঞ্চিৎ বড়ো ছিলো, তাই তিনি পুরোনো দেশজ কাঠামোকে আজকের দিনের প্রয়োজন অনুসারে আরো সুষমামণ্ডিত, আরো শিল্পান্বিত করেছেন। কোনোরকম গোঁড়ামি করেননি। এবং এই দেশজ ফর্মা সঙ্গতভাবে ব্যবহার করতে পারলে এর অপার সুবিধে আছে। কারণ, বহু যুগ যুগান্তর থেকে যে-শিল্পপদ্ধতি আমাদের পিতা পিতামহদের মনের ভাব প্রকাশ ক'রে এসেছে, সেটার আবেদন এখনো আমাদের রক্তের মধ্যে থাকতে বাধ্য। যেমন দেখেছি, হঠাৎ কীর্তনের একটা টুকরো সুর হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীকে কীরকম উৎকর্ণ ক'রে তোলে। হঠাৎ যেন রক্তের গভীরে কোথায় দোলা লাগে। অথচ সেই পুরোনো কীর্তন হয়তো ব'সে শুনতে পারবে না। কিন্তু 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানটি একেবারে অবচেতন স্তরে আবেদন পৌঁছানো।

এতো কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, দেশজ কাঠামোর মধ্যে আত্ম-প্রকাশের চেষ্টাটা যেন পেট্রিয়টিজম্-এর জন্য অভিনন্দিত না-হয়। এর কারণ আরো অনেক গূঢ়, যাকে কড্‌ওয়েল বলেছেন, জাতির অবচেতন স্তরে আবেদন পৌঁছানো।

যাই হোক্ রবীন্দ্রনাথ এইভাবে একই নাটক এবং একই দৃশ্যপট-ভূমিকায় নানান্ স্তরের অন্বয় ঘটিয়েছেন। এবং আজকে এর প্রয়োজনও আছে।

কারণ মানুষের জীবন, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে, আজ এতো স্তরে খণ্ডিত যে সমস্তটা একত্র না-করলে একটা সামগ্রিক রূপ পাওয়া শক্ত। এবং এইরকম একই ছবিতে বিভিন্ন স্তর আনবার চেষ্টা য়ুরোপীয় শিল্পে হয়েছে, কিন্তু তার ফলে স্বাচ্ছন্দ্য আসেনি, আবেদনটা মুখ্যত বুদ্ধিমার্গেই র'য়ে গেছে। অর্থাৎ সাধারণ্যের নেশায় ভালোবাসায় তার আবেদন গৃহীত হয়নি। 'রক্তকরবী'তে রাজা, অধ্যাপক, সর্দার, মোড়ল, পুরাণবাগীশ, — এদের কারোর নাম নেই, উপাধি আছে। অপরদিকে ফাগুলাল, চন্দ্রা, বিশু, গোকুল, -- প্রত্যেকের নিজের নিজের নাম আছে। এরা এক একটা মানুষ ; কিন্তু এই নামওয়ালা আর উপাধিওয়ালার দল এমন বেমালুম মিশে আছে যে কোথাও কো'নো খট্‌কা বাধে না। অধ্যাপক যখন আসে তখন একটুও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এ একজন জলজ্যান্ত অধ্যাপকই বটে। (কেউ কেউ বলেছেন যে, পৃথিবীতে কোনো অধ্যাপক এই ভাষায় কথা বলে না। অতএব এটা অস্বাভাবিক চরিত্র। — এইরকম বিচার 'অ্যালিস্‌ ইন্‌ দি ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডে'র রাণীকেই মানায়। কারণ, শেক্সপীয়রের চরিত্রগুলো যে-ভাষায় কথা বলে সে-ভাষায় কি কেউ আজ পর্যন্ত কথা বলেছে? তবু সেগুলো জীবন্ত চরিত্র। এটা কি কেবল শেক্সপীয়র সাহেব ব'লেই বলা হয়?) এবং এ-ও বোঝা যায় যে বস্তুতত্ত্ববিদ্‌ লোকটি সকলরকম বস্তুর প্রকার ও কার্যকারণ বুঝে যেন কীরকম নিরাশ হ'য়ে পড়েছে, আর তাই নন্দিনীর মতো আচম্‌কা আলো দেখলে সে তার অর্থ করতে পারে না। কিন্তু আকৃষ্ট হয়। আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কিরকম ভীতও হয়।. নন্দিনী পাঁচমুখে রঞ্জনের কথা বলে, অধ্যাপকের তা ভালো লাগে না, সহ্য হয় না, হয়তো ভয়ই হয়। কিন্তু তার আর-একটা মন নন্দিনীকে পরামর্শ দেয় যে সে যেন অন্য জায়গায় পালিয়ে গিয়ে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকে, এই যক্ষপুরীর গ্রহণ-লাগা পুরীতে, সোনার গর্তের রাহুতে যাকে খাব্‌লে খেয়েছে সেখানে যেন ও না-থাকে, সেখান থেকে যেন ও 'পালায়'।

কিন্তু এ ছাড়া আরো গভীর ভয় আছে অধ্যাপকের। নন্দিনী রক্তকরবীর আভরণ পরে কেন? "জানিনে, রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলী ; সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে? — জান, মানুষ না জেনে অমনি ক'রে নিজের ভাগ্য বেছে নেয়।"

'রক্তকরবী' এমন একটি নাটক যার অনেক আশ্চর্য ভাষ্য হয়েছে। এক সময়ে কিছু লোক মনে করেছিলেন যে এটা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লেখা, এবং দু-এক বছর আগে কিছু লোক ভেবেছিলেন (জানি না সেই একইধরনের লোক কিনা) যে এ-নাটক নাকি 'নেহেরু সরকারের' বিরুদ্ধে লেখা, এবং 'বহুরূপী'র অভিনয় সেই কথাই নাকি প্রমাণ করে। মানুষ পাগল হ'লে কতোদূর পাগল হ'তে পারে এটা তারই একটা নিদর্শন।

কিন্তু তাঁদের বিচলিত হবার কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই যুগিয়েছেন। নাটকের শুরুতেই তিনি রাঙা রঙকে দু-একবার খুব স্পষ্ট ক'রেই উপস্থিত করেছেন যাতে ওটা কোনোরকমে ভুল না-হয়। অধ্যাপকের সঙ্গে আছে, আবার অব্যবহিত পরেই গোকুলের মুখেও আছে। নন্দিনী যখন জিজ্ঞাসা করে — "আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন?"

গোকুল — "দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই নির্বোধদের বুঝিয়ে বলিগে, 'সাবধান, সাবধান'।"

সেই একই দৃশ্য, এরই মধ্যে অধ্যাপকও আসে, আবার গোকুলও আসে। রাজার দরজাও সামনে, আবার ফাগুলাল, চন্দ্রা, বিশুও সেইখানে এসে এমনভাবে গল্প করে যেন সেইটাই তাদের বস্তির ঘরের সামনেকার দাওয়া। কারণ, এ-নাটকে বলবার কথা কোনো ব্যক্তিবিশেষের বা সমাজের কোনো শ্রেণীবিশেষের সম্পর্কে নয়, এটা সভ্যতার একটা স্তর সম্পর্কে কবির বিশ্লেষণ। এই গল্পের পরিধি এতো বিরাট যে কোনো একটা বিশেষ জায়গায় এর দৃশ্য সাজিয়ে সমস্ত চরিত্রগুলোকে নানা কলকৌশলে সেই এক জায়গায় আনবার চেষ্টা করলে এর বিস্তৃতিও ক্ষুণ্ণ হ'তো, সুছন্দেরও ব্যাঘাত ঘটতো। তাই সারা শহরটাই এর পটভূমিকা। এবং সে-শহর বিশেষ ক'রে কলকাতা বা বোম্বে বা লণ্ডন বা নিউইয়র্ক বা ফোর্ডের কারখানার শহর নয়। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন —

"ঘটনা-স্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, সে স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ

সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে আরো প্রজ্জ্বল হয়ে উঠত।"

তাই এই যক্ষপুরীর চিহ্নও পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই পাওয়া যায়, এই নাটকের একমাত্র দৃশ্য তাই সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট যক্ষপুরীর।

অবশ্য এমনভাবেও এর দৃশ্য সাজানো যেতো যাতে রাজার দরজা, ফাগুলালের বস্তির দাওয়া, সর্দার ও চিকিৎসকের মন্ত্রণাকক্ষ, বিশু ও নন্দিনীর কথোপকথনের জন্য নিরালা একটা কোণ, সমস্তই টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে একই মঞ্চের উপর এক সঙ্গে দাঁড করানো থাকতো। কিন্তু সেটা বিলেতিআনা হ'তো, তাতে সমগ্র দৃশ্যের ছন্দের বদলে বৈষম্যটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হ'তো, তাই 'বহুরূপী' সে-কাজ করেনি। কারণ রবীন্দ্রনাথ একটা সমগ্র সমাজের চেহারা দিতে চেয়েছেন, এবং তাজার ঝগড়াবিবাদ সত্ত্বেও সমস্তটা মিলে কিন্তু একটাই সমাজ।

সেই সমাজে একজন রাজা আছে। অথচ তাকে 'মুক্তধারা'র বা 'রাজা' নাটকের রাজা ব'লে মনে হয় না। সে থাকে একটা জালের আড়ালে, এবং নন্দিনীর শুরু থেকেই ইচ্ছা যে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে সে মানুষটাকে উদ্ধার করে।

নন্দিনী ডেকে বলে — "দূর থেকে ওই গান শুন্‌তে পাচ্ছ ?" রাজা শুনতে পায় না, বলে — "কিসের গান ?"

নন্দিনী — "পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক।

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে — আয় রে চলে,

আয় আয় আয়।

ডালা যে তোর ভরেছে আজ পাকা ফসলে,

মরি, হায় হায় হায়।"

এ-গানের অর্থ কী ? কেউ কেউ বলেন যে এ হ'লো মাটির ডাক, সোনার লোভ ছেড়ে রাজাকে ধানের মাঠে ডাক দেওয়ার কথা। কিন্তু কথাটা আমাদের ঠিক মনে হয় না, কারণ তাহ'লে 'মাটি তোদের ডাক দিয়েছে' বলতে কি দোষ ছিলো ? আসলে ঠিক ঐ-কথা ব'লেই একটা গান আছে তাঁর আর-একটি নাটকে। তাহ'লে এখানে পৌষ কথাটা জোর ক'রে লাগিয়ে রাখা আছে কেন ? এমন নয় যে পৌষের ওপর একটা বিশেষ

আসক্তি ছিলো কবির এবং তিনি প্রায়ই পৌষকে নিয়ে গান বাঁধতেন। তাহ'লে? — আমাদের মনে হয় এখানে নন্দিনী রাজাকে বলছে যে তোমার পরিশ্রমের ফসল আজ পেকে ডালা ভরিয়ে ফেলেছে, এইবার তুমি বেরিয়ে এসে ছুটি নাও। একটা যুগ শেষ হ'লো, তার ফসল তুলে আবার নতুন যুগের ফসল বোনা হবে, তুমি ঐ মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য ব'লে ছিনিয়ে আনা বন্ধ ক'রে আলোতে বেরিয়ে এসো, পৃথিবী খুশি হ'য়ে উঠুক। কিন্তু রাজা বেঁচে থাকবার জন্যে মরিয়া হ'য়ে আছে, সে টিঁকে থাকবার রহস্য শিখতে চায় কোটরগত ব্যাঙের কাছ থেকে।

গানের এ-অর্থের পক্ষে আরো একটা ছোট্টো যুক্তি আছে। নাটকের শেষে যখন খোদাইকররা কয়েদখানা ভেঙে বিশুকে উদ্ধার ক'রে আনে, যখন বিশু ডাক দিয়ে বলে — "আয়রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্" তখন দূরে আবার এই গান শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু আসন্ন সংঘাতের পরি-প্রেক্ষিতে তার পাঠ গেছে বদলে, সেখানে গান হয় —

ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।

রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা বুদ্ধিমান ও সচেতন শিল্পী মনে করি তাহ'লে কেন তিনি এইসমস্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন তা-ও আমাদের সশ্রদ্ধ হ'য়ে চিন্তা করা উচিত। আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি শেক্সপীয়র তাঁর নাটকে কতো সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছেন, পড়ি চেখভ কেমন ক'রে কিছু না-ব'লেই আঙ্কল ভানিয়ার পুরো পোষাক সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কি বার চারেক জীবনদেবতা ইজ ইকোয়ালটু জীবনদেবতা বললে সব দেনা শোধ হ'য়ে যায়?

এতো কথা বলবার কারণ এই যে, কোনো-এক ডাকসাইটে রবীন্দ্র-ভক্ত আমাকে আমাদের অভিনয়ের ত্রুটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলছিলেন। আমি নতমস্তকে মানতে রাজি ছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাই জানি যে 'যতো সাধ ছিল সাধ্য ছিল না', কিন্তু যখন তিনি বললেন যে কথা না-পাল্টেও সমগ্র 'রক্তকবরী' অভিনয়টা আমরা এমন ফন্দি ক'রে করেছি যে গুরুদেবের নাটকে আমরা যথেচ্ছ অর্থ আরোপ ক'রে দিয়েছি, তখন আমার পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত হ'লো। নানান্ কথার মধ্যে আমি তাঁকে এই গানের পাঠ

বদলের কথাও বললাম। তাতে তিনি খুব সহজেই বললেন — 'এ আপনি মশায় আবার একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ধরছেন, ও-রকম তিনি অনেক উল্টো-পাল্টা লিখেছেন, ও-সবের কোনো মানে নেই।' — আহা, কী অপূর্ব ভক্তির নমুনা!

এবার দেখা যাক রাজা কে বা কী।

রবীন্দ্রনাথের কথায় — "বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত-পা-মুণ্ড অদৃশ্য-ভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে।...আমার স্বল্লায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।"

রাজা বিপুল শক্তিশালী। পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখান থেকে সে শক্তি আহরণ ক'রে আনে। তারপর এমন অনায়াস শক্তিতে সেইগুলোকে চূড়ো ক'রে সাজায় যে দেখে নন্দিনী মুগ্ধ হয়। রাজা বলে — "সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকানো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই।" — সেই সমস্ত ছিন্ন প্রাণের কান্না তার চার পাশে আর্তনাদ ক'রে ওঠে, রাজা অবিচল থাকে।

এই হ'লো রাজা। এই যক্ষপুরীর সৃষ্টিকর্তা। পৃথিবীর বুক চিরে তার ঐশ্বর্য ছিনিয়ে এনে রাজা নিজের প্রতাপ বাড়িয়েছে। বৈজ্ঞানিক শক্তি-বাহুল্যের যোগে তার সেই গ্রহণ করবার, গ্রাস করবার ক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে গেছে।

এই সৃষ্টিকর্তা কে? যে আজ পৃথিবীময় স্টীলের কাঠামোয় বড়ো বড়ো নগর তৈরী করেছে সেই বিজ্ঞানীই হচ্ছে এর সৃষ্টিকর্তা। এই সৃষ্টির প্রত্যেকটা নগরই যক্ষপুরীর চেহারা বহন করে। এর ওপরকার দর্পিত চেহারা যতো বেড়ে ওঠে ততোই এর ভার বহন করবার জন্যে অজস্র ছোটোদের বলি দিতে হয়। ছোটোগুলো হ'তে থাকে ছাই, আর বড়োটার জ্বলতে থাকে শিখা। এই শিখার প্রদীপ্ত জ্বলার জন্যে চাই পৃথিবীর বুক হাতড়ে হাতড়ে 'র মেটিরিয়াল্' খুঁড়ে আনা। আর তাই বিজ্ঞান অজস্র মকরমুখ তৈরী করেছে যেখানে গ্রামের পঞ্চবটী ছায়ার মানুষদের এনে তাদের মাংসমজ্জা মনপ্রাণ সমস্ত নিঃশেষ ক'রে নিংড়ে নেওয়া হচ্ছে। অথচ বিজ্ঞান

ঠিক এটা চায়নি। চায়নি, কিন্তু আজ পথও পাচ্ছে না। আর তাই ছটফট করছে।

এ-যুগ হ'লো লোহার যুগ, সেই লোহার বনিয়াদেই আজকের দিনের বিপুল যান্ত্রিক সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে, এবং গ'ড়ে উঠেছে বিজ্ঞানীর শক্তিতে। কিন্তু এই বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ নেই, সাধারণ সমাজের সুবিধের জন্য এর শক্তিকে লাগানো হয় না, তাই রাজা একটা জালের আড়ালে থাকে। সে-জাল সে নিজে রচনা করেনি। নন্দিনী বলে — "তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না?" এই সত্যকথার স্পষ্টতা রাজার সহ্য হয় না, ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলে — "কী বলছ, নন্দিনী।" আভাসে বোঝা যায় এই জাল রচনা করেছে সর্দার। ইংরেজি অনুবাদে এই সর্দারের নাম দেওয়া আছে গভর্ণর। অর্থাৎ যাঁরা শাসনকর্তা। তাঁরাই রাজাকে জালের আড়ালে রেখে রাজার শক্তির সাহায্যে যক্ষপুরীর শাসন-কার্য পরিচালনা করেন। শেষ মুহূর্তে রাজা সেটা বুঝতে পারে যখন দেখে সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে, বলে — "আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।" তাই রাজাকে সাধারণ লোকের সঙ্গেই সর্দারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ছুটতে হয়। কিন্তু নাটকের প্রথম দিকে রাজা নিজের এ-অবস্থা জানে না। তখন তার মনে পড়ছে একটা পাহাড়ের কথা যাকে দেখে তার মনে হয়েছিলো "শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে।" মনে হয়েছে যে, শক্তি যতোই বাড়াই যৌবনে পৌঁছুলো না। আরো মনে হয়েছে যে, যে-দান বিধাতার হাতের মুঠোর মধ্যে ঢাকা সেখানে নন্দিনীর চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতোটুকু পৌঁছয়, তার নিজের সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়েও যায় না।

বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এই স্ববিরোধ অবশ্যম্ভাবী। নন্দিনী যখন বলে — "মনে হয়, যে জিনিষটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার পরে তোমার দরদ নেই।" রাজা স্বীকার করে, কেমন ম্রিয়মান হ'য়ে বলে — "তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি।" এইখানেই তার দুর্বলতা, আর এই দুর্বলতার জন্যই মাটির ওপর ঘাসের মধ্যে, ফুলের মধ্যে যে-জাদুর খেলা আছে তাকে আপন করতে

পারে না। তাই তার মনে হয় যে, রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে সে ছাড়া রেখেই নন্দিনীকে বাঁধতে পারতো।

অথচ যৌবন তার নিশ্চয় একদিন ছিলো, নইলে কিসের শক্তিতে সে এতো বড়ো যক্ষপুরীকে সৃষ্টি করতে পারলো, এবং কীজন্যই-বা নন্দিনীর মতো মেয়ে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়। সুতরাং যৌবন তার ছিলো, এবং এখনো সে শক্তিধর, কিন্তু প্রাণের অভাবে একটা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। সেই প্রাণ সে চায় নন্দিনীর কাছে, কারণ নন্দিনী হ'লো প্রাণময়ী। অথচ নন্দিনী যখন দরজা খুলে দিতে বলে, বাইরে চ'লে আসতে বলে, তখন সে-ডাকও সে মানতে পারে না। এবং নাটকের শেষে নিজের অজান্তে রঞ্জনকে মেরে ফেলার পর নিজের কীর্তি দেখে আর্তনাদ ক'রে ওঠে — "আমি যৌবনকে মেরেছি — এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।" খালি রাজারই যৌবনের অভাব নয়, এ-রাজ্যের সকল কোণ থেকেই যেন যৌবন অপহৃত হয়েছে। তাই নন্দিনী চায় যে রঞ্জন একবার এই পাষাণপুরীতে আসুক। তাই এই যক্ষপুরীতে ব'সে সে রঞ্জনের প্রতীক্ষা করছে।

রঞ্জন দুই হাতে দুই দাঁড় ধ'রে তাকে তুফানের নদী পার ক'রে দেয়, নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, নন্দিনীকে নিয়েও সে তেমনি তোলপাড় করে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ ক'রে সে হার জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই সে নন্দিনীকে জিতে নিয়েছে।

এই তো যৌবনের কাজ, প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ ক'রেই তো সে বাজি খেলে, আর সেই খেলাতেই জীবনকে সে জিতে নেয়। রঞ্জন সেই যৌবনের প্রতিমূর্তি, আর তার সেই জিতে-নেওয়া যে-বধূ সে হ'লো প্রাণের, জীবনের প্রতীক, সেই হ'লো নন্দিনী। তাই এই যক্ষপুরীর মরন্ত পরিবেশের মধ্যে একলা ব'সে প্রাণ যৌবনের প্রতীক্ষা করে।

বিশুও একদিন সেই বাজি খেলার ভিড়ের মধ্যে ছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকতে পারেনি, তাই অধঃপতনের শেষ সীমায় গিয়ে চর পর্যন্ত হয়েছিলো। পরে সেইখানে সম্বিৎ পেয়ে মেকি সম্মান আর আরাম খুইয়ে সে আবার প্রাণের টানে ফিরে এলো। তাই তার কথা, গান, সেই প্রাণকে পণ ক'রে বাজি খেলতে না-পারার অক্ষমতার দুঃখে ভারাক্রান্ত।

কিন্তু প্রাণের আবেদন এমন গভীর যে বিশু সত্যকথার জন্য নির্যাতন সহ্য করে, সেই নির্যাতনেই তার আত্মার মুক্তি হয়। যে একদিন ভয় পেয়েছিলো, সে আর-একদিন সকলকে ডাক দিয়ে বলে — "আয়রে ভাই, লড়াইয়ে চল।"

এই প্রাণের টানে কিশোর প্রাণ দিতে চায়, অধ্যাপক আকৃষ্ট হয়, রাজা ছটফট করে, এমন-কি সর্দারের চোখেও রক্তকরবীর মোহ লাগে। অথচ এর কেউ পরিপূর্ণ যৌবন নয়, তাই নন্দিনী অপেক্ষা করে রঞ্জনের।

রঞ্জন এলো, কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। নন্দিনী বলে — "ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ওই দেখো, এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে।" ফাগুলাল বোঝে না যে রঞ্জন এসে তাদের সকলের মধ্যে চারিয়ে গেছে তাই সে আর্তনাদ ক'রে ওঠে — "সর্বনাশ ! ওই কি রঞ্জন ! নিঃশব্দে পড়ে আছে।" নন্দিনী বলে "নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুন্‌তে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে — ও কখনো মরতে পারে না।" আবার বলে — "ও আসবে ব'লে অপেক্ষা করেছিলুম, ও তো এলো। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হবো, ও আবার আসবে।"

যুগ যুগ ধ'রে প্রাণ এমনি ক'রেই অপেক্ষা করে, কখন তার দয়িত সেই প্রচণ্ড যৌবন দুই হাতে দুই দাঁড় ধ'রে তাকে তুফানের নদী পার ক'রে দেবে, প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ ক'রে তাকে সম্পূর্ণ ক'রে জিতে নেবে। কারণ, এ-জিনিস বলহীনের লভ্য নয়।

কিন্তু এ-রকমভাবে বিশ্লেষণের একটা বিপদ আছে, অনেক মানুষ অত্যন্ত অনায়াসে ভুলে যায় যে এইসমস্ত চরিত্রের একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপও আছে। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনীকে ঈথার আরোহিনী কল্পলোকবাসিনী প্রায় বিদেহিনী এক আইডিয়া ধ'রে নেন। এবং এতেই যতো মুশকিল হয়। আইডিয়া তো বটেই, কিন্তু কেবল আইডিয়া নয়। শুনেছি রবীন্দ্রনাথকে কোনো বিদেশীয় বলেন যে তাঁর চরিত্রগুলো বাস্তব নয়, ওগুলো কাল্পনিকই। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে নাকি বলেছিলেন যে, লেডি ম্যাকবেথ যদি বাস্তব হয় তো আমার চরিত্রগুলোও বাস্তব। — এ-সব কথা চালাকি ক'রে বলা নয় নিশ্চয়।

তাই নন্দিনী যে কোন্ স্তরের মেয়ে তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে নাটকে। ফাগুলাল বলে — "নন্দিন, ভালো বুঝতে পারছিনে। আমরা সরল মানুষ, দয়া করো, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে"।

নন্দিনী সেই ঘরেরই মেয়ে যাদের এখনও ব্যক্তিগত নাম আছে। সর্দাররা মোড়লরা তাদের সংখ্যারূপে দ্যাখে, তাদের পিঠের কাপড়েও দেগে দিয়েছে তাদের নম্বর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাদের নাম দিয়েছেন, আর কেবল উপাধি দিয়েছেন সেই সর্দার মোড়লদের। তিনি চিরকাল মানুষের উপর আস্থা রেখে গেছেন, এবং তাই ইতিহাস যাদের ওপর নির্ভর করছে, মহাকালের রথের রশি যে-অবজ্ঞাতদের হাতের টানেই আজ চলবার সময় এলো, তাদের তিনি সুস্পষ্ট ব্যক্তিক নাম দিয়েছেন, এবং নন্দিনী তাদেরই ঘরের একজন মেয়ে। একজনই মেয়ে, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের যে-প্রেরণা তা অনেক মেয়েরই। এবং সেই মেয়ে যে-যৌবনের গলায় মালা দিয়েছে সে এই যক্ষপুরীতে এসেই বলে —"হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।"

গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি, সে অমনি হো হো ক'রে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে — "গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোস, আমি তাই খসাতে এসেছি।" যৌবনের এই চেহারা আমাদের চেনা চেহারা, বারে-বারে অচলায়তন ভাঙতে এদেরই অভ্যুত্থান হয় ইতিহাসে। তাদের কাজের রীতি হ'লো গান গেয়ে। কারণ তারা কাজের মধ্যে আনন্দকে উপলব্ধি করে, কাজ তো তাদের পক্ষে বন্ধন নয়, মুক্তি। কিন্তু এই সমাজের সর্দার-মোড়লদের কাছে হাসিটাই সবচেয়ে অপছন্দের, এখানে ছোটোবাবুর ওপরে বড়োবাবু, বড়োবাবুর ওপরে ছোটো সাহেব, ছোটো সাহেবের ওপরে বড়ো সাহেব, তার ওপরে আরও বড়ো সাহেব, — সহজ প্রাণকে নিষ্পিষ্ট ক'রে গাম্ভীর্যের মুখোসের কী অপার সমারোহ, এখানে মুক্ত প্রাণের হাসি শুনলেই সকলে চমকে ওঠে, সন্দেহ করে, ক্রুদ্ধ হয়।

কিন্তু এই হাস্যমুখ যৌবনের দূত রঞ্জনের দল দেখতে দেখতে ভারি হ'য়ে ওঠে। এমন-কি, সর্দারদের দলেও কিছু লোক থাকে যেমন মেজো সর্দার, যারা রঞ্জনকে বুঝতে পারে, যারা নন্দিনীকে প্রশ্রয় দেয়, কারণ, তাদের

রক্তের সঙ্গে সর্দারির রক্তের মিল হয়নি। আর ঠিক সেই কারণেই বড়ো সর্দারদের চোখের রক্তিমা ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতর হ'য়ে ওঠে।

এই-যে মিলন, সাধারণ ও বিশিষ্টের, যাকে ইংরেজিতে বলা হয়, type and the particular, এর চেষ্টা সকল মহৎ শিল্পীর মধ্যেই থাকে। য়ুরোপ বস্তুকে যেমন দ্যাখে তেমনিভাবে দেখিয়েই তার অন্তর্লীন অর্থ প্রকাশ করতে প্রয়াস পায়। আর চীনে জাপানে ভারতে যেন বস্তুকে মনের মধ্যে আত্মসাৎ ক'রে পরে তাকে এমন এক রূপে প্রকাশ করা হয় যার মধ্যে তার বস্তুরূপ ও অন্তর্লীন অর্থ দুই-ই আর-একরকম ক'রে প্রকাশ পায়, যার মধ্যে একটা সমাহিতি আছে। তার ফলে য়ুরোপীয় প্রকাশভঙ্গীতে বস্তুরূপের যে-প্রখরতা, যে-নগ্নতা, যে-সংঘাত প্রকাশ পায়, ভারতীয় ভঙ্গীতে তা অনুপস্থিত, এখানে শিল্পীর কারুণ্য সমস্ত বস্তুর নগ্নতা মুছিয়ে নিয়ে একটা সমাহিত শুদ্ধচিত্ততার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এবং এরই ফলে জীবনের নাটকীয় সংঘাত য়ুরোপের পুরাযুগের লেখার থেকেই যেমন ক'রে প্রকাশ পেয়েছে, আমাদের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে তা নেই। এমন-কি তারই জন্যে আমাদের মনে হয় আমাদের দেশে তেলের রঙের সার্থক সৃষ্টি আজও সম্ভব হয়নি। আমাদের মন টেম্পেরায় প্রকাশ পায়। তার নিবিড় উপলব্ধি, তার সমাহিত দৃষ্টিকোণ। এবং এরই কিছু মিল আছে জলের রঙের সঙ্গে, তাই জলের রঙের এতো বহুল প্রয়াস হয়েছে, কিন্তু তেলের রঙের মধ্যে যে-নাটকীয়তা, যে-সংঘাত প্রকাশ পায় তা আমরা প্রকাশ করতে পারিনি। প্রকাশ করতে গেলে আমূল বিদেশীয়দের অনুকরণেই করতে হয়েছে, ভারতীয় ভঙ্গীতে যেমন টেম্পেরা হয়, যেমন জলের রঙের ছবি হয়, তেমন ভঙ্গীতে কোনো তেলের রঙের প্রকাশ আজও সম্বদ্ধ হয়নি দেশের শিল্প-প্রবাহে।

ঠিক এইভাবে নাটকীয় প্রকাশের ভঙ্গিমা দেশী নাটকের মধ্যে না-পাওয়ায় আমরা বিদেশী নাটকের অনুকরণ করেছি। আমাদের পূর্বের যাত্রায় নাটকীয় সংঘাত বা অভিনয়ের চাইতে জুড়ির গানের বিস্তার ছিলো বেশী। কেউ যদি কৃষ্ণযাত্রা দেখে থাকেন, তিনিও জানবেন যে তার রসও নাটকীয় রস ছিলো না। এ-সবের মুখ্য আবেদন ছিলো কাব্যের, নাটকীয়তার নয়।

তাই য়ুরোপীয় প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে বাস্তব-প্রতিম নগ্নতা আছে,

ভারতীয় রীতিতে তা নেই। ফলে তদানীন্তন জীবনের টীকা হওয়ার বদলে বহু ক্ষেত্রেই আমাদের নানারকম যাত্রা বা রামলীলা অনড় কথিকায় আবদ্ধ একটা আঙ্গিক সর্বস্ব জোলো ব্যাপারে পরিণত হ'য়ে গেছে। বস্তু ও শিল্পীর এই দূরত্ব অনেক ক্ষেত্রে বস্তুর প্রতি শিল্পীর ঔদাসীন্য সূচিত করেছে, ফলে সমসাময়িককালের বস্তুজগৎ বা জড়জগৎ সম্পর্কেই ঔদাসীন্য এসেছে। যে-শিল্প তার সমসাময়িককালকে ধরতে ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা না-করে, সে-শিল্প জীবন্ত নয়। অপরদিকে য়ুরোপে এই বস্তুরূপটাই এঁতো প্রবল হ'য়ে ওঠে যে তার অন্তর্লীন সুরটা অস্পষ্ট হ'য়ে যায়। তাই শুরু হ'য়ে যায় বিদ্রোহ, শুরু হয় ইম্প্রেশনিজম্ থেকে স্যুররিয়লিজম্-এর আন্দোলন।

এখানে একটা কথা আবার স্পষ্ট করা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে যে শিল্পীর তার বিষয়ের প্রতি যে-দৃষ্টিভঙ্গী, তারই মূলে একটা ভেদ হ'য়ে গেছে এই দুই মহাদেশে। এটা ভাস্কর্যে চিত্রে গানে বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কোথায় কোণারক আর কোথায় এলিফান্টা, আর কোথায় হায়দারাবাদ। এ-সব শিল্পীকে শেখানোর জন্যে নিশ্চয়ই একটা বাঁধাধরা ইস্কুল ছিলো না, তবু তারা সবাই কী ক'রে একইভাবে ভাবলেন? আবার য়ুরোপে ভোরের সঙ্গীত সৃষ্টি করতে হ'লে আলাদা আলাদা ক'রে ভোরের আওয়াজ সুরের পর্দায় অনুবাদ ক'রে তারই মিলিত সঙ্গীতে ভোরকে প্রকাশ করা হয়েছে। আর আমাদের এখানে কয়েকটি পর্দার বিশেষ সঞ্চরণে একটি সুর সৃষ্টি করা হয়, যা ভোরের অন্তর্নিহিত ভাবটা প্রকাশ করে। এর মধ্যে কোনো নিন্দা প্রশংসার বাতুলতা নেই আমার। এটা খালি নিজেকে বোঝাবার প্রয়াস। এবং সেই প্রয়াসে দেখি যে য়ুরোপীয় শিল্পীর বিদ্রোহ কী প্রয়োজনীয়, কিন্তু আমার থেকে কতো পৃথক্!

নাটক আবার এমন বস্তু যেখানে পাত্র-পাত্রীর কথা দিয়েই সমগ্র ভাব প্রকাশ করতে হবে। ঔপন্যাসিকের মতো নিজের কথা বা নিজের টীকা দিয়ে কোনো জিনিস বুঝিয়ে দেবার সুযোগ নেই। যা-কিছু প্রকাশ পাবে তা কেবল ঘটনা ও নানা মনের ওপর সেই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই প্রকাশ পাওয়াতে হবে। এবং চরিত্রগুলোকে যদি খুব বাস্তব — যাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে 'দেখ্‌তা-সত্যি' ক'রে গ'ড়ে তুলতে হয় তাহ'লে তার দৈনন্দিন চেহারাটাই প্রকাশ করতে প্রয়াস পেতে হয়। এবং শতকরা নিরানব্বইটা

দিনের শতকরা নিরানব্বইটা ঘটনা তো এমন বড়ো কিছুই নয় যাতে চরিত্রটার আমূল উন্মথিত হ'তে পারে, বা জীবনের মূল সত্য সম্বন্ধে গভীর আলোচনা চলতে পারে। কাজেকাজেই চরিত্রগুলোর বাস্তবতা রক্ষা করতে গিয়ে নাট্যকারের বড়ো কথায় বা আসল কথায় গিয়ে পৌঁছুতে দেরী হ'য়ে যায়। অর্থাৎ উপকরণের রূপটাই বড়ো হ'য়ে ওঠে, তাদের অন্তর্লীন যে-বক্তব্য আছে সেটা যথেষ্ট সুযোগ পায় না। কাজেকাজেই বর্নার্ড শ তাঁর বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন, চরিত্রগুলোর দৈনন্দিন স্বাভাবিকত্বকে নয়। ফলে, লোকে বলে, সেগুলো মানুষ নয়, মুখপাত্র মাত্র।

আর-একরকমের চেষ্টা হয়েছে। যেমন ধরুন ও'নীল থেকে মিলার পর্যন্ত। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হয় কি, যে, যেমন চরিত্রটা বিশেষ থেকে সাধারণের পর্যায়ে আসে অমনি একটা চিড় খায়, এবং এই দুটো স্তর বেমালুম মেশে না। এইসব কথা বলবার অর্থ এই নয় যে, ও'নীল ইত্যাদির প্রচেষ্টাকে আমি নস্যাৎ ক'রে দিচ্ছি। কথাটা হচ্ছে যে, দুই ধার থেকে মানুষ চেষ্টা করছে, একই সুছন্দে পৌঁছতে। যেমন ধরুন, আধুনিক নাটক *Death of a Salesman*-এর বক্তব্য আমাকে অনুপ্রেরণা না-দিলেও ওর প্রকাশভঙ্গিমা আমাকে মুগ্ধ করেছে, এর মধ্যেও সেই সঞ্চরণ ক্ষমতা অপূর্বভাবেই প্রকাশ পেয়েছে, এর মধ্যেও সেই নেশা তৈরী করার উপাদান আছে যা নাট্যকলার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু তবু ও-পথ আমার নয়। ও'নীল থেকে আধুনিক মার্কিনী নাট্যকারদের লেখার মধ্যে যে-নগ্নতা, যে দগদগে ভাব আছে তা আমার দেশের ছবি গান জীবনবোধ কিছুরই পরিণতিতে আসে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জর্মান জনসাধারণ এমন মনোভাবাপন্ন হয়েছিলো যে *Cabinet of Dr. Caligari*, বা *Dr. Mabuse* বা ঐ-রকম আরো অজস্র অসুস্থ উত্তেজনার আবর্তনময় চলচ্চিত্রের জন্ম সম্ভব হয়েছিলো, কিন্তু আমাদের দেশে হাজার দুঃখকষ্টের মধ্যেও এখনো তা সম্ভব নয়। এবং আমাদের দেশের নাটক আমাদের দেশের লোকের মনের গভীর ক্ষিদে মেটাতেই তৈরী হবে।

আমরা যদি আমাদের কুসংস্কারগুলোর হাত এড়িয়ে একটু ধীরভাবে ভাবি তাহ'লে দেখতে পাবো যে রবীন্দ্রনাথের নাটকে জোড়গুলো বেমালুম মেলানো, এবং হৃদয় ও বুদ্ধি উভয়েরই আবেদনের একটা সাম্য আছে।

আমার দেখা গ্রামের যাত্রায় আমি গল্পের মধ্যে এইরকম জ্ঞানের কথার সুন্দর সংমিশ্রণ দেখেছি, খালি দোষের মধ্যে এই যে, সে-জ্ঞান রামায়ণ মহাভারতের কালের জ্ঞান, তাতে আজকের জগৎ বুঝতে ভালো ক'রে সাহায্য ক'রে না। রবীন্দ্রনাথ সেই কাজটাই করেছেন। আমার মনে হয় অদ্ভুতভাবে করেছেন, যদি কারোর মতে তিনি তা না-ক'রে থাকেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই, খালি এইটুকু অনুরোধ যে এইবার নতুন লোকের আরো ভালো ক'রে কাজটা করবার দায়িত্ব এসেছে, রবীন্দ্রনাথের এই একাকীত্ব ঘুচিয়ে নতুন 'বাঙালী' নাটকের যুগ আরম্ভ করবার সময় এসেছে।

আর-একটা কথা লক্ষ করতে ব'লে আমার এ-প্রবন্ধ আমি শেষ করবো। সময়টাকে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী'তে যথেচ্ছ খেলেছেন, অথচ সেটা পীড়া দেয় না। প্রথমটায় কিশোর যখন আসে তখন মনে হয় সকাল বেলা, কাজে যাবার সময়। পরে ফাগুলাল বলে আজ ছুটির দিন। আবার তারও পরে বিশু কাজে যেতে চায়, নন্দিনী বাধা দেয়। অর্থাৎ এ-সব একই দিনে জোর-ক'রে-ঘটানো ঘটনাপুঞ্জ নয়, অনেকদিন থেকে টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনা এনে এমন ক'রে এক সঙ্গে সাজানো হয়েছে যে সেই ঘটনাস্রোত প্রত্যক্ষ করা যায়, যার ফলে — 'ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে' অনিবার্য হ'য়ে উঠলো।

এ-প্রবন্ধ লেখায় আমার স্পর্দ্ধা প্রকাশ পেয়েছে নিঃসন্দেহ, তবু এ না-লিখেও আমার উপায় ছিলো না। কারণ আমাদের পশ্চাদ্‌পট ও আমাদের আবেগের চেহারা স্পষ্ট না-বুঝলে আমাদের মনমতো নাট্যসম্ভার আমরা সৃষ্টি করতে পারবো না। আমাদের নাটক যেন আমাদের আবেগের ও অনুভূতির সর্বাঙ্গীন প্রকাশের মাধ্যম হয়। যে-নাটকে আমাদের মৌখিক ভাষা ও চিন্তার ভাষা এক হ'য়ে মিলে যাবে, যেখানে আমাদের 'দেখ্‌তা-সত্যি' ও আকাশছোঁয়া স্বপ্ন একই নাটকে প্রকাশ পাবে।

এবং সেই নাটক না-পেলে আমাদের অভিনেতাদের উদ্ধার নেই।

'রক্তকরবী'তে সঙ্গীত প্রয়োগ

'চার অধ্যায়' অভিনয়ে প্রথম ও শেষ অধ্যায়ের শেষে একটু সুরের দরকার ছিলো যার শীর্ষবিন্দুতে 'বন্দেমাতরম' কথাটি জিগির দেওয়ার মতো আসবে। সে-সুর রচনা করেছিলেন শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস। এ ছাড়া আবহ সৃষ্টি করার জন্যে কখনো ঝড়ের শব্দ, কখনো কুকুরের ডাক, কখনো গির্জার ঘড়ির আওয়াজ ব্যবহার করা হয়েছিলো। কিন্তু 'রক্তকরবী' প্রযোজনার সময়ে মনে হ'লো এখানে সুরের প্রয়োজন অনেক বেশী, অথচ চিরাচরিত যে-পথে আবহসঙ্গীতের সুরারোপ করা হ'য়ে থাকে সে-পদ্ধতি এ-নাট্যে খাপ খাবে না। অর্থাৎ কেবল কারখানা বা খনির বাস্তব আওয়াজে যেমন এর কাব্যকে ধরা যাবে না, তেমনি সাধারণ নিয়মের 'আবহসঙ্গীতে' এর বাস্তব রূপটি হারিয়ে যাবে। তাই দরকার ছিলো এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর, এক অনন্য বোধশক্তির যার মধ্যে সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় গভীরভাবে অনুভূত। সেই অনন্য বোধশক্তির প্রমাণ আছে শ্রী খালেদ চৌধুরীর সুরের সৃষ্টিতে।

নাট্যের শুরু হয় একা নন্দিনীকে নিয়ে। সে মঞ্চের ওপর একটা চবুতরায় ব'সে ফুলের মালা গাঁথছে। এইখানে এমন একটা-কিছুর দরকার হ'লো যাতে নাটকের একটা মানে প্রকাশ পায়। কল্পনা হ'লো যে এই যক্ষপুরীতে সুরকে খণ্ডিত ক'রে বেসুরের প্রতাপ। খালেদ চৌধুরী টিউনিং ফর্ক নিয়ে বেরুলেন পুরোনো লোহালক্কড়ের দোকানে খোঁজ করতে। যোগাড় করলেন গোটাকতক ভাঙা লোহার পাত। যেগুলো আলাদা পর্দায় বাজবে। সেই বাজানোর ছন্দে মাঝে মাঝে নাকাড়ার উপর ঝাঁটা মেরে, কাঠের টুকরোর ওপর মেরে, একসঙ্গে একটা যন্ত্রের আওয়াজ তৈরী হ'লো। তারপর সেই বাজনাটা মেলানো হ'লো বাঁশীর সঙ্গে। বাঁশীর আওয়াজ অব্যবহৃত জীবনের উৎসারিত সুরের মতো, আর অপর আওয়াজ-গুলো যেন যান্ত্রিক জীবনের বেসুরত্ব। সে কেবলি বাঁশীর আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। বললে বা লিখলে মনে হয় এটা যেন থিয়োরী-প্রধান,

কিন্তু 'রক্তকরবী' নাট্যের শুরুটা যাঁর মনে আছে তিনিই জানবেন এটা একটা অদ্ভুত সুরসৃষ্টি। অথচ সেখানে একটা বাঁশী ছাড়া আর কোনো 'বাদ্যযন্ত্র' ছিলো না।

এইরকম উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় শ্রী খালেদ চৌধুরী 'রক্তকরবী'র পরতে পরতে দিয়েছেন। যেমন, সর্দারণীরা ধ্বজাপূজায় চলেছে। নেপথ্যে। অথচ তাকে স্পষ্ট ক'রে তুলতে হবে দর্শকদের কাছে। ছুতোরকে দিয়ে কাঠের টুকরোর ভিতরটা কুরে কুরে আলাদা আলাদা সুরে বেঁধে এক প্রস্থ বাদ্যযন্ত্র তৈরী হ'লো, আমাদের মধ্যে তার নাম হ'য়ে গেলো 'কাট্টুকুটুম'। তার সঙ্গে উৎসবের সময়ে ঘোড়ার গলায় যে ঘন্টির হার পরানো হয় সেটা এসে যোগ দিলো। যোগ দিলো নাকাড়া। সমস্ত মিলিয়ে সে এমন একটা অনন্যপূর্ব সুরসৃষ্টি যার তুলনা পাওয়া শক্ত। এইধরনের কাজ হয়েছিলো শ্রী উদয়শঙ্করের 'লেবার অ্যাণ্ড মেশিনারী' নাচে। কিন্তু 'বহুরূপী'তে, যেখানে বাজিয়ে নিয়োগ করা সম্ভব নয় পয়সার অভাবে, যেখানে ইচ্ছামতো যন্ত্র কেনা সম্ভব নয় ঐ একই অভাবে, সেখানে সেই বাধাকে অতিক্রম করার এমন অপূর্ব নিদর্শন আর আছে কিনা আমি জানি না। একটা ভাঙা ব্যাঞ্জোর খোলে দোতারা বানিয়ে এমন একটা যন্ত্র করলো যার আওয়াজটা চেনার মতো লাগে অথচ অচেনা মনে হয়। দলের লোকেরা তার নাম দিয়েছিলো 'ব্যান-তারা'। তারপর সেটা একদিন দিল্লী স্টেশনে হারিয়ে যেতে সকলের কি দুঃখ।

নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে অনেক সময়ে চেনা যন্ত্রের চেনা আওয়াজে মন বিশ্লিষ্ট হয়। তাই এইরকম নতুন যন্ত্র বানানোর প্রয়োজন খুব পড়ে। কিন্তু কেবল সেইটাই খালেদ চৌধুরীর কীর্তিসীমা নয়। মনে করা যাক্, 'রক্তকরবী'তে রাজার এঁটোদের দৃশ্য। সেখানে মোটা শেকলের আওয়াজ আছে, 'ঘড়ঘড়ি' ব'লে একটা যন্ত্র বানানো হয়েছিলো, সেটা বাজে, তার ওপর ঝাঁঝ নাকাড়া ও বাঁশী বাজে। এবং প্রত্যেকবার নন্দিনীর 'বিশুপাগল, পাগল ভাই' ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে চড়া পর্দার বাঁশী সেই আর্তনাদকে সুরে তোলে। সমস্ত মিলিয়ে সে এমন একটা সঙ্গীত সৃষ্টি হয় ঐ-সময়টা মঞ্চের ওপর, যার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা প্রত্যেক দিন আমাকে যেন কীরকম অস্থির ক'রে তোলে। নাট্যের সঙ্গীত

যে সমগ্র নাট্যের মধ্যে অঙ্গীভূত, যেখানে মঞ্চের ক্রিয়ার সঙ্গে সে এমনভাবে জড়িত যে রং আলো কথা সুর সব মিলিয়ে একটা অখণ্ড সত্তা পায়। সেই নিটোল সময় তৈরী হয় 'রক্তকরবী'র বেশ কয়েক জায়গায়।

ব্যবসায়িক জগতে 'সাসপেন্স মিউজিক' ব'লে একটা কথা আছে। তার একটা বাঁধা গৎ-ও আছে। আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে 'নবান্ন'র শুরুতেও সেই গৎ বেজেছিলো আচরিত প্রথা হিসেবে। অর্থাৎ তারও আগে এর জন্ম ও স্বীকৃতি। অথচ 'রক্তকরবী'র মধ্যেও একটা উৎকণ্ঠা-জাগানো দৃশ্য আছে, যখন অন্ধকার মঞ্চে ধীরে ধীরে একটা লাল মেঘের ছায়া ভেসে ওঠে। তখন একটা সুর বাজে নাকাড়ার গম্ভীর বিলম্বিত তালের সঙ্গে। দুটি বাঁশী (একই লোকের হাতে), খালেদ চৌধুরীর নিজের হাতে বেহালা, আর-একজন একটা ঝাঁঝ নিয়ে। এই সুরেরই পরিবেশে বিভ্রান্ত নন্দিনী একা প্রবেশ করে — "দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল। ওই কি আমাদের মিলনের রঙ" ইত্যাদি।

এই সময়টুকুতে যে-সুর সৃষ্টি হয় তাতে জানা বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহৃত হয়। অতি অল্প শব্দের মধ্যে, বাজনাগুলো বাজে, ছেড়ে ছেড়ে। নাকাড়ার গুম্‌গুম্ শব্দ বিলম্বিত তালটা রাখে। আর নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলো বাজনার অংশ হ'য়ে ওঠে। একটা জটিল মূড্ তৈরী হয় শ্রোতাদের মনে। অতি অল্প যন্ত্র, অতি অল্প শব্দ, কয়েকটা সাঙ্গীতিক phrase। তাতেই যেন নৈঃশব্দ্য শব্দের অঙ্গীভূত হয়। মনে হয়, কী একটা যেন হ'তে চলেছে। এবং সে-অনুভবটাও জটিল।

আবার যখন বাহীরা নৈবেদ্য মদ পোষাক ইত্যাদি ব'য়ে নিয়ে চলেছে তখন সকলের মধ্যে যে-ত্রাসের প্রকাশ আছে সেটা স্পষ্ট করতো খালেদ চৌধুরীর বেহালা। সকলের অন্তর যে কাঁপছে এইটা যেন মঞ্চের কথা-বার্তা চলাফেরার পিছনে থরথর করতো। সেই দ্রুত ছোটো ছোটো স্ট্রোকের ক্রোম্যাটিক স্বরের বাজনা বদলে যেতো লম্বা উদ্ধত টানে, যখন নন্দিনী ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো রাজার দরজার ওপর। ঐ-সময়টুকু খালেদ চৌধুরীর 'ম্যাজ্জিনী' বেহালার বাজনা শোনবার মতো ছিলো। এখন অনেকদিনই আর সে বাজায় না। অবশ্য এ-কথা বলা উচিত যে শ্রী অসীম ব্যানার্জী তাঁর বাঁশীতে সেই কাঠামো অনুসরণ ক'রে ঐ-জায়গাটা এখন পূরণ করেন। কিন্তু ঐ-জায়গাটা একটা সৃষ্টি ছিলো।

আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এতো বিশৃঙ্খল অবস্থা যে এই-সব অনন্য সৃষ্টির কোনো দলিল রাখা হয় না। ঐ যতোটুকুই হাতে হাতে পাওয়া গেলো। তারপর ম'রে গেলে হয়তো দানসাগর করা হয়। কেউ হয়তো সত্যমিথ্যায় গোঁজামিল দিয়ে একটা মোটা অর্থ প্রমাণ ক'রে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টরেট পাবেন। কিন্তু নাট্যের মধ্যে বাজনার ব্যবহার যে কতো মুক্ত হ'তে পারে, এবং হ'লে তার ফল কী হয় তার প্রমাণ আছে 'রক্তকরবী'তে, 'স্বর্গীয় প্রহসন'-এ।

কিন্তু আমি কেবল ঘনিষ্ঠভাবে বলতে পারি 'রক্তকরবী' সম্পর্কে। এবং নাট্যে শব্দের ব্যবহার কোথায় সাঙ্গীতিক হয়, সে-সম্বন্ধে আমাদের অনুভবের ভিত্তি এক ব'লে শ্রী খালেদ চৌধুরীর এই অচলিত পদ্ধতি আমার কাছে সবচেয়ে উচিত পদ্ধতি ব'লে মনে হয়।

১৩৭৫

'রাজা'র কথায়

'রাজা' নাটক আমার অল্পবয়স থেকেই ভালো লেগে এসেছে। যখন এর কোনো মানেই বুঝি না তখন থেকে! তারপর এ-নাটক আমি বহু-বার বহুলোককে প'ড়ে শুনিয়েছি। এবং তাঁদেরও যে এ-নাটক প্রভূত মুগ্ধ করেছে তা-ও দেখেছি। — কিন্তু আমরা 'বহুরূপী'তে এ-নাটক অভি-নয় করার পর অনেক বন্ধুর কাছে শুনলুম যে, বহু জায়গায় এ নাকি খুবই ভালো কিন্তু সমস্তটার মধ্যে যেন সে-রকম নাটকীয় tension থাকে না, "যেমন ধরুন, আপনাদের 'রাজা অয়দিপাউস'-এ থাকে"।

ভুলটা আমরাই করেছি। 'অয়দিপাউস'-এর সঙ্গে এক সাথে এ-নাটক করা উচিত হয়নি। 'অয়দিপাউস'-এ সংঘাত আছে, suspense আছে, tension আছে। 'রাজা'তে এ-সব কিছুই নেই। অন্তত 'অয়দিপাউস'-এ যে-পরিমাণে আছে সেই পরিমাণে, এবং সেই ধরনে নেই। 'রাজা'তে একটি অতি সুকুমার কাব্যানুভব আছে। মণিপুরী নাচের মতো আবেশ আছে। রাধাকৃষ্ণের পালাগানের মতো নেশা আছে। একজনের আত্মোপ-লব্ধির দুরূহ যাত্রা কেমন ক'রে সফল হয় এই জানার কৌতূহল যদি কারো থাকে তো তার কাছে এর suspense আছে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র নেই, রাম-রাবণের যুদ্ধ নেই। অনুভবে ধাক্কা পাওয়ার মতো কিছু নেই। যা আছে তা অনুভূতির সমস্ত সূক্ষ্ম স্নায়ুমুখগুলোকে জাগ্রত করার। (এর মানে অবশ্য এই নয় যে সোফোক্লেসের নাটকে suspense বা tensionটা অন্যায়। এটা দুটো ভিন্ন আবেদনের কথা। এবং পৃথিবীর সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হিসেবে বাঙলা নাট্যমঞ্চকে প্রত্যেকটি গভীর শিল্পপ্রকাশের ধারাকে তো জানতেই হবে। কারণ, আমাদের নাট্যমন্দির তো কেবলমাত্র অন্ধ ভক্তির ওপরেই স্থাপিত হ'তে পারে না।)

কিছু লোককে দেখলুম যারা সাধারণ লোক — একেবারেই সাধারণ — তাঁদের ভীষণ বিচলিত করলো এই নাট্যাভিনয়। একজন যুবকের কথা জানি যিনি বারবার 'রাজা' নাটকের অভিনয় থাকলেই দেখতে

এসেছেন। এটা নাকি তাঁকে কিরকম যেন মুগ্ধ করে। কেন? এই কেন-র উত্তর এঁরা কেউই ভালো ক'রে দিতে পারেন না। কিন্তু মুগ্ধ হন। কেন?

এই কেন-র উত্তর পাওয়াটা আমাদের পক্ষে কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অসফলতা আমাদের অজানা নয়। আমরা 'ধর্মঘট' অভিনয় করেছি, 'মুক্তধারা' অভিনয় করেছি, এবং অভিনয়ে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি সেটা বুঝতে আমাদের সময় লাগেনি। কিন্তু এ-নাট্যাভিনয় সম্পর্কে অদ্ভুত বিপরীত কথা শুনলুম। এবং মনে হ'তে লাগলো যে আমাদের নাট্যাভিনয়ের ভালো-মন্দের কথা ছড়িয়ে এর স্তর। এর অর্থ অনেক গূঢ়। মঞ্চনাট্যের একটি বিশিষ্ট ফর্মের কথা এটা। একটি বিশিষ্ট রূপের।

বহুদিন আগে শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে কলকাতায় যে-থিয়েটারগুলো আছে সেগুলো সব বিলিতি থিয়েটারের দশম শ্রেণীর অনুকরণ। আমাদের নিজস্ব থিয়েটার গড়তে গেলে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেই হবে। তা ব্যতীত উপায় নেই।

কথাটা তখন আমি সম্পূর্ণ বুঝিনি। তার পূর্বে আমরা 'নবান্ন' করেছি। সেখানে বিলিতি রিয়ালিস্টিক থিয়েটার অনুযায়ী মঞ্চরূপারোপ করিনি। ('নবান্ন' নাটকটা প'ড়ে সেটা হয়তো সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না, কারণ প্রয়োগের প্রয়োজনে ওর কিছু অদলবদল করা হয়েছিলো।) এবং তারপর 'পথিক', 'উলুখাগড়া' করেছি ও 'ছেঁড়াতার' করতে যাচ্ছি। তাতেও তো আমাদের কল্পনা বিলিতি পদ্ধতি অনুসরণ ক'রেই চলেনি।

শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশায় শেষের দিকে মাঝে মাঝে যাত্রায় ফিরে যাওয়ার কথা বলতেন। কিন্তু যাত্রা তো আমাদের কৈশোরেই বদলে গেছে। যাকে প্রবীণরা ব্যঙ্গ ক'রে বলতেন 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা'। পূর্বের মতো জুড়ির গান বা কৃষ্ণযাত্রার রূপের স্তিমিত নাটকীয়তা তখনই কতো বিরল। যেটা বেড়ে গেলো সেটা কলকাতার থিয়েটারেরই নিকৃষ্ট অনুকরণ। সুতরাং সেখানে ফিরে যাওয়ার অর্থও আমি বুঝতুম না।

তারপর একদা আমরা 'রক্তকরবী' করলুম। এবং সেই থেকেই বলা যায় আমাদের কাল হ'লো। তার পূর্বে আমরা 'চার অধ্যায়' অভিনয় করেছি। কিন্তু 'রক্তকরবী' করবার সময়েই ক্রমশ মনে হ'তে থাকলো যে ভারতীয় নাট্যপ্রকাশের একটা ধরন যেন আমরা দেখতে শিখলুম।

এই-যে সমস্ত ঘটনাকে একটা নাট্যক্ষেত্রে আনা, এই-যে অন্তর্জীবন আর বহির্জীবনকে একত্র বিবৃত করা, এই-যে ব্যক্তি ও প্রতীককে একই রূপের মধ্যে প্রকাশ করা, — এইরকম নানান্ বৈশিষ্ট্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলুম। এবং সেইদিনই আমাদের বোধ হয়েছিলো যে বাঙলা নাট্যের ভবিষ্যতে পৌঁছতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়েই তবে যেতে হবে। ওঁকে এড়িয়ে হবে না।

আমাদের মঞ্চ নানা কারণে রবীন্দ্র-নাট্যের গুণ সমসাময়িককালে আত্মসাৎ করতে পারেনি। আর তাই তাঁর পরে এখনো পর্যন্ত নতুন নাটক আমরা কেউ লিখতে পারিনি। এই কালের মধ্যে আমাদের দেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার যাঁরা — শরৎচন্দ্র থেকে আধুনিক সাহিত্যিকেরা পর্যন্ত — কেউই নাটকের কোনো নতুন ফর্ম ব্যক্ত করতে পারেননি। আর তাইতো কথায় কথায় আমাদের নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে এতো অবজ্ঞার মন্তব্য করা হয়। কিন্তু এই পারাটা যে সহজ নয় সেটা বাঁকা মন্তব্য করার অদায়িত্বিক সস্তা পন্থা ছেড়ে আমাদের মধ্যে যারাই চেষ্টা করেছি তারাই টের পেয়েছি। এবং এই না-পারার কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের জাতীয় মানসকে যথাযথ প্রকাশ করতে পারে এমন কোনো বিশিষ্ট নাটকীয় রূপ আমাদের নাটকে আসেনি। আর আসেনি ব'লেই এতো শক্তিসম্পন্ন সাহিত্যিকেরা চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমাদের নাটক তার মূল খুঁজে পাচ্ছে না, গভীর হ'য়ে উঠতে পারছে না।

একেবারেই যে কখনো কিছু হয়নি তা-ও নয়। আমাদের কাজের শুরুতে 'নবান্ন'-এর পরে শ্রী বিজন ভট্টাচার্যই লিখেছিলেন 'জীয়নকন্যা'। সে-নাটকে রূপপ্রয়োগ করবার আমার খুব আকাঙ্খা হয়েছিলো সে-সময়ে। করতে পাইনি। কিন্তু আজও আমার কানে ঐ-নাটিকার বিচ্ছিন্ন দু-একটা সুর হঠাৎ হঠাৎ বেজে ওঠে। এ-রকম সৃষ্টি হয়েছে এখানে ওখানে। কিন্তু নাট্যকারদের মনেও পথটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি, সচেতন বোধের মধ্যে গ্রথিত হ'য়ে আমাদের অংশ হ'য়ে উঠতে পারেনি।

ফলে — প্রকৃতি তো ফাঁক পছন্দ করে না, তাই — আমাদের আধুনিক নাটক ক্রমশ হয় রোমহর্ষক পন্থা অনুসরণ করেছে, আর নয়তো আধুনিক য়ুরোপীয় ফ্যাশনের ব্যর্থ অনুকরণ ক'রে গর্ববোধ করেছে। কিন্তু 'নবান্ন'

যদি একদিন চমৎকৃত ক'রে থাকে তার কারণ এ নয় যে তাতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের রোমহর্ষক মৃত্যুকাহিনী বিবৃত ছিলো। সে-নাট্যাভিনয়ে কাব্য ছিলো। যাঁরা 'নবান্ন' দেখেছেন তাঁদের হয়তো মনে পড়বে। একটা দৃশ্যে কুঞ্জ কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি ক'রে ডাস্টবিন থেকে খাবার নিতে যায়। অন্ধকার কোণের মধ্যে অদৃশ্য কুকুর তার হাতে কামড়ে দেয়। কুঞ্জ আর্তনাদ ক'রে মঞ্চের সামনের দিকে এসে ব'সে পড়ে। তার বৌ রাধি — ছিন্নবস্ত্রা, রুক্ষকেশা — গলা ফেড়ে কুকুরটাকে গালি পাড়ে। তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। অন্ধকার মঞ্চের ওপর এরা দু-জন অভুক্ত চুপ ক'রে ব'সে থাকে। — তারপর রাধি ভাঙা ভাঙা সজল কণ্ঠে বলে — "জল খাবে ? এট্টু জল এনে দেবো ?"

কিংবা প্রধান সমাদ্দার যখন ডাক্তারকে দেখাতে পারছে না যে তার ব্যথাটা ঠিক কোথায়। সে কখনো এখানটা দেখায়, কখনো ওখানটা। ডাক্তার বলে — ব্যথাটা কিছু নয়। ব্যথার কথা তুমি ভুলে যাও। — আধপাগলা প্রধান সমাদ্দার ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকাতে তাকাতে আর আপনমনে বলতে বলতে বেরিয়ে যায় যে, ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা ভুলে যাও।

এ-সব টুকরোর কথা যাঁরা 'নবান্ন' দেখেছেন তাঁরা বোধহয় কখনোই ভুলতে পারবেন না। কিংবা, পুরো দ্বিতীয় অঙ্কটায় দৃশ্য পরিবর্তনের সময়ে যখন মঞ্চ ঘুরতো তখন অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেকবার আর্তনাদ উঠতো সেই দুর্ভিক্ষপীড়িতদের — বাবা, এট্টু ফ্যান দ্যাও বাবা বাবাগো —

'নবান্ন' অভিনয়ে একটা কাব্য সৃষ্টি হ'তো। আবেগের কাব্য। মানুষের নিঃসহায়তার কাব্য, তার ভালোবাসার কাব্য।

কিন্তু সেটা সফলতার পথে আর এগুতে পারলো না। নানান্ কারণে নানান্ দিক থেকে বাধা দেওয়া হ'তে থাকলো। তার মধ্যে অস্থির রাজনীতি ও রাজনীতির নামে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও অসূয়া যেন ভীমাকৃতি হ'য়ে উঠলো। ফলে হ'লো না। ধুলো উড়লো, কাদা ছুটলো, কিন্তু ঠাকুরঘরটিকে কেউ নিকিয়ে সাফ করতে এলো না। আর তাই, রবীন্দ্রনাথের নাট্য-idiom এড়িয়ে আধুনিককালের যে নিজস্ব নাট্যপদ্ধতির ক্রমপ্রকাশ আমরা অনেকেই আশা করেছিলুম তা হ'লো না। কোলাহল-

মুখরিত এই নবনাট্য আন্দোলনের প্রাঙ্গণে অসামান্য নাট্যকারও কেউ এলেন না।

কারণ আমরা যেমন নিজেদের সংস্কৃত করিনি, তেমনি নিজেদের উৎস সম্পর্কেও অবহিত ছিলুম না। রবীন্দ্রনাথের সৎ নাট্যকে আমরা পড়েছি কিন্তু বুঝিনি, তাকে আত্মভুক্ত করতে শিখিনি। তাই প্রয়োজন পড়লো মুখ ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখবার। তাঁকে বোঝবার। পথটা যে তাঁকে ছুঁয়েই গেছে এ-কথাটা বুঝতেই হ'লো।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য আমাদের জীবনের এতো গভীর পর্যন্ত মূল বিস্তার ক'রে আছে যে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে চলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ এক অন্ধকারযুগ এসে আমাদের প্রাচীনকালের জীবন্ত সভ্যতা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে। আধুনিকযুগে আমরা জাগলুম ইংরেজের ধাক্কায়। তখন আমাদের দেশে এক পুনরুজ্জীবনের সময়। এবং আজ পর্যন্ত যাঁরাই এই দুই সভ্যতাকে নিজের মধ্যে সমন্বিত করতে পেরেছেন তাঁরাই আমাদের এ-কালের নমস্য ব্যক্তি। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা সে-সমাধানের উত্তরাধিকার পাইনি । তাই দুই বিপরীত দিকের আকর্ষণের মধ্যে কষ্ট পাওয়া আমাদের ভবিতব্য। এবং নিজের নিজের মতো ক'রে এর উত্তর দেওয়া দায়িত্ব আমাদের।

কিন্তু অতীত ভারতের নাট্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য কি ? প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতের পরিচয় ছিলো। সেই দেশের নাটককে বলা যায় য়ুরোপীয় নাটকের জন্মদাতা। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই প্রাচীনকালেই যে-নাটক লেখা হয়েছে, বা নাট্যাভিনয়ের যে-সূত্রাদি নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে তা একেবারেই ভিন্ন।

সেই ভিন্নতা কী ? — যে-ভিন্নতা প্রথমেই চোখে পড়ে সেটা হ'লো মূলের ভিন্নতা। গ্রীসীয় নাটকের তথা য়ুরোপীয় নাটকের মূল ভিত্তি হ'লো সংঘাত। সংঘাত ভিন্ন নাটক হয় না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল এক জায়গায় বলেছেন —
"...Another Bacchie element was respect for violent emotion, Greek tragedy grew out of the rites of Dionysus."

কিন্তু ভারতবর্ষের নাট্যের ভিত্তি সংঘাত নয়। এবং এই বিভিন্নতার মূলে আছে হয়তো জীবনদর্শনের ভিন্নতা। কিন্তু সে-আলোচনার মধ্যে না-গিয়ে

এইটা নিশ্চয় বলা যায় যে, সেই মূল দৃষ্টিভঙ্গীর কী-এক পার্থক্যের জন্যই ভারতবর্ষের ভাস্কর্য, চিত্র, নাট্য, — য়ুরোপীয় চিন্তার যে মূল উৎস, সেই গ্রীসীয় সভ্যতার ভাস্কর্য চিত্র ও নাট্যের থেকে ভিন্ন। রূপের মধ্যে রূপের essenceকে প্রকাশ করবার চেষ্টায় এক ভিন্নধর্মী ফর্মের সৃষ্টি হয়েছে এই দেশে।

কিন্তু আমাদের শৈশব থেকে 'সাজাহান'-'মেবারপতন'-'বঙ্গে বর্গী'-'কেদার রায়' প্রমুখ যে সমস্ত নাটক দেখতে আমরা অভ্যস্ত, বা ইস্কুল কলেজে যে-সব বিদেশী নাটক সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত টীকা প'ড়ে থাকি অজস্র, তারা সবাই অন্যধরনের। ফলে আমাদের ভালো লাগার অনুভবটাও সহজ বা সরল নয়।

কিন্তু দোষটা আমাদেরই সম্পূর্ণ নয়। জ্ঞান হওয়া অবধি আমরা কয়েক-পুরুষ ধ'রে এক ব্যাপক সংঘাতের মধ্যে বাস করছি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আসতে আমাদের সমগ্র দেশে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রত্যেকটি পরতে পরতে প্রচণ্ড সংঘাতের কাহিনী। সে-অনুভবও তো আমাদের চেতনাকে পাকে পাকে বেঁধে রেখেছে। তাই তার প্রতিফলনও আমরা আমাদের শিল্পে অনুভব করতে চাই। যদি বিপরীত সভ্যতার সংঘাত ব্যতিরেকে আমাদের আভ্যন্তরীণ কোনো কারণেই বিপ্লব ঘটতো, এবং যদি আমাদের সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত থাকতো, তাহ'লে হয়তো আমরা ঐতিহ্যাশ্রিত দেশীয় পদ্ধতিতেই অতি সহজে সে-সংঘাত প্রকাশ করতুম। কিন্তু পৃথিবীতে অন্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষ চিরকাল ঘটেছে। কেবল আজকাল সেটা আরো সহজ ও ব্যাপক হয়েছে। তাই এই টানাপোড়েনের মধ্যে দুলতে দুলতেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী খুঁজে পেতে।

এবং সে-প্রকাশ তো কেবলমাত্র 'রাজা' নাটকের নির্বাচনেই সম্পূর্ণ হবে না। তার মঞ্চপ্রয়োগের পদ্ধতি কি হবে?

একটা জিনিস আমরা সর্বদা লক্ষ করেছি যে মঞ্চে যদি অনেক আসবাবপত্র দেওয়া থাকে তাহ'লে অভিনেতাদের পক্ষে সহজ হবার অনেক অবলম্বন মেলে। কিন্তু ফাঁকা মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে আমরা কেমন যেন অস্বাভাবিক হ'য়ে পড়ি। তাইতো Jean-Louis Barrault-এর

অধিনায়কত্বে Comedie Francaise যখন মার্কিণ দেশে যায় তখন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের অভিনন্দন দেবার সময়ে Eric Bentley বলেছিলেন, "When our actors do stand, they look for a raised surface to place one foot on ; then they lean sagely forward and place an elbow on the raised knee....To our actors, an arm is an instrument to lean on things with, and the things leaned on are not always inanimate :...and of course our modern costume is provided with an escape from the whole problem — the trouser pocket, the naturalistic actor's first and last refuge...One of our leading actors, faced with a classic script, once asked me : 'But what is there for an actor to do.' He had noted the absence of cigarettes, drinks, food, spittoons...for of such is the kingdom of naturalism. . " (*What is theater ?*)

কথাটায় একটা সত্য আছে। এতে অভিনয়ে একটা আপাত-বাস্তবিকতা আসে বটে, কিন্তু সেই রীতিবদ্ধতাই সত্যপ্রকাশের পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। যেমন 'বাস্তববাদী' নাটকের ফর্ম মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রকাশ করতে পারে না ব'লেই সত্যপ্রকাশের মুখ চেয়ে সেই নাট্যরীতিকে ভাঙা হয়েছে, তেমনই এই আসবাব-নির্ভর অভিনয় ক্রমশ এমন একটা ভঙ্গীর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে যায় যে তাতেও আবেগের অনেক কাব্য প্রকাশ করা ক্রমশ কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়।

যেমন, সাধারণ বাস্তববাদী নাটক অভিনয় করতে করতে অভিনেতারা ছন্দে অভিনয় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। (যেটা এক্ষুণি মার্কিণ দেশে অনেককে ভাবিয়েছে শুনে এলুম।) কিন্তু আমরা যদি দুটোরকমই পারি তাতে তো আমাদেরই লাভ। এবং তখন দেখা যাবে যে কান ও কণ্ঠের সংস্কৃতি ব্যতীত বিরাট নাট্যকারের সূক্ষ্ম modulation-এ ভরা উজ্জ্বল ভাষা কখনোই আমাদের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

তেমনিই অভিনেতা যদি ফাঁকা মঞ্চে নিজের ওপর নির্ভর ক'রে দাঁড়াতে শেখে, নড়তে শেখে — যেমন ক'রে নর্তকী মঞ্চে নৃত্যাভিনয় করে আসবাব

ব্যতিরেকে — তাহ'লেই সেই অভিনেতা নিজের সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় করতে শিখবে। তার চলা ফেরা দাঁড়ানো রূপময় হবে, কাব্যময় হবে। এবং এই অর্থব্যঞ্জনা প্রকাশের ভঙ্গী কিন্তু কোনো অতিকৃতিতে নয়। বাস্তবের কাছাকাছি থেকে, তারই তট ছুঁয়ে ছুঁয়ে। ঠিক যেমন কবিতা সেইযুগের বাচনভঙ্গীর কাছাকাছি বয়, তারই তট ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

অভিনয়ের এ-শিক্ষা আমরা কোথায় পাবো আমাদের যাত্রায় ছাড়া! তাই মনে হয় শিশিরকুমার ঠিকই বলেছিলেন। যাত্রার কাছ থেকে আমাদের অনেক-কিছুই নেবার আছে। কিন্তু সেটা এই থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার চীৎকৃত থিয়েটারি নয়। পুরোনো যাত্রার অনুভব থেকে। সেই অনুভব রবীন্দ্রনাথের মনে ছিলো। তাই 'রাজা' নাট্যাভিনয়ে আমরা স্বল্পতম আসবাব ব্যবহার ক'রে পারলুম। যদি আমাদের সামর্থ্য থাকতো তাহ'লে পিছনের পট আরো বিস্তৃত ক'রে দিতুম। প্রত্যেক চরিত্রকে যেন তাহ'লে আরো স্পষ্ট ক'রে আকাশের গায়ে দেখা যেতো। আরো অনেক-কিছুই হয়তো করতুম। যা করা যায়নি!

সুদর্শনার এই যে-যাত্রা, যা অন্ধকারকে উপলব্ধি ক'রে আলোতে এসে দাঁড়ায়, যা নিজের রাজাকে উপলব্ধি ক'রে মানুষের তীর্থে এসে প্রণত হয়, তার কাহিনী শুরু হয় অপরিণত মনের কৌতূহলে করুণা কোমল হাসি হেসে, আর শেষ হয় গভীর শান্তিতে। তাই বোধহয়, যে-লোকেরা য়ুরোপীয় ধরনের নাটকীয় সংঘাত মনে মনে আশা ক'রে যান না, তাঁরা হয়তো এই স্তিমিত নাটকীয়তার আবেশের মধ্যে নিজেদের বিস্তার করতে অসুবিধে বোধ করেন না।

আর তাই মনে হয় যে, কথাটা 'বহুরূপী'র অভিনয়ের ক্ষমতা-অক্ষমতার ঊর্ধ্বে। এই ঘটনাটা থেকে বোধহয় আমাদের শিক্ষা নেবার আছে।

১৯৬৫

ইয়োকাস্তে

রানী ইয়োকাস্তে মানুষটা কেমন, আর অয়দিপাউসের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই বা কেমন, এ-সব প্রশ্ন সোফাক্লেসের নাটক অনুবাদ করার সময় থেকেই আমাদের মনে হ'তো। মহলার সময়ে তো আরো বেশী ক'রেই এইসব কথা উঠতো।

একদিন মহলা হচ্ছিলো সেই জায়গাটার যেখানে শঙ্কিত অয়দিপাউস রাণীকে জিজ্ঞাসা করে যে লাইয়সের বয়স কতো ছিলো, তাকে দেখতে কেমন ছিলো। তার উত্তরে ইয়োকাস্তের কথা আছে — দৈর্ঘ্যে সে তোমারই মতো ছিলো। আর দেখতে? — দেখতে অনেকটা তোমারই মতো।

কথা উঠলো এই কথাটা কেমন ক'রে বলা হবে তাই নিয়ে। রাণী কি কেবলমাত্র একটা সংবাদ দেওয়ার মতো ক'রে কথাটা বলবে? না কি এই সাদৃশ্য সে আগেও লক্ষ করেছে? যদি আগেই লক্ষ ক'রে থাকে তাহ'লে এতোদিন সে সেটা কখনো বলেনি কেন? এটা তো হ'তেই পারে যে প্রথম স্বামীর প্রতি তার প্রেম এতো গভীর ছিলো যে নতুন স্বামীকে তারই মতো দেখতে দেখে সে অয়দিপাউসকে ভালোবাসতে পেরেছিলো। তা যদি হয় তাহ'লে ইয়োকাস্তে নিশ্চয়ই ভূতপূর্ব রাজা লাইয়স সম্পর্কে মাঝে মাঝেই কথা বলেছে। এবং তাহ'লে অয়দিপাউসের লাইয়স সম্পর্কে আগে থাকতেই অনেক কথা জানা আছে। কিন্তু নাটকে দেখি যে তা নেই। বরঞ্চ এমন মনে হয় যে লাইয়স সম্পর্কে যেন কোনো উল্লেখই হ'তো না। এমন-কি যে-লোক এসে প্রথম রাজা লাইয়সের মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলো সে যে ঠিক কী সংবাদ দিয়েছিলো তা-ও অয়দিপাউস যেন জানতো না।

তাহ'লে কি রাণী এই সাদৃশ্যের কথাটা গোপন ক'রে গিয়েছিলো? কেন গোপন ক'রে গিয়েছিলো? অয়দিপাউসের হিংসা হবে ব'লে? কিন্তু প্রাজ্ঞ নায়কদের সামনে তার ঘোষণায় অয়দিপাউস বলে যে রাজা লাইয়সের প্রতি আমার এই দায় আমি আমার পিতৃস্থানীয়ের প্রতি

দায়ের মতো পালন করবো। — অর্থাৎ কোথাও তো আমরা তার কোনো ঈর্ষার সামান্যতম ইঙ্গিতও দেখি না। তাছাড়া এ-রকম বিবাহ তখন কিছু একটা অস্বাভাবিকও ছিলো না — তাহ'লে ?

তবে কি আমরা মনে করবো যে অয়দিপাউসের চরিত্রে হিংসা ছিলো না বটে, কিন্তু রাণী তাকে ভুল বুঝে তার হিংসা হ'তে পারে এই অনুমান ক'রে তার কাছ থেকে লাইয়সের সমস্ত বর্ণনা গোপন রাখতো ? তা যদি হয় তাহ'লে আমাদের এ-কথাও ভাবতে হবে যে এই ভুল রাণী করলো কেন। তার কি অন্য পুরুষদের দেখে (অর্থাৎ যে-পুরুষকে সে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে সেই লাইয়সকে দেখে) প্রতীতি জন্মেছিলো যে, পুরুষেরা এ-সব ব্যাপারে স্বভাবতই ঈর্ষাপরায়ণ ? সুতরাং তাদের সামনে অন্য পুরুষ সম্পর্কে আলোচনা না করাই ভালো ?

তাই যদি হয় তাহ'লে লাইয়স সম্পর্কে সে কী ধারণা বহন ক'রে এসেছে ? এবং আজই বা তাহ'লে সে এ-কথা বললো কেন যে লাইয়সকে দেখতে অনেকটা অয়দিপাউসের মতো ছিলো ? কোনো শঙ্কিত নারী তো এ-ভুল করবে না। বরঞ্চ বর্তমান স্বামীর ঈর্ষা এড়ানোর জন্য সে এমন ভাবই প্রকাশ করবে যে অয়দিপাউসের সঙ্গে যেন লাইয়সের কোনো তুলনাই চলে না। তাহ'লে ?

আমাদের মহলার সময়ে তৃপ্তি এমনভাবে কথাটা বলেছিলো যেন আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে ইয়োকাস্তে এই সাদৃশ্য লক্ষ করলো। তাতে অন্য-একজন সভ্য প্রশ্ন তুলেছিলো যে সেই ভাব করাটা ঠিক কিনা, কারণ ইয়োকাস্তে তো কতো-দিন থেকেই অয়দিপাউসকে দেখছে !

সেই আলোচনার মধ্যে তখন ইয়োকাস্তের একটি সম্পূর্ণ রূপ যেন ক্রমশ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠলো।

প্রথমত যুবক অয়দিপাউস যখন এ-রাজ্যে এসেছে তখনও রাণী ইয়োকাস্তে বিবাহযোগ্যা নারী। নইলে বিয়ের কথা উঠতো না। অর্থাৎ অয়দিপাউস তার মায়ের একেবারে প্রথম বয়সের সন্তান।

তখন লাইয়সের বয়স কতো ছিলো ? নিশ্চয়ই ইয়োকাস্তের চেয়ে অনেক বড়ো। কারণ অয়দিপাউস তার উল্লেখ করেছে বৃদ্ধ ব'লে। অর্থাৎ ইয়োকাস্তের সঙ্গে তার স্বামীর বয়সের বেশ একটা পার্থক্যই ছিলো।

এখন, পুরোনো কাহিনী হ'লো এই যে, সেই লাইয়স আর-একজনের প্রতি এক অপরাধ করেছিলো ব'লে অভিশপ্ত হয়। দৈবজ্ঞদের কাছে সেই অভিশাপের কথা জানতে পেরে সে আপন সন্তানকে হত্যা করাবার জন্য ভৃত্যের হাতে দেয়। ইয়োকাস্তের কিন্তু অল্পবয়সের সেই প্রথম মাতৃত্বের অনুভব। নিশ্চয়ই হাসিমুখে সে নিজের সন্তানকে ঘাতকের হাতে তুলে দেয়নি। অথচ ভালো ক'রে কাঁদতেও সে পারেনি, কারণ এ-হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন তার স্বামী — তাঁর নিজের প্রাণ বাঁচাতে।

হয়তো আবার নতুন মাতৃত্বে সে এই শোক ভুলতে পারতো, কিন্তু রাজা লাইয়স তাঁর নিজের প্রাণের ভয়ে আর তাকে কখনো কোনো সন্তান ধারণ করবার সুযোগ দেননি। সেই কিশোরী বধূ ক্রমশ নবযৌবনা হয়েছে, এমনকি ক্রমশ পরিপূর্ণ যৌবনা হয়েছে, কিন্তু বয়স্ক লাইয়স গর্ভাধানের ভয়ে তাকে হয়তো স্পর্শও করেনি, তাকে নিশ্চয়ই এড়িয়ে চলেছে, যুবতী ইয়োকাস্তের দেহগত কোনো কামনা বা বাসনা সে কোনোদিন পূরণ করেনি, প্রাণভরে ভালোবাসবার মতো কোনো আধার সে কখনো ইয়োকাস্তেকে দেয়নি।

এবং ইয়োকাস্তেও সেইধরনের মেয়ে নয় যে, সেই ক্ষুধা মেটাতে সে অন্য পুরুষের দ্বারে প্রার্থী হবে।

অর্থাৎ একটি মেয়ে যে নিজের যৌবনকে সকলরকমে অবদমিত করেছে, শুকনো মুখে যে কেবল সকলের প্রতি তার নিজের কর্তব্য পালন ক'রে গেছে, তার নিজের স্বামীর প্রতি, তার ভায়ের প্রতি, প্রাসাদের অন্যান্য সকল সাধারণ পরিজনদের প্রতি — সেই নিঃসঙ্গ, শীর্ণ, ও ক্লান্তদৃষ্টি নারী নিজেও জানতো না যে তার স্বামীর প্রতি তার মনে কি নিদারুণ ঘৃণা। তখনকার সাধারণ ব্যবহারিক জীবনের নৈতিক বিধি অনুযায়ী সে মেনে নিয়েছিলো যে আপন প্রাণের ভয়ে স্বামীরা এইরকম নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ব্যবহারই করবে, কিন্তু তার মধ্যের যে-নারী এবং -মাতা সে নিশ্চয়ই সেই স্বামীকে ক্ষমা করেনি, সে নিশ্চয়ই সেই স্বামীর স্বার্থপরতা ও ক্রূরতা লক্ষ ক'রে তাকে ঘৃণায় এড়িয়ে থেকেছে।

এ হেন নারী, যে স্বামীর জীবদ্দশাতেই বৈধব্য ভোগ করেছে, তার কাছে স্বামীর মৃত্যুসংবাদে কতোটুকু এসে যায়! তাই যখন রাজ্যের প্রয়োজনে তার পুনর্বার বিবাহের কথা হয়েছে তখনও সেটা সে কর্তব্য মনে ক'রেই

প্রস্তুত হয়েছে। কারণ, বিবাহ সম্পর্কে তো তার কোনো মোহ থাকবার কথা নয়।

কিন্তু যার সঙ্গে তার বিবাহ হ'লো সে যেন এক অন্যরকমের স্বামী। সে একেবারেই স্বার্থপর নয়। সে বীরের মতোই বুক ভ'রে ভালোবাসতে পারে। ইয়োকাস্তের বুভুক্ষু জীবনে সে-যেন-এক অকল্পিত ভূরিভোজের আয়োজন হ'লো। দেখতে দেখতে ইয়োকাস্তে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ ক'রে দিলো এই চঞ্চল তীক্ষ্ণবুদ্ধি দামাল স্বামীর হাতে। দামালই তো! যতো সহজে সে-স্বামী রাগে জ্ব'লে ওঠে, ঠিক তেমনিই সহজে আবার সে শান্ত হ'য়ে যায়। যতো ভালোবাসতে পারে, তেমনি সন্দেহ করতে পারে। বাপ মায়ের আদুরে ছেলের মতো সে এতো অভিমানী যে প্রাপ্য স্নেহের ষোলো আনা পেলেও যেন তার অবহেলার সন্দেহ ঘোচে না। তার আঠারো আনা চাই। এবং একবার সেই প্রেম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হ'লে সে-স্বামী ছেলেমানুষের মতো বিশ্বাস করতে পারে, নির্ভর করতে পারে। এমন স্বামীকে সামলাতে আর ভালো-বাসতেই ইয়োকাস্তের দিন কেটে যায়। অতীতকে মনে হয় একটা দুঃস্বপ্ন। তাকে সে মনেই আনতে চায় না।

প্রৌঢ়ত্বের পারে এসে আজ ইয়োকাস্তের শরীরে তাই লাবণ্যের ঢল নেমেছে। সেই ইয়োকাস্তেকে যখন অয়দিপাউস প্রশ্ন করলো যে লাইয়সকে দেখতে কেমন ছিলো, তখন সে এতোদিন পরে আজ যেন প্রথম স্পষ্ট ক'রে তার জীবনের সেই বিস্মৃত পুরুষকে স্মরণ করবার চেষ্টা করলো। এবং এতো দিনের ব্যবধানে, ও তার নিজের জীবনের পরিপূর্ণতার ফলে, আজ তার আর সেই ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা নেই লাইয়সের প্রতি। তাই হয়তো বয়স্ক ও স্বার্থপর লাইয়সের পরিবর্তে যে-লাইয়সকে সে বহুদিন পূর্বে বিবাহের আসরে প্রথম দেখেছিলো তাকেই হঠাৎ এতোদিন পরে মনে পড়লো। আর সেই মুখটা মনে পড়লো ব'লেই আজ হঠাৎ সে আবিষ্কার করলো যে অয়দিপাউসের মতোই দেখতে ছিলো সে।

অর্থাৎ তৃপ্তির বলার ধরনই ঠিক হয়েছিলো, তার একটা আদ্যোপান্ত ছবি পাওয়া গেলো।

কিন্তু এই পর্যন্ত এসেই আমাদের চিন্তা থামলো না। মনে হ'তে লাগলো যে ইয়োকাস্তে তো কেবল পরিপূর্ণ নারীত্বের ছবি নয়, তার কোথায়

যেন একটা অশান্তি আছে। মনে হয় তার স্নায়ু অতো শান্ত ও স্নিগ্ধ নয়। কেন ?

আলোচনায় স্পষ্ট হ'লো যে, এতো সুখের মধ্যেও ইয়োকাস্তের মন থেকে যেন একটা ভয় তার কিছুতেই যায় না। তার প্রথম সন্তানের অহেতুক হত্যা থেকেই তাকে ভবিতব্য সম্পর্কে আতঙ্কিত করেছে। তাই এখনো এতো সুখের মাঝখানেও তার হঠাৎ যেন ভীষণ ভয় করে। মনে হয়, এতো সুখ কি তার কপালে সইবে! কবে হয়তো আবার সেই ভাগ্যের নিষ্ঠুর হাত যেমন ক'রে একদিন তার কোল থেকে তার পুতুলের মতো সুন্দর তিনদিনের সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তেমনি হয়তো আজ আবার তার বুক থেকে তার এই অসম্ভব সুখকে ছিনিয়ে নেবে। অয়দিপাউসের মতো তার তো নিজের ভাগ্যের প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই। সে যে ভাগ্যের হাতে মার খেয়েছে। তাই সে ভাগ্যকে ভয় করে।

তাছাড়া কখনো কি সে এক এক দিন রাত্রে নিজের ভাগ্যের কাছে কেঁদে বলেনি যে, এমন স্বামীই যদি তুমি আমাকে দিলে তাহ'লে আরো আগে দিলে না কেন ? আমার বয়স থাকতে দিলে না কেন ?

এটাই প্রকাশ পায় যখন সে শেষের দিকে উত্তেজিত হ'য়ে বলে —

"ভয় ? মানুষ কতো ভয় করবে অয়দিপাউস ? কতো ? আমাদের জীবন তো কতকগুলো আকস্মিকের খেলা। কতো বিভিন্নরকমের আকস্মিক ঘটনারই যেন আমরা হাতের পুতুল।... তাই কী করবে মানুষ ? যতোটুকু সে পারবে ততোটুকু সে নিজের যেমন ইচ্ছে তেমনি ক'রেই বাঁচবে। কোনো কিছুকে গ্রাহ্য না ক'রেই বাঁচবে। ... "

ইয়োকাস্তের মনের অন্দরে বোধহয় কোথাও কোনো বিশ্বাস ছিলো না। তাই সে ভাগ্যের হাতে নিশ্চিত বলি হওয়ার আগে আরো যতোটুকু সম্ভব পাগলের মতো বাঁচতে চেয়েছিলো। জীবনকে সে যেন সুরার মতো, নির্যাসের মতো পান ক'রে, কিছুক্ষণের জন্যে মাতাল হ'তে চেয়েছিলো।

ঠিক যেমন আজকের পৃথিবীর অনেক লোক আর-একটা মহাযুদ্ধের নিশ্চিত বলি হবার আগে পাগলের মতো বাঁচতে চাইছে মাতাল হ'য়ে।

এই ইয়োকাস্তের কাছে যখন ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে, অয়দিপাউস তারই সন্তান, তখন সে পাগলের মতো বাধা দিতে যায়, কিন্তু ছুঁতে গিয়ে

থমকে যায়। কাকে সে স্পর্শ করবে ? সন্তানকে, না স্বামীকে ? এই সময়টুকুর মধ্যে ইয়োকাস্তের জীবনের যে প্রচণ্ড নাট্যকাব্য প্রকাশ পায় তার অভিনয়-বৈভব যেন সাধারণ-ধারণাতীত। এবং তারপর যখন সে দুই হাত দিয়ে অয়দিপাউসের মুখটা ধরে তখন শেষ পর্যন্ত সে মা-ই হয়। অর্থাৎ সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োকাস্তে যেন নিজেরই মৃত্যুদণ্ড অপরিহার্যভাবে ঘোষণা করে।

এই হ'লো আমাদের কাছে ইয়োকাস্তের করুণ গল্প।

১৯৬৪

স্মৃ তি
প্র স ঙ্গে

শিশিরকুমার

যখনই জীবনে একটা বড়ো কিছু ঘটে, তখনই আমরা তাকে কথা দিয়ে বাঁধতে চাই। কারণ,— আমাদের আবেগ এমন একটা অনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করে যে চেনা কথার চেনা গণ্ডীর মধ্যে তাকে আরোপ করতে না-পারলে আমরা সাধারণ মানুষেরা শান্তি পাই না।

তাই হয়তো আমরা বলবো যে শিশিরকুমারের সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগ অস্তমিত হ'লো,— হয়তো বলবো যে বাঙলার রঙ্গমঞ্চ থেকে সম্রাট আলমগীর বেরিয়ে গেলেন,— হয়তো বলবো যে এ-যুগের আচার্য ভরত তিরোহিত হলেন।

কিন্তু এতো ব'লেও কি আসল কথাটা বলা হবে? যে-মানুষটিকে চিনতাম তিনি তো কেবল একটা অভিধা নন যে বাছা বাছা গোটাকতক বিশেষণ দিয়ে তাঁর সম্পর্কে আমাদের দায় চুকিয়ে দিতে পারি। তিনি তো নিকৃষ্ট হাতের আঁকা একটা নীরক্ত দ্বিমাত্রিক ছবি ছিলেন না। একটা বিরাট শিল্পী অজস্র জটিলতা দিয়ে একটা রক্তমাংসের পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করেছিলো যার নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে নাদির শাহের ভূমিকায় তিনি একটা কথা বলতেন— যেটার অর্থ হচ্ছে— "তোমার কল্পনার চেয়ে আমি বৃহৎ, তোমার আদর্শের চেয়ে আমি মহৎ, তোমার কল্পনার সাধ্য কী তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আমাকে বেঁধে রাখে।"

কতোবার যে শিশিরকুমারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার এই কথাগুলোই মনে পড়েছে— মনে হয়েছে, মানুষটি একটি ব্যক্তি নয়,— অনেকগুলো ব্যক্তিত্বের একটা জটিল সংমিশ্রণে এই অনন্য মানুষটির সৃষ্টি হয়েছে। তাই হয়তো কখনো রাগ করেছি, ঝগড়া করেছি, কিন্তু তবু আত্মীয় ব'লে মনে করেছি। চারদিকের এই নিষ্ঠাহীন পেশাদার লোলুপতার মধ্যে তিনিই ছিলেন একটা অনমনীয় লোক যাঁর পা দিয়ে পয়সা ছুঁড়ে ফেলতে কোনো দ্বিধা হ'তো না,— অদ্ভুত লোক। অনেকে

বলেছে দাম্ভিক। আমি জানি না। যে-লোক এই কিছুদিন আগেই বলেছেন — 'কষ্ট আর ক'দিন? যে-ক'দিন বাঁচবো, এই তো? কিন্তু তারপরে? এই তোমাদেরই শোকসভা করতে হবে, দল বেঁধে চাঁদা তুলে মূর্তি গড়িয়ে সভা ক'রে তার গলায় মালা দিতে হবে।'

একে কি দাম্ভিকতা বলে? যে-মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে কিছু সৃষ্টি করেছে, এবং সেই সৃষ্টির ফল যাঁর জীবদ্দশাতেই জাতীয় উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে সেই সার্থকশ্রম মানুষের আত্মবিশ্বাসের কথা হ'লো এইটা, এবং এইরকম জীবন্ত মানুষগুলোর কথা বুঝতে পারে না ব'লেই তুচ্ছ মানুষে তার হীন অর্থ করে।

২

আমি আন্দাজ ১৫।১৬ বছর বয়সে প্রথম ভাদুড়ীমশায়ের অভিনয় দেখি। সে-নাট্যাভিনয়ের নাম — 'দ্বিগ্বিজয়ী'। তখনই পরপর দু-বার এই নাট্য দেখেছিলুম, পরে আর দেখিনি। সে-অভিনয় দেখার আগে মোটের মাথায় আমার নাটক কিছু পড়া ছিলো। কিন্তু 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের বক্তব্যই মনে হ'লো যেন ভিন্ন। অনেক গভীর, অনেক important। এ যেন 'সাজাহান' 'নূরজাহান' থেকে আরম্ভ ক'রে 'কর্ণার্জুন', 'ইরানের রাণী' ইস্তক সকলের থেকে ভিন্ন জাতের। সে-অভিনয়ের রসিকতাও যেন অন্য জাতের। অপূর্ব অভিনয় হ'তো যোগেশচন্দ্র ও অমলেন্দু লাহিড়ীর মধ্যে চতুর্থ অঙ্কে। Co-acting কাকে বলে তার প্রথম হদিস আমি পাই তাঁদের সেই অভিনয়ে।

সেই অভিনয়ে নাদিরের সাধারণ কণ্ঠস্বরের আদেশে অন্য সকলের যে সশ্রদ্ধ মনোযোগ, সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে যে সম্মানের তটস্থতা, এবং চলায় ফেরায় যে সামরিক ক্ষিপ্রতা, এ-সমস্তই তখন আমার কাছে একেবারে অকল্পনীয়। বাঙলা থিয়েটারের পৌরাণিক বীরদের যে গদাইলস্করি চলন-বলন তার সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্যই নেই। বরঞ্চ প্রধান চরিত্র নাদির শাহের বীরত্ব ও বুদ্ধি তার শার্দূল-ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে যেন প্রতিভাসিত হয়। এই প্রথম বুঝলুম যে এমন একজন লোক দরকার হয় যাঁর চিন্তাটা এইরকম প্রত্যেকটা চরিত্রাভিনয়ের খুঁটিনাটি পর্যন্ত বিস্তৃত। তাতে যে-সম্বন্ধতা আসে, মুখে কিছু না-ব'লেও যে বিচিত্র মানে প্রকাশ করা যায়, তা অন্যভাবে অসম্ভব। এরই

আর-এক উদাহরণ হচ্ছে প্রথম অঙ্কে যেখানে নাদির শাহ্ সিতারার পরিচয় নিচ্ছে। সেইখানে সিতারা যখন বলে যে, সে তার সদ্যবিবাহিত স্বামীকে হত্যা ক'রে পালিয়ে এসেছে তখন — নাটকে যেটা লেখা নেই — নাদির 'শোভান আল্লা' ব'লে উঠে হঠাৎ অতর্কিত ক্ষিপ্র হাতে সিতারার কোমরের কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা ছোরা তুলে নেয়, তার পরে সেটা নিজের কোমরবন্ধে গুঁজে রাখতে রাখতে বলে — 'তোমায় ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে।'

তখন আমার যে-বয়স তাতে মনে হ'তো যেটা অভিনয় হয় সেটা সবই নাটকে লেখা থাকে। কারণ, নাট্যমঞ্চের সঙ্গে কোনোরকম পরিচয় হবার অনেক আগে থেকেই নাটকের সঙ্গে আমার পরিচয়। কিন্তু সেই প্রথম অভিনয় দেখার পর 'দিগ্বিজয়ী' নাটক নিয়ে পড়তে গিয়ে দেখলুম যে যেটুকু লেখা থাকে সেটুকু অতি সামান্য, পুরো নাটকটাই প্রায় শর্টহ্যাণ্ড নোট্স্-এর মতো সংক্ষিপ্ত। আর যেটা চোখে দেখা যায় এবং কানে শোনা যায় তার প্রাচুর্য অসামান্য। এবং সেটা যখন চোখ, কান, বুদ্ধি ও হৃদয়কে, কখনো একটার পর একটাকে, কখনো-বা একসঙ্গে সবগুলোকে তৃপ্ত করে, তখন অনুভবে যে-ঘটনাটা ঘটে তার তুলনা নেই।

ধরা যাক ঐ-নাটকেরই তৃতীয় অঙ্ক। নাটকে লেখা আছে, দৃশ্য হচ্ছে একটা মসজিদের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণ। কিন্তু চোখে দেখছিলুম একটা ছাত। ছাতটার পিছনদিকের অংশ বোধহয় এক ধাপের মতো উঁচু ছিলো। তারই শেষে হ'লো ছাতের নীচু পাঁচিল। এবং তারও পরে পিছনে পটে আঁকা দূরের বাড়িগুলোর উপর অংশ ও আকাশ।

এই দৃশ্য দেখামাত্র মন ভ'রে গিয়েছিলো। ছবিতে যেমন বেশীরভাগ জায়গাটা ফাঁকা রেখেই ভরাট ক'রে তুলতে পারেন এক একজন শিল্পী, এ সেইরকম। এই দৃশ্য পরিকল্পনা দেবুবাবুর। তিনি 'সীতা' নাট্যের সময়ে শ্রী চারু রায়ের সহকারী ছিলেন। এবং পরে আরো নাট্যের দৃশ্যপরিকল্পনা করেছেন। তাঁকে আমি মাত্র একদিন দেখেছি — বোধহয় শ্রীরঙ্গমের শুরুর দিকে। আমার যতোদূর স্মরণ আছে তার হিসাবে মনে হয়, ১৯২৮ সালে যখন 'দিগ্বিজয়ী' নাট্য শুরু হয় তখন তাঁর বয়স বোধহয় বেশ অল্পই ছিলো। কিন্তু এঁর কাজ এক একসময়ে একেবারে চমকপ্রদ ছিলো। যেমন

'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া'র একটা দৃশ্য সাজানো হ'তো মঞ্চে তিন-চতুর্থাংশে, আর বাঁ দিকে (অভিনেতার বাঁ দিকে) খানিকটা জায়গা ফাঁকা থাকতো। খালি পিছনে অন্ধকারে গাঢ় নীল রঙের বিরাট পর্দা। সেইখান দিয়ে ভেসে আসছে উন্মাদিনীপ্রায় শচীর কণ্ঠস্বর। তিনি পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধ'রে নগরের পথে পথে 'নিমাই, নিমাই' ব'লে আর্তকণ্ঠে তার হারিয়ে-যাওয়া ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তারপরে, যতোদূর আমার মনে পড়ে, সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়েই তিনি আসেন তাঁর পুত্রবধূকে নিয়ে, তেমনি দীর্ঘস্বরে ডাকতে ডাকতে। ঐ অ-সাধারণ অন্ধকার ফাঁকাটা না-থাকলে মঞ্চের দৃশ্যে আমি হয়তো এতোটা বিচলিত হতুম না। এঁর কথা এতোটা বললুম কারণ আমার মনে হয়, এর অভাব বাঙলা নাট্যমঞ্চকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

'দিগ্বিজয়ী'র তৃতীয় অঙ্কে নাদির শাহ যখন দিল্লী ধ্বংসের আদেশ দেয় তখন নেপথ্যে বিউগল্ ড্রাম ইত্যাদি বেজে উঠতো, বিস্ফোরণের শব্দ হ'তো মুহুর্মুহু, আর তার মধ্যে সৈনিকদের চীৎকার ও আক্রান্তদের আর্তনাদ শোনা যেতো। পিছনের পট লাল আলোয় রক্তিম হ'য়ে যেতো, আর পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতো সেই লালের মধ্যে।

যতোক্ষণ দিল্লী ধ্বংসের এই তাণ্ডব চলতো নেপথ্যে, ততোক্ষণ মঞ্চের সামনের দিকের আলো নিভে থাকতো, আর একেবারে পিছনে, ছাতের পাঁচিলের সামনে, নাদির শাহ দাঁড়িয়ে থাকতেন ছায়ার মতো, দর্শকদের দিকে পিঠ ক'রে। এইখানে নাদিরের কিন্তু বক্তৃতা আছে নাটকে। সেটা হয়তো আগে বলা হ'তো, কিন্তু আমি যখন দেখেছি তখন হ'তো না। তার চেয়ে এই ছবিটা ঢের বেশী বিচলিত করতো!

তারপর ক্রমশ যুদ্ধের আওয়াজ ম'রে যেতো। সৈন্যদের মার্চ ক'রে যাওয়ার kettledrum বাজতো, আর দিল্লীর সাধারণ লোকের হাহাকার ও গোঙানি শোনা যেতো। এই নাট্যাভিনয় যদি না-দেখতুম তাহ'লে 'নবান্ন'র প্রথম দৃশ্যের কল্পনা করা যে সম্ভব হ'তো না এ-কথা অনস্বীকার্য। আর-একটা জিনিস শিশিরবাবুর দেখে শিখেছি সেটা হ'লো, নাটক কীভাবে কাটতে হয় বা গাঁথতে হয়। তার প্রমাণ আছে 'আলমগীর' নাটক ও নাট্যের প্রভেদে। লিখিত নাটকের মতো ক'রে নাট্যাভিনয় আদৌ হ'তো না। অর্থাৎ নাটককে, দৃশ্যপটকে, অভিনয়কে, শব্দকে, সব কী ক'রে এক সঙ্গে নাট্যের মধ্যে ব্যবহার

করতে হয় তার শিক্ষা আমরা শিশিরকুমারের কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনিই আমাদের প্রথম নির্দেশক। এ-বাঙলাদেশের, আমার অনুমানে সমগ্র ভারত-বর্ষের, প্রথম নির্দেশক, যিনি মঞ্চের ছবি কল্পনা করেছেন। যিনি আলো, দৃশ্যপট, অভিনয় দিয়ে থিয়েটারের একটা সামগ্রিক রূপ প্রথম এই দেশে এনেছিলেন। কিন্তু প্রথম ব'লেই বোধহয় তাঁর অনেক সূক্ষ্ম কারুকাজ তেমন ক'রে লক্ষ্যে পড়েনি লোকের, তেমন ক'রে আদর পায়নি। কারণ তেমন ক'রে নাট্য দেখবার অভ্যাস যে তৈরী হয়নি মানুষের। তার ওপর দর্শককে গুলিয়ে দেবার জন্যে অন্যধরনের থিয়েটারও তো ছিলো। নইলে এতোদিন পরে একমাত্র আমাকেই পাওয়া গেলো এইসব বিবরণ দিতে! আর-কোথাও তো কেউ এইসমস্ত অভূতপূর্ব সৃষ্টির বর্ণনা লিখে রাখেননি। তাই হয়তো আমরা এই নির্দেশক শিশিরকুমারকে শেষের দিকে হারিয়েছি। তাতে তাঁর নিজের যা-ই কিছু ক্ষতি হ'য়ে থাকুক-না কেন তার চেয়ে ঢের বেশীগুণ ক্ষতি হয়েছে আমাদের দেশের। তাই যখন ভাদুড়ীমশায়ের মৃত্যুর পর সভায় অনুষ্ঠানে অজস্র লোক বক্তৃতায় উচ্ছ্বসিত হলেন তখনো আশ্চর্য লাগলো। তাঁরা সবাই যদি সময় ক'রে শ্রীরঙ্গমে নাট্যাভিনয়টাই দেখতে যেতেন পয়সা দিয়ে টিকিটটা কিনে, তাহ'লে তো তাঁকে ঐ-মঞ্চ ছেড়ে চ'লে যেতে হ'তো না। এ যেন জ্যান্তে ভাত কাপড় না-দিয়ে মরবার পর দানসাগর করা।

তাই আধুনিককালে যে-সমস্ত মুসাফির দল বড়ো কষ্ট ক'রে আধুনিক নাট্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে তার রুচি ও সূক্ষ্মতা যদি আজকের লোকের চোখে ধরা না-পড়ে তাহ'লে যে-ক্ষতি হবে সেটাও কিন্তু আগামীকালে সভায় বক্তৃতা দিয়ে সামলানো যাবে না। ইংরেজিতে বলে, একটা জাতের থিয়েটার দেখেই সে-জাতটাকে চিনতে পারা যায়।

৩

আমি তাঁর সংস্পর্শে আসি আজ থেকে প্রায় ১৯ বছর আগে। তখন আমার বয়স অল্প। দিনের পর দিন আমি উইংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর অভিনয় দেখেছি আর আশ্চর্য হ'য়ে ভেবেছি যে এতো প্রচণ্ড জীবনীশক্তি একটা মানুষের থাকে কী ক'রে! — এখানে একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। অভিনয়ে naturalism-এ আমি কোনো দিন আনন্দ পাইনি। বিরাট

মানুষের বিরাট দুঃখ বা বিরাট আবেগ আমাকে অনেক বেশী মুগ্ধ করে। অভিনয়ের চরিত্র যদি অভিনেতার চরিত্রের চেয়ে অনেক সরল ও সহজতর হয় তাহ'লে অভিনয়ের মধ্যে সেই দ্যুতির মুহূর্তগুলো আসে না, যার অভাবে ভালো অভিনয়ও স্মরণীয় অভিনয় হয় না।

সেই বিরাট আবেগ বা বিরাট অনুভূতি প্রকাশ করতে অভিনেতার প্রচণ্ড জীবনীশক্তির প্রয়োজন হয়। একই সঙ্গে দেহের ও মনের একাগ্র ব্যবহার করতে হয়। এই একাগ্রতাকে একটি তীক্ষ্ণ বিন্দুতে ধ'রে রাখতে যে কী অসম্ভব শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের প্রয়োজন হয় তা বিরাট শিল্পীর শিল্পকর্মকে যদি মনোযোগ দিয়ে দেখা যায় তাহ'লেই বোঝা যায়। শিশিরকুমারের সেই অসাধারণ সামর্থ্য যে না লক্ষ করেছে সে হতভাগ্য।

এবং এইরকম একটা বন্যার মতো দুর্দমনীয় শক্তি ছিলো ব'লেই শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যেন জীবনের মাথায় পা দিয়ে বেঁচে গেলেন। এবং যেদিন যাবার সময় এলো সেদিন তুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এই সবটা নিয়েই মানুষটা। এরও উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্যে। এই স্পর্ধিত বাঁচার মানসিক ঔদ্ধত্য যেন আমরা ভুল না করি। তাঁর যুগের থিয়েটার তিনি বদলে দিয়েছেন আমাদের যুগের কাজ যেন আমরা করতে পারি। এর চেয়ে বড়ো শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তো আর কিছুই হ'তে পারে না।

এবং কাজের শেষে এমনি স্পর্ধিতভাবে যেন আমরাও বলতে পারি যে, কষ্ট আর ক'দিন, যে ক'দিন বাঁচবো এই তো?

১৯৫৯

মহর্ষি

সেদিন ভোরবেলায়, তখনো আলো ফোটেনি ভালো ক'রে, মহর্ষির এক ছেলে নরনারায়ণ এসে বললে, আপনাদের সভাপতি মারা গেছেন।

সমস্ত কীরকম গোলমাল হ'য়ে গেলো। এর আগে কয়েকবার আমরা ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু ঠিক এক্ষুনি কেমন যেন নিশ্চিন্ত ছিলাম আমরা। হালে শরীরটা বরং একটু ভালোই লাগছিলো। আমাদের সবায়ের দিল্লী যাওয়ার কথা অভিনয় করতে। ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই রওনা হবো। হঠাৎ এ কী হ'লো!

দু-একজনকে খবর দিতে গেলাম। ঘুম থেকে উঠে আসে সবাই। সংবাদটা শুনে হঠাৎ সকলে কেমনভাবে ব'লে ওঠে — "মহর্ষি"! যেন এটা ঠিক নয়, যেন এটা হওয়া উচিত ছিলো না। তারপর বজ্রাহতের মতো সব ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে।

তারপরেই বৃষ্টি নামলো কী প্রচণ্ড জোরে।

মহর্ষির বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, তিনি শুয়ে আছেন। মুখটা যেন গম্ভীর। মনে করা শক্ত যে তিনি নেই। এ-মুখভাব আমি জানি। কোনো একটা বিশেষ কথা, যা তিনি ভিতরে ভিতরে ভেবে একটা মত স্থির করেছেন, সেই কথা বলবার আগে এমনিই হ'তো তাঁর মুখের ভাব। এই তো কিছুদিন আগে 'বহুরূপী'র ওখানে তিনি এমনি মুখভাবে বলেছিলেন, "যদ্দিন ডিসিপ্লিন থাকবে তদ্দিনই 'বহুরূপী' থাকবে। আর এই ডিসিপ্লিনই যদি না-থাকে তো দরকার নেই 'বহুরূপী'র থাকবার।"

'বহুরূপী'তে যেন আমাদের পিতৃবিয়োগের কষ্ট। তার চাইতেও বেশী। এ-সংঘ গড়ার অনুপ্রেরণা তাঁর থেকে। তিনিই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে বলেছিলেন, "What is the use of eating our hearts out. আমরা যেমন ক'রে পারি, যেটা ভালো মনে করি, করতে শুরু ক'রে দিই। আমাদের সঙ্গে তো ঝগড়া নেই কারোর। শুরু করো, একটা-কিছু শুরু করো।"

'বহুরূপী' নাম তাঁর দেওয়া।

ফুল এসে পৌঁছতে লাগলো। শাদা ফুলে ফুলে বিছানার চারধারটা ভ'রে গেলো। তার মধ্যে তাঁর মুখ যেন বড়ো বেশী গম্ভীর মনে হ'লো। মনে হ'লো তিনি বারণ করবেন। শাদা ফুল নয়, লাল ফুল দিয়ে রঙীন ফুল দিয়ে তাঁকে সাজানো উচিত। যে-মানুষটি জীবনে অজস্র দুঃখের মধ্যেও হাসিটি অম্লান রেখেছেন, যে-মানুষটি জীবনের এই জীর্ণ প্রান্তে পর্যন্ত দেবী ভারতীর পূজো ক'রে গেলেন, আরতি ক'রে গেলেন নিজের সারা দেহ দিয়ে, তাঁর শেষশয্যা এই শাদা ফুলে যেন রিক্ত দেখায়। রঙ চাই, আরো রঙীন ফুল আনা বুঝি উচিত ছিলো।

আমরা তো জানি শাদা সিল্কের মতো চুলের নীচে ঐ বিশাল মুখটা রসিকতায় ভরপুর ছিলো। তাঁর উপস্থিতি সব সময়েই ঝলমল করতো অজস্র হাসিঠাট্টার বর্ণাঢ্যতায়। সেই সরসতা বাদ দিয়ে মহর্ষিকে মনে করা শক্ত। ছবিতে তাঁর রামকৃষ্ণের চরিত্র অভিনয় দেখে একজন ভক্তিভরে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বলেছিলেন যে নিশ্চয়ই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো — আত্মিক যোগাযোগ। নইলে এমন চরিত্ররূপায়ণ সম্ভব নয়।

মহর্ষি উত্তর করেছিলেন, "তা, আমি তো কোনোদিন চোরের পার্টও করতে পারি আর সেটাও ভালো হ'তে পারে। তা হ'লে কি বলবেন চোরের সঙ্গেও আমার আত্মিক যোগাযোগ আছে ?"

আর-একবার কিছু অল্পবয়সী যুবক রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেয়ে বহু অনুযোগ ক'রে বলে যে তাঁর মতো লোকের যা-তা-সব ছবিতে অভিনয় করা উচিত নয়, কারণ তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাঁর উচিত কেবলমাত্র শিল্পগুণ-সমন্বিত শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে অংশ গ্রহণ করা।

মহর্ষি তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে পান চিবুতে চিবুতে উত্তর দিয়েছিলেন, "আচ্ছা, এবারে যখন কেউ টাকা নিয়ে আমায় অভিনয়ের জন্যে ডাকতে আসবে, আমি ব'লে দেবো যে, না বাপু, তোমরা আমায় বাদ দিয়ে ছবিটা সব তুলে ফেলো। তারপর যদি দেখে ভালো মনে হয় তো তখন আমি ছবিতে ঢুকে যাবো, নইলে যারা আমায় শ্রদ্ধা করে তাদের বড়ো অসুবিধে হয়।"

এ-রকম একটা-আধটা নয়, অজস্র। যিনি একদিনও তাঁকে দেখেছেন তিনিও এ-রকম উদাহরণ দিতে পারবেন। যাঁরা জানেন তাঁরা বলেন, রবীন্দ্রনাথের পর এতো বড়ো ব্যক্তিত্ব নিয়ে আর-কাউকে দেখিনি, যাঁকে দেখলেই এতো আপন মনে হ'তো, এতো শ্রদ্ধা হ'তো।

আমারও দূর থেকে একটা শ্রদ্ধা ছিলো। চিরকাল শুনেছি রঙ্গালয়ের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে-কয়জনমাত্র নিজেদের চারিত্রিক ভদ্রতা বজায় রেখেছেন, মহর্ষি তাঁদের অগ্রগণ্য। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো রঙমহল থিয়েটারে। বলা যায়, তিনিই খানিকটা গায়ে প'ড়ে আলাপ করলেন। এ তিনি করতেন, থিয়েটারে নতুন লোক ঢুকেছে দেখলেই তিনি একবার আলাপ ক'রে বাজিয়ে দেখতেন। যে-আশা নিয়ে, যে-আদর্শ নিয়ে তিনি থিয়েটারে ঢুকেছিলেন তা প্রায় তাঁর সামনে থেকে তখন মুছে যাচ্ছে। ব্যাকুলভাবে তিনি খোঁজ করতেন সেই সমস্ত নতুন মুখের যারা তাঁরই মতো আশা নিয়ে, তাঁরই মতো আদর্শ নিয়ে থিয়েটারে আসবে। আমি দেখেছি তিনি কতো লোককে স্নেহ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, বিদ্যা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে উন্নত করতে চেয়েছিলেন, যাতে থিয়েটারটা ভালো হয়, তারা নিজেরাও ভালো হয়। কিন্তু ব'য়ে গেছে তাদের, খ্যাতির ফেনায় চুমুক দিতে শুরু ক'রেই তারা যে যার নিজের পিছল পথে নিজেরই মানবচরিত্রের অপমান করতে করতে দূরে পিছলে গেছে। অন্তত দু-বার এইরকম ঘটনায় আমি মহর্ষিকে কষ্ট পেতে দেখেছি। তারপর নিজেই আবার হাসতেন, নিজের সদুদ্দেশ্যটাকেই ব্যঙ্গ করতেন। এক এক সময়ে তাঁর মনের ভেতর এমন একটা ক্ষোভ জ'মে উঠতো যে সব-কিছুকে ব্যঙ্গ করতেন, যেন পৃথিবীতে কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু হবে না ভবিষ্যতে। থিয়েটারে অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে অশ্লীল গল্পে যোগ দিতেন। কারণ তা ছাড়া তো কিছু করবার নেই।

কিন্তু যখন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তৈরী হ'লো, মনে হ'লো তিনি যেন কেন্দ্র পেলেন। কতো কথায় কতোরকমভাবে যে তিনি আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। একটা চিঠি লিখেছিলেন —

"Individualism বা ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায় 'কাঁচা আমি'তেই তো যতো গোল! কিন্তু ও কাঁচা ঘুটিকে পাকিয়ে তুলে 'পাকা আমি' ক'রে তোলা শুধু সাধনার কর্ম নয়। বিশ্বাসীদের পক্ষে, ভগবৎকৃপার দরকার;

আর বিপ্লবীদের পক্ষে দরকার সমাজের আমূল পরিবর্তন। যতোক্ষণ তা না-ঘটছে, ততোক্ষণ এই কাঁচা আমিগুলিকে নিয়েই মিলিয়ে ঝুলিয়ে ঘর ক'র্ত্তে হবে। এখনকার সঙ্গীত তাই যতো বেসুর নিয়ে সুরের হার্মনি। কসরৎ বেশী, সৃষ্টির আনন্দ তাই ব'লে কম নয়।...কর্মের পথেই জ্ঞান শুদ্ধতর হয়, গভীরতর হয়।...কর্ম যেমন জ্ঞানের মূল, দেহ তেমনি কর্মের মূল। তোমার দেহের ঘুণগুলির সঙ্গে লড়াই সমানে চালিয়ে যেয়ো সঙ্গে সঙ্গে, যতদিন-না সে-বেটারা সমূলে উচ্ছেদ হয়।"

একবার তিনি বলেছিলেন, — "জীবনে বহু জিনিস ভেঙে যেতে দেখলাম। যে-সমাজে জন্মেছিলাম সেটা ভেঙে গেলো, যে গুপ্ত সমিতিতে ঢুকেছিলাম সেটা ভেঙে গেলো, যে-কংগ্রেসে ঢুকেছিলাম সেটা ভেঙে গেলো, থিয়েটার ভেঙে গেলো, ভাঙার ইতিহাসেই অভিজ্ঞতা পূর্ণ। তাই তো ভাবি, তোমরা যে এতো উৎসাহে লেগেছো, এটা যদি ভাঙে, তাহ'লে তোমরা কী করবে?"

আমি খুব তর্ক করেছিলাম, এ-জিনিস যে ভাঙতে পারে না সে-সম্বন্ধে অনেক যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করলাম, শেষকালে উত্তেজিত হ'য়ে বললাম, "আসলে তো সমস্ত নির্ভর করছে আমাদের ওপর, আমরা যদি না ভেঙে যাই তাহ'লে ভাঙবে কেন?"

এইটাই যেন এতোক্ষণ শুনতে চাইছিলেন মহর্ষি, ব'লে উঠলেন, "এই, এইটাই কথা।"

তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে আমার কোনোদিন বাধতো না। কখনও মনে হ'তো না যে তিনি অনেকদিন আগের লোক, তাঁকে আমার মনের কথা সব বোঝাতে পারবো না। একেবারে আমাদের সমসাময়িক ব'লে মনে হ'তো, খালি জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। তাই কোনো সঙ্কোচও ছিলো না। সবরকম বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি আমি। সাহায্যও পেয়েছি।

যখন গণনাট্য সংঘের মধ্যে কাজ করা সম্ভব হ'য়ে উঠলো না, তখন তাঁরই কথায় 'বহুরূপী'র সৃষ্টি। তিনি পুরোধায় না-থাকলে, তিনি উপদেশ না-দিলে বাঙলায় নবনাট্য আন্দোলন যতোটুকুও করতে পেরেছে তা-ও পারতো না। আজকাল আমরা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রাণহীন অস্বাভাবিক বাচনভঙ্গী ছেড়ে স্বাভাবিকভাবে যে-অভিনয় করবার চেষ্টা করি তার শুরুতে আছেন মহর্ষি ও যোগেশ চৌধুরী মহাশয়। এই দু-জন অসামান্য শক্তিধর

অভিনেতা বাঙলাদেশের আধুনিক অভিনয়ভঙ্গীর প্রবর্তক। পেশাদারী মঞ্চের সকল অভিনেতার থেকে এঁদের ভঙ্গী একেবারে পৃথক্ ছিলো। এঁদের মধ্যে আবার বিশেষ ক'রে ঋণী আমরা মহর্ষির কাছে। 'নবান্ন' অভিনয়ের সময়ে চটের পর্দা ব্যবহার ক'রে যে-নূতনত্ব আনা হয়েছিলো সেটা মহর্ষিরই উপদেশে। কিন্তু আমরা তাঁর কিছুই করতে পারলাম না। না-পারলাম সুখী করতে, না-পারলাম শান্তি দিতে। যদি আমরা এতোদিনে নিজেদের একটা মঞ্চ তৈরী করতে পারতাম, যেখানে সবাই এসে নাট্যপ্রযোজনার নতুন নতুন পরীক্ষা চালাতে পারবে তাহ'লেই তিনি সুখী হতেন, শান্তি পেতেন। একটা মঞ্চ, নবনাট্য আন্দোলনের নিজস্ব একটা মঞ্চ। কতোবার আমরা এই নিয়ে ভেবেছি, কতোবার আমরা এই নিয়ে আলোচনা করেছি. কিন্তু কেবলি থেমে গেছি টাকার কথা ভেবে। যারা দিতে আগ্রহশীল, যারা দিয়ে আনন্দ পাবে, তাদের টাকা নেই। আর যাদের টাকা আছে তাদের এ-ব্যাপারে আগ্রহ নেই। জানি। সব যুক্তি জানি। কিন্তু যুক্তি দিয়ে তো বীর্যের প্রমাণ হয় না। আমাদের তবু পারা উচিত ছিলো। পারা উচিত ছিলো একটা মঞ্চ তৈরী করতে। মহর্ষির কাছে প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন ছিলো যে, আপনার আশার সম্মান আমরা রাখবো আমরা একেবারে অপদার্থ নই।

কতোবার কতো আলোচনা হয়েছে যে, স্টেজ করতে পারলে তারই পিছনে একটা ঘরে মহর্ষি থাকবেন। বলতেন, "বুড়ীটাকেও নিয়ে আসবো, তোমাদের 'কমিউন মাদার' হবে।" বলতেন, "করো, করো। আমার কি এখন খাটবার বয়স। আমার এখন পেন্সন নেবার বয়স, আর ব'সে ব'সে সমালোচনা করবার বয়স।" বলতেন, "অনেক ভেঙে যাওয়া দেখলাম, একটা-কিছু গ'ড়ে তোলো। এমন ক'রে গ'ড়ে তোলো যা থাকবে।"

কী বলবো, কী ভাববো এখন ! —

তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ'লো। আগুন দেওয়া হ'লো। এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সেই মহৎ মানুষটির আর-কিছুই রইলো না। একজনকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম আমরা, কিন্তু এখন সে আর কোথাও নেই, কোথাও না।

১৩৬০

কয়েকটি অভিনয়ের জন্মকথা

অভিনয়ের জন্য নাটক নির্বাচন করা আর গরীব কেরানীর একমাত্র মেয়ের জন্য পাত্র নির্বাচন করা একই ব্যাপার। যা মনে ধরতে পারে তা নাগালের বাইরে আর যারা নাগালের মধ্যে তাদের সম্পর্কে মন যেন কেমন নিরুৎসাহ। তা-ও আবার সংখ্যায় এতো কিছু বেশী নয়, এবং হাতে সময়ও এতো দ্রুত অপসৃত হচ্ছে যে র'য়ে ব'সে খোঁজার উপায় নেই। অতএব শেষ-পর্যন্ত যাতে হোক্ চক্ষু বুজে সম্প্রদান ক'রে কেরানী নিজের মনকে আশ্বাস দিয়ে বলেন — "বিধাতার লিখন।— দেখা যাক কি হয়।"

আমাদের অনেকটা সেই অবস্থা। এবং সেইজন্যই প্রত্যেক দলের উচিত নাট্যকারকে বাঁচিয়ে রাখা, তাঁকে উৎসাহ দেওয়া। অবশ্য আমাদের সামর্থ্য কিছুই না, কিন্তু এটুকু তো আমরা করতে পারি যে নাটক নির্বাচিত হ'লেই সেই নাট্যকারকে প্রতি অভিনয় রাত্রে কিছু টাকা royalty হিসাবে পাইয়ে দেওয়া। জানি, সে-ও খুব সামান্য টাকা, তবু আর-কেউ একপয়সা পাবার আগে যে আমরা নাট্যকারকে সম্মান দেবার চেষ্টা করি এটারও একটা দাম আছে। এটা করা উচিত। প্রথম থেকেই।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি মোটামুটি দু-ধরনের নাটক আমাদের হাতে আসে। এক, যাতে গল্পটি খুব ভালো কিন্তু চরিত্রগুলো অস্পষ্ট বা অসঙ্গ-তিতে পূর্ণ। আর হচ্ছে চরিত্রগুলো খুব স্পষ্ট কিন্তু গল্পটা অত্যন্ত দুর্বল। এ ছাড়াও আর-একরকম নাটক লেখা হয় যার না চরিত্র না গল্প — কোনোটাই মন টানে না। সেগুলোকে মোটামুটি অক্ষম বলা যায়। তাদের কথা যাক। গল্প বা চরিত্রগুলো দুটোই যেখানে মনোহারী সে তো মহানাটক। তা চট ক'রে পাওয়ার আশা না-করাই ভালো। অতএব তার কথাও যাক। নাটুকে দলের কর্তব্য হচ্ছে উপরি-উক্ত গুণের কোনো একটি থাকলেই সেই নাটক নিয়ে সাধ্য-মতো চেষ্টা করা দাঁড় করাবার। গল্পে যদি খামতি থাকে তা'হলে সকলে মিলে চেষ্টা করা যে কী ক'রে কোনো নতুন ঘটনা এনে গল্পটাকে আরো হৃদয়-গ্রাহী করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি 'বহুরূপী'র 'পথিক' নাটক। প্রথম

লেখায় কোলিয়ারীর দুর্ঘটনার কোনো কথাই ছিলো না, এবং সেই কারণে বাউড়ীদের ভূমিকা অত্যন্ত ছোটো ছিলো। পুরো নাটকটার শেষটাই ছিলো অন্যরকম। তখন দলের মধ্যে আলোচনা-সভা বসলো যে কী উপায়ে গল্পের মধ্যে নতুন উপাদান এনে এর নাটকীয়তা আরো বাড়ানো যায়। আলোচনায় যা স্থির হ'লো সেটা নাট্যকার শ্রী তুলসী লাহিড়ী মহাশয়কে বলা হ'লো এক-দিন। তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই একটা নতুন অঙ্ক লিখে আনলেন — সেইটা এখনকার 'পথিক' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক। শুনে আমরা মুগ্ধ হ'লাম। কারণ, মনে মনে আমাদের ভয় ছিলো যে ফরমায়েসে ভালো লেখা সৃষ্টি হয় না। তুলসীবাবু কেবল যে আমাদের পরামর্শগুলো নিলেন তা নয়, তার পরেও কিছু দিলেন। সে হ'লো রাসু ধরের অনন্য চরিত্র, যা পরে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয়ে অবিস্মরণীয় হয়েছে। এবং এই পরিবর্তনের ফলে নাটকের শেষটাও বদলে যেতে বাধ্য হ'লো। যে বাউড়ী চরিত্রগুলো আদিতে তুচ্ছ ছিলো তারাই নায়ক হ'য়ে উঠলো — একা নয়, সমগ্রভাবে এবং নাটকের মহৎ কথা তাদের মুখ দিয়েই বর্ণিত হ'লো।

অবশ্য এ-আশা করা অন্যায় যে এইরকম চেষ্টা করলেই হাতে হাতে মহানাটক তৈরী হ'য়ে যাবে। কিন্তু মহানাটকের কথা পরে হবে, আপাতত আমাদের কাজ চলার মতো নাটক চাই। এবং সে-নাটকে হয়তো অনেক ত্রুটি থাকবে, তবু আমরা অভিনয় করবো — জেনেশুনেই করবো, কারণ আজকের দিনে এই চেষ্টা না-চললে আগামী দিনের মহানাটকের পথও মুক্ত হবে না। আমাদের কাজ হ'লো ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে সামান্য একটা আঁকাবাঁকা পথের ইঙ্গিত তৈরী করা; প্রতিভা যে-দিন আসবে সে-দিন এই পথের উপর দিয়ে রোলার চালিয়ে সে নতুন সড়ক তৈরী ক'রে দেবে। আমাদের কাজ হ'লো সেই প্রতিভার জন্য পরিবেশ তৈরী ক'রে যাওয়া।

যেখানে গল্পটি খুব ভালো কিন্তু চরিত্রগুলো অস্পষ্ট বা সংলাপ দুর্বল সেখানে নাট্যকে দলের কাজ হ'লো অভিনয়ের দ্বারা গল্পটিকে জীবন্ত ও অনিবার্য ক'রে তোলা। বহুদিন আগে বর্নার্ড শ দুজে-র অভিনয় দেখে মুগ্ধ হ'য়ে একটি সমালোচনা লিখেছিলেন। নাটকটি ছিলো Sudermann-এর লেখা *Die Heimat*। Magda নামে একটি মেয়ে বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় এবং গাইয়ে হিসেবে রোজগার করবার চেষ্টা করতে

থাকে। সেই সময়ে একটি ছেলের সঙ্গে তার প্রেম হয়, কিন্তু Magda যখন অন্তঃসত্ত্বা তখন সেই ছেলেটি তাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যায়। তারপর Magda অনেক কষ্টের পর খুব নাম করে এবং নিজেই আগ্রহী হ'য়ে বাপের সঙ্গে বনিবনা ক'রে বাড়ীতে ফিরে আসে। ফিরে আসবার পর হঠাৎ একদিন দেখে যে তার পূর্ব প্রেমিক এ-বাড়ীর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই দৃশ্যটি বর্নার্ড শ বর্ণনা করেছেন। যখন Magda ঝিয়ের হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে নামটা পড়লো। তারপর তার আপ্রাণ চেষ্টা নিজেকে সংযত রাখবার। এবং সে রাখলও। যখন সে-লোকটি এলো, ফুল উপহার দিলো, দু-একটা তুচ্ছ কথা হ'লো — তখন বেশ বোঝা গেলো যে Magda সামলে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, দুজে-র Magda নিজেই বুঝতে পারলো যে সে সামলাতে পেরেছে এবং ভয়ের জায়গাটা পার হ'য়ে এসেছে। এইবার তার মনে হ'লো, সে সহজ হ'তে পারে, — খুব সহজেই কথা বলতে পারে, এমন-কি তাকাতেও পারে 'ওর' দিকে। হঠাৎ তার ইচ্ছে হ'লো দেখতে যে 'ওর' চেহারা কতোটা বদলেছে এতোদিনে। এই দেখতে গিয়ে হ'লো বিপদ, Magda অনুভব করলো তার মুখ লাল হ'য়ে উঠছে। বৃথাই সে চেষ্টা করলো মুখ আড়াল করার, অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার, — কিছুতেই কিছু হ'লো না, সমস্ত মুখে তার যেন রক্ত এসে ছড়িয়ে পড়লো, Magda হঠাৎ দু-হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে ফেললো।

এই-যে বিবরণ এটা কিন্তু নাটকের নয়। এটা সম্পূর্ণ অভিনয়ে তৈরী করা। নাটকে এর ইঙ্গিতমাত্র নেই। একটা অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভা নাটকের সেই সাক্ষাৎকারের ঘটনাটিকে মাত্র অবলম্বন ক'রে এমন-একটা জীবন্ত শিল্প তৈরী করলেন যে নাটক ধন্য হ'য়ে গেলো। অবশ্য আমরা অনেকেই সেই প্রচণ্ড শিল্পক্ষমতার অধিকারী নই যাতে মাটি ছুঁয়ে সোনা ক'রে দিতে পারি। কিন্তু আমাদের সততা ও প্রগাঢ়তা নিয়ে যদি আমরা চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি তাহ'লেই দেখা যাবে একে একে চরিত্রগুলো স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। এবং সেই যথার্থ চরিত্র নাটকের গতি বেগবতী রাখতে যা বলবে তাই হবে সংলাপ।

আমরা যে কে কেমন মানুষ তা প্রকাশ হয় আমাদের সামাজিক ব্যবহারের দ্বারা, কার সঙ্গে কেমন আচরণ করি তা থেকে। নাটকের পাঁচটা

লোকের পরস্পরের মধ্যে সেই যে বিচিত্র সম্পর্ক সেইটা যে-অভিনয়ে যতোটা ধরা পড়বে সেই অভিনয়ই ততোটা মনোগ্রাহী। এবং সেইখানেই নাটকের গতি বা পরিণতি ততোটা অনিবার্য মনে হবে। এবং তাতে প্রয়োজনানুযায়ী যে অদল-বদল করতে হবে তা আশা করা যায় যে কোনো সৎ-মনা নাট্যকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না। তাতে তাঁরই লাভ।

এইভাবে নাটক তৈরী হ'লে তারপর অভিনয়।

অভিনয় অর্থে প্রথমে ধরা যাক সামগ্রিক অভিনয়। যার মধ্যে কেবল অভিনেতা অভিনেত্রীরাই যে অভিনয় করবেন তা নয়, দৃশ্যসজ্জা আলোকনিয়ন্ত্রণ এমন-কি অঙ্কের শেষে প্রচ্ছদ প্রক্ষেপণের মধ্যেও যেন অভিনয় থাকে। অবশ্য এ-সব কথা আমাদের সকলেরই জানা, — খুবই জানা। কিন্তু সেই-যে প্রবাদ আছে, 'ইচ্ছে করে মস্তো এক জামবাটিতে এক বাটি গরম দুধ নিয়ে ফুঁ দিই আর খাই, খাই আর ফুঁ দিই ; কিন্তু শুধু ঐ ইচ্ছেটি আছে আর ফুঁটি আছে, দুধও নেই জামবাটিও নেই।' আমাদেরও সেই অবস্থা। ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। কিন্তু দায়িত্বটি আছে। আমাদের নাট্যাভিনয়ে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের তুলনায় অনেক বেশী নিষ্ঠা, অনেক বেশী বুদ্ধি, অনেক বেশী রুচির প্রকাশ দেখতে আশা করে লোকে। এ কিন্তু আমাদের গৌরব। লোকে আমাদের সীরিয়াস্‌লি দেখতে শুরু করেছে ব'লেই আমাদের নিয়ে এতো আলোচনা করে। ঠিক আছে, আমাদেরও হঠলে চলবে না। এ-আশার সম্মান রাখতে পারলে তবেই আমরা বাঁচবো। অসুবিধার মধ্যে লড়াই করলে তবেই আমরা বাড়বো। কী হয়েছে — ঢাল নেই তো নেই-ই, তরোয়াল নেই তো নেই-ই, খাম্‌চি মারেঙ্গা হঠেঙ্গা নেহি।

গোড়াতেই ভাবার দরকার নাটকটাকে কেমন ক'রে সাজালে খুব ভালো লাগবে। একেবারে খুব ভালো লাগবে এইরকম চিন্তা করা চাই। তা সে-চিন্তার চোটে যদি দেখা যায় যে খরচের অঙ্ক চার শূন্য পেরিয়ে গেলো তাতেও পরোয়া নেই। আরে, হবে না তা তো জানি, তাই ব'লে ভাবনায় ভিখারী হবো কেন? — (অন্যের কথা জানি না, এ-ক্ষেত্রে আমাদের কিছু লোকের যা মনে হয় তাই বলছি। এটাই একমাত্র পথ নয় নিশ্চয়ই। তবে একটা পথ।) এইরকম লাগামছাড়া কল্পনার পর আবার ভাবতে বসি, আচ্ছা কী কী বাদ দিলে বা বদ্‌লালে জিনিসটার প্রাণ খানিকটা থাকবে অথচ

অনেক সস্তায় হবে। এই ভাবতে গিয়ে দেখি ভেলভেটের জায়গায় চট চ'লে এলো, দোতালায় ওঠবার সিড়িটা হয় অন্তরালে চ'লে গেলো, নয়তো একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর আর-একটা প্যাকিং বাক্সকে বসিয়ে এককোণা থেকে তার আন্দাজ দেওয়া হ'তে লাগলো, ঘন বনের জায়গায় হয়তো দু-তিনটে অশ্বত্থের ডাল শোভা পেতে লাগলো।

এইখানে একটা কথা মনে পড়ছে। আমরা যখন 'নবান্ন' করেছিলাম তখন আমরা পর্দার জন্য চট ব্যবহার করেছিলাম। তার আগে পুরো নাটকে চটের পর্দা ব্যবহার করা হ'য়ে থাকলেও আমরা জানি না। আমাদেরও মাথায় আসেনি। একদিন সকালে মহর্ষির বাড়ী গেছি, এবং এইসব আলোচনা হচ্ছে যে কী দৃশ্যপট রাখা যায় বিভিন্ন দৃশ্যে। পেশাদারী মঞ্চে আঁকা পট ছাড়া পাওয়া যাবে না, অথচ বনস্থল বা গৃহস্থল আঁকার সে যা বাহার — আমরা তা ব্যবহার করতে কুণ্ঠা বোধ করি। কী করা যায়! মহর্ষি হঠাৎ বললেন, পর্দা ব্যবহার করো! আর তার সামনে যে-সমস্ত আলাদা আলাদা প্রতীক দিতে চাচ্ছো — লাগিয়ে দাও!

আমি আঁৎকে উঠলাম। পর্দা সে তো অনেক খরচ! মহর্ষি বললেন, কেন? আমরা গরীব, আমরা চটের পর্দা করবো। অন্যলোকে যেখানে ভেলভেট লাগায়, পাইন কাঠ লাগায়, আমরা সেখানে চট লাগাবো, বাঁশ লাগাবো। আর সেটা চাষার জীবনের নাটকে একটা ঠিক আবহাওয়াও তৈরী করবে। চট লাগাও, চট।

সেই হ'লো চট ব্যবহারের শুরু। নতুন চটের পর্দার ওপর যেদিন প্রথম মঞ্চের সমস্ত আলো পড়লো সেদিন তার সেই ঝকঝকে চেহারা দেখে আমরা মোহিত হ'য়ে গেলাম। সে-রঙের মধ্যে একটুও গরীবিয়ানা নেই। আজও তাই নতুন চটের পর্দার ওপর আমার ভীষণ দুর্বলতা আছে।

যাই হোক্, এইরকম সস্তা করতে গিয়ে দেখা যাবে যে অনেকগুলো পদই বাদ দিতে হচ্ছে ঐ পয়সার জন্যে। যেমন ধরুন, একটা চাষার বাড়ীর আগুন দেখাতে হবে। আপনার প্রথম কল্পনায় সেখানে ছিলো চমৎকার ক'রে নিকানো একটা দাওয়া, তার ওপরে উল্টানো নৌকার ছাদে খড়ের চাল, একদিকে একটা মরাই, তার কাছে একটা দুটো লঙ্কার গাছ, সেইখানে এককোণে লাঙলটা রাখা, গোয়ালঘর, মাটির মধ্যে গামলা পুঁতে গরুর জাব্না

দেওয়ার জায়গা, তারপর মাটির দেয়াল, তার ও-পারে হয়তো একটা জাম গাছ, আরো-সব বড়ো বড়ো গাছের মাথা ক্রমশ দূরে চ'লে গেছে, আরো দূরে — সব গাছের পিছন থেকে যেন লাফিয়ে উঠেছে এক বিস্তীর্ণ নীল আকাশ, সেখানে থোপা থোপা নরম শাদা মেঘ, আর মেঘের বুকে চিল।

এখন, এগুলো কি সাজানো সম্ভব! অবশ্য যাবে না কেন, বিদেশ থেকে বহু পয়সা ব্যয় ক'রে কেউ যদি আনান নানারকমের যন্ত্রপাতি তাহ'লে মেঘগুলোকে উড়িয়ে পর্যন্ত দেওয়া যায় এ-ধার থেকে ও-ধার। কিন্তু আমরা তা পারবো না। অতএব, যাক্ মেঘ। মেঘের পর যাওয়াতে হবে বড়ো বড়ো গাছের মাথাগুলোকে ও দেওয়ালের পিছনের বড়ো গাছটাকে। কারণ, মঞ্চে অতো জায়গা পাওয়াই সাধারণত শক্ত। এমনি ক'রে একে একে সব যাবে, সবাই যাবে। থাকবে শুধু নাটকের চরিত্রগুলো, আর একটা আবহাওয়া তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা।

তখন মনে হবে, আচ্ছা আমরা কী করতে চাই! শুধুই কি একটা মনোরম দৃশ্যসজ্জা চাই কেবল দৃশ্যসজ্জারই জন্যে? নাকি একটা উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে চাই নাটকটির জন্যে? পরিবেশ রচনাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে ভাবা যাক কী কী জিনিস সেই পরিবেশকে সাহায্য করবে অথচ নাটকটিকে ক্ষুণ্ণ করবে না। যেমন ধরুন, আপনি হয়তো চালালেন একটা মেঘের মেশিন, সত্যি-দেখতে একটা আকাশের ওপর। আর দর্শকেরাও অমনি নাটক ছেড়ে অভিনয় ছেড়ে বলাবলি আরম্ভ করবে, 'দেখছিস্, মেঘটা নড়ছে কীরকম।' অর্থাৎ গেলো আপনার নাটক। তার চেয়ে মেঘ না-নাচিয়ে আর কিছু করা যাক। ধরুন আমাদের দেশী আঁকার পদ্ধতিতে যদি সমস্ত জিনিসটা এঁকে পট হিসাবে পিছনে ফেলা যায়। তাতেও অসুবিধা আছে। প্রথমত বিভিন্ন মঞ্চের মাপ ভিন্ন। এক মাপের পট অন্য মাপের মঞ্চে হয় ছোটো হ'য়ে দু-পাশে ফাঁক বেরিয়ে পড়বে, আর নয়তো বড়ো হবে, পাশগুলো দেখাই যাবে না। অবশ্য এটা এড়ানো যায় ছবিটাকে যথেষ্ট পরিমাণ ছোটো ক'রে যদি একটা বড়ো পর্দার মাঝখানে আঁকা যায়, তাহ'লে স্টেজ ছোটোবড়ো অনুসারে খালি ছবিটার চারপাশের ফ্রেমটা ছোটোবড়ো হবে।

কিন্তু দ্বিতীয় অসুবিধে হচ্ছে, প্রত্যেক দলের পক্ষে কি একজন আঁকিয়ে এনে রঙ তুলির খরচা ক'রে অতোবড়ো একটা পর্দাকে টাঙানোর ব্যবস্থা ক'রে ছবি আঁকানো সম্ভব? আমার মনে হয় — না। এবং যাদের পক্ষে সম্ভব নয় তাদের জন্যেই যখন মূলত আমার এই লেখা তখন ধ'রে নেওয়া যাক্ সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত কোনো-একটা বিশেষ জায়গায় খাপ খেলেও সাধারণত জীবন্ত মানুষের চলাফেরার পিছনে দ্বিমাত্রিক একটা পট কেমন যেন খাপ খায় না — তা সে যতো সুন্দরই দেখতে হোক্-না কেন। অন্তরঙ্গ হয় না। এই মানুষগুলোরই যে ঘরবাড়ী ঐগুলো এটা মনের মধ্যে উপলব্ধি হয় না। এবং এই কারণেই গত শতাব্দীতে অ্যাডল্ফ আপ্পিয়া ব'লে এক ভদ্রলোক আঁকা সীন্ উড়িয়ে দিয়ে মঞ্চের ওপর জিনিস আমদানি করলেন, যেমন একটা চবুতরা বা খানিকটা সিঁড়ি, বা খানকয়েক থাম। তাঁর বলবার কথা ছিলো যে, জীবন্ত অভিনেতাদের আশেপাশে এইসব জিনিসই একটা ঠিকমতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে - একটা অন্তরঙ্গ নাটকীয় পরিবেশ। এবং একেই সাহায্য করবে আলোকসম্পাত।

আঁকা পট সম্বন্ধে তিনি নাকি ছিলেন খড়্গহস্ত। তবে অবশ্য আর-এক ভদ্রলোক ছিলেন মিউনিকে, নাম ফুক্স্, তিনি এক থিয়োরী বলেন। তিনি বলেন যে, আঁকা পটও যেমন অবাস্তব, তেমনি ও ত্রিমাসিক থাম বা সিঁড়িও অবাস্তব। কারণ সত্যকার পরিপ্রেক্ষিত তো কখনই মঞ্চের ওপর সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তার চেয়ে, পটটাকে সজ্জা হিসাবে ব্যবহার করাই ভালো, নানা-প্রকার কারুকার্যময় আঁকার রীতিতে। জীবন্ত মানুষের পটভূমিকা হিসাবে সেটাই ঢের ভালো কাজ করবে, ত্রিমাত্রিক থাম, সিঁড়ি বা চবুতবার চাইতে।

এ-রকম যতো থিয়োরী হয়েছে, সবই আমি দেখেছি একটু-না-একটু সাহায্য করে এক একটা বিশেষ ক্ষেত্রে। সমস্তই যখন নির্ভর করে নাটকটার ওপর তখন নাটকের মূল সুর অনুযায়ী দৃশ্যসজ্জা কখনও ত্রিমাত্রিক দিয়ে কখনও-বা দ্বিমাত্রিক ছোটো ছোটো পট দিয়ে করা যায়। যেমন, নানান্ সাইজের কাঠের ফ্রেম ক'রে তার ওপর কাপড় এঁটে নেওয়া গেলো। এবং কোনো ফ্রেমের ওপর মরাইটা, কোনো ফ্রেমের ওপর বাড়ীটা এইরকম আঁকিয়ে সেইগুলোই সাজিয়ে দেওয়া গেলো মঞ্চের ওপর। তারজন্যে খুব-একটা অভিজ্ঞ

শিল্পীর দরকার করে না। নিজেরাই মাপজোখ ক'রে লাগিয়ে দেওয়া যায়। এবং ঠিকমতো রঙ ব্যবহার করতে পারলে খুব-একটা কাব্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হ'তে পারে। কিন্তু যেখানে কাব্য মুখ্য নয়, মুখ্য হ'লো নাটকীয়তা -- সেখানে ? সে-কথা বারান্তরে।

এবার আধুনিক কয়েকটা নাটকাভিনয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। 'পথিক' ও 'উলুখাগড়া'। 'পথিক' — একই স্থানে পুরো নাটকটির অভিনয়। সুতরাং খুঁটিনাটি খেয়াল ক'রে একবার স্টেজকে সাজিয়ে ফেলতে পারলেই হ'য়ে গেলো। 'উলুখাগড়া'তেও প্রথমে ছোট্টো দৃশ্যটি বাদে বাকী নাটকটার একটাই পটভূমিকা। অতএব অনেক আকারের অনেক জিনিস আমাদের পক্ষে আমদানি করা সহজ হ'লো। যেমন, চেয়ার, টেবিল, তক্তপোশ, দাঁড়ানো আলো, বই-আলমারি ইত্যাদি। এর ফলে মঞ্চটাও যেমন সাজানো দেখতে হ'লো, অভিনেতাদেরও তেমনি অভিনয়ের পক্ষে অনেক সুবিধা হ'লো। নইলে ধরুন, দু-জনের প্রেমের একটা দৃশ্য আছে, সেখানে ফাঁকা স্টেজে এগিয়ে এসে দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে — হয় হাতের নয় পায়ের নখ খুঁটতে খুঁটতে, নয়তো আঙুলে আঁচল পাকাতে পাকাতে — প্রেমের অভিনয় করতে হ'তো। সে এক নরকযন্ত্রণা।

সুতরাং এই আসবাবপত্রগুলো যতো বেশী জরুরি হ'য়ে উঠলো, পট-ভূমিকায় দৃশ্যপট কিন্তু সেই অনুপাতে নগণ্য হ'য়ে যেতো লাগলো। দৃশ্যপটের অবান্তর আকর্ষণ থেকে মন স'রে এসে নিবদ্ধ হ'লো সামনে, — অভিনয়ের ক্ষেত্রে। সেইজন্য 'পথিক'-এ আমরা স্টেজের তিনদিক মুড়ে দিয়েছিলাম চটের পর্দায় দরজা-জানালাগুলো তারই গায়ে কাটা ছিলো। আর 'উলুখাগড়া'য় প্রয়োজন মাফিক দরজা-জানালাগুলোই মঞ্চের ওপর খাড়া ক'রে দেওয়া হয়েছিলো। আর পিছনে ছিলো কালো পর্দা। কেউ যখন যাতায়াত করছিলো খাড়া-করা দরজার ফ্রেমের ভিতর দিয়েই করছিলো, যদিও তার আশেপাশেও তখন সেই এন্তার জায়গা, কারণ দেওয়াল তো দাঁড় করানো হয়নি। অথচ দেখা গেলো, দর্শকের মন তাতে একটুও বিক্ষিপ্ত হয় না।

তারপর হাতে এলো 'ছেঁড়া তার'। এ-নাটকে তিন অঙ্কে ন'টা দৃশ্য। অর্থাৎ দ্রুত পরিবর্তন প্রয়োজন। অতএব কোনো দৃশ্যেই আসবাবপত্র বেশী আনা । মোটের মাথায় দৃশ্য হচ্ছে গ্রাম্য পথ ও রহিমুদ্দির বাড়ি।

আর তিনটি দৃশ্য আছে — যাকে বলি, মধ্যবিত্তের বসবার ঘর। দুটি — একজন এগ্রিকালচারাল অফিসারের বসবার ঘর, আর-একটি — গ্রাম্য জোতদারের ঘর। সাজানো হিসাবে সবচেয়ে মার খেলো এই দৃশ্যগুলি। একটা চটের পর্দার ওপর এক-আধটা আসবাব বা জানালা এঁকে দেওয়াই হ'লো, আর তার সামনে দু-একটা চেয়ার বা মোড়া। মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ আমাদের ক্ষমতা হিসাবে এর চেয়ে বেশী মাথায় এলো না। মন দেওয়া হ'লো সাধারণ চাষীদের দৃশ্যগুলির ওপর। দূর থেকে দেখলে গ্রামের যে-চেহারাটা চোখে পড়ে সেইরকম একটা ছবি আঁকা হ'লো পিচ-বোর্ডের ওপর। তার খাড়াই আড়াই ফুট, আর লম্বায় ফুট তিরিশেক। সেই-টাকে কাঠের ফ্রেমে সেঁটে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'লো পিছনের পর্দার একদম গায়ে। যখন সাধারণ গ্রাম্য পথের দৃশ্য তখন মঞ্চের ওপর আর-কিছুই থাকছে না। আবার যখন চাষী রহিমুদ্দির বাড়ীর দৃশ্য, তখন একটা হাল্কা তক্তপোশের ওপর কুটীরের সামনেটা বানানো ছিলো, সেইটাকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছিলো মঞ্চের ওপর। প্রথম অঙ্কের জন্য অপরদিকে একটা কলাগাছ ও একটা ছোট্টো ঝোপড়ি মতনও করা হ'তো। সেগুলো অবশ্য দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির দৃশ্যে আর হ'তো না। যাই হোক্, আমাদের নিজে-দের হাতে কোনো মঞ্চ না-থাকার দরুন এবং নাটকটিতে অনেক দৃশ্য পরিবর্তনের প্রয়োজন থাকায় আমরা না-পেরেছি ভদ্রলোক মহিমের বাড়ীটা ঠিকমতো সাজাতে, না-পেরেছি চাষী রহিমের উঠোনটা সাজাতে। কিন্তু নাটকের ও অভিনয়ের গুণে 'ছেঁড়া তার' জ'মে গেলো। আমরা বুঝলাম যে নাটক এবং তার অভিনয়ই হ'লো আসল বস্তু। তাতেই অনেকখানি দর্শকের মনকে টানে। কিন্তু এরই সঙ্গে যদি চোখকেও তৃপ্তি দেওয়া যায় তাহ'লে আরও টানে। তাই আমাদের ইচ্ছা আছে পারলে পরে নতুনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে — যাকে বলে নব পরিকল্পনায় আমরা আবার 'ছেঁড়া তার' করবো।

এই তিনটি নাটক অভিনয় করার পর একটা বোধ জন্মালো যে নাটক একটা সচল জিনিস, তার পিছনে অনড় একটা আঁকা দৃশ্যপট কেবল যে স্থূলতা তা নয়, নাটকীয়তা অপহরণ করে। অবশ্য এ-কথা নতুন নয়, এইধরনের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই ব'লে গিয়েছেন। এই সময়ে কথাটা যেন আমরা আরো বেশী ক'রে বুঝলাম। মনে হ'লো দৃশ্যের শুরুতেই একবার

মানুষকে ব'লে দেওয়া যে স্থান অমুক। ব্যাস্, তারপর নাটকটাকে চালিয়ে যাওয়া। আমরা ভাবলাম তাই করা যাক। করা হ'লো 'বিভাব' নাটক। তাতে দেখা গেলো শুধু দৃশ্যপট নয়, অনেক স্থলে চরিত্রানুযায়ী পোষাকও সম্পূর্ণ ক'রে পরবার দরকার হয় না। যেমন পুলিশ বোঝাতে এমনি পোষাকের ওপর একটা ক্রস্‌বেল্ট্। ভীষণ মজার বস্তু নয় কি? আসলে দেখতে পাওয়া গেলো ইঙ্গিতে। ঠিকমতো ইঙ্গিতটি দিতে পারলে আর দরকার হয় না। বাকী কাজ হচ্ছে নাটকের মূড্‌টা দর্শকের মনে চারিয়ে দেওয়া। সেই চেষ্টা করা হয়েছিলো 'চার অধ্যায়'-এ। এ-নাটকে বেশীরভাগ অংশ এলা ও অন্তর কথোপকথন। সে-কথোপকথনে মুহুর্মুহু রং বদলায়, মূড্ পালটায়। সেখানে মঞ্চ সাজানো হ'লো সামান্য জিনিস দিয়ে, এবং আলো বদলে মূড্ বোঝাবার চেষ্টা করা হ'লো। দেখা গেলো, হ'লো। দর্শকরা কেমন যেন অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা জিনিস প্রতীয়মান হ'লো। সেটা হচ্ছে, যদি উঁচুনীচু বিভিন্ন স্তর আনা যায় মঞ্চের ওপর তাহ'লে দেখতে অনেক বেশী ভালো লাগে। মঞ্চের সমান তক্তার ওপর ঘুরে ফিরে যতো প্যাটার্নই করা যাক-না কেন, তার চেয়ে একজন যদি কোনো-কিছুর ওপর উঠে যায় আবার নেমে আসে, তা'হলে তার যে-ছবি হয়, সেটা অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী। তাই 'দশচক্র'তে সভার দৃশ্যে অতোবড়ো একটা সিঁড়ি করানো হ'লো। তাতে ফলও হ'লো।

কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে একটা কথা আমাদের মনে ক্রমশ প্রবল হ'য়ে উঠতে লাগলো। সেটা হচ্ছে, পরিপূর্ণ একটা বাঙালী নাটকের চেহারা কী হবে? আমরা বিদেশী নাটকের অনুকরণে এ-দেশে নাটক দেখতে অভ্যস্ত। বাঙলা নাটক ব'লে যা চলে তার চরিত্র সংস্থাপন, তার নাটকীয়ত্ব, তার সংঘাত সবই বিদেশী নাটকের অনুকরণে। তফাৎ কেবল এইমাত্র যে বিদেশী নাটকগুলো আরো অনেক গভীর ও আরো অনেক সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন, সেটা আমাদের নাটকে নেই। এটা আরো বেশী ক'রে মনে হ'লো ইবসেনের নাটকের ভাবানুবাদ 'দশচক্র' অভিনয় ক'রে। মনে হ'লো, প্রাচ্যের চিত্রশিল্প মোটেই প্রতীচ্যের শিল্পের অনুকরণ নয়। এর একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে। নাটকাভিনয়ে সেটা কই? ছাপ থাকতে পারে বিদেশী চিন্তার, কিন্তু কাঠামোটা তো হওয়া চাই এদেশী। 'ধর্মঘট' নাটকে মহুয়া পালা-

গানের কিছু দৃশ্য সন্নিবিষ্ট আছে। সেইগুলো সাজাতে আমাদের ভীষণ ভালো লাগলো। আরো দু-একটা ছোটো নাটক করা গেলো। তাতেও মনের আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়েছিলো। এমন সময় আমরা ধরলাম 'রক্তকরবী', মনে হ'লো, পাওয়া গেছে একখানি বাঙালী নাটক। এর আদ্যোপান্ত সমস্তটাই বাঙালী।

যাই হোক্ 'রক্তকরবী'র কথায় সম্প্রতি ক্ষান্ত দিয়ে বলি যে, এই বিভিন্ন উপস্থাপনপদ্ধতির কথা আমার অন্তরঙ্গ জ্ঞান থেকে বললাম। আশা করি, এর থেকে কারো কারো উপকার হবে।

কিছু স্মরণীয় অভিনয়

'আলমগীর' নাটককে ভাদুড়ীমশায় নিজেও ঠাট্টা করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে-সব নাটক তিনি ক'রে গেছেন, তার মধ্যে 'আলমগীর'ও একটি। দর্শকদের মনে এটার এক ধরনের আবেদন ছিলো।

নাটকটা যখন আমি প্রথম পড়ি, এবং ভাদুড়ীমশায় কীভাবে সেটিকে মঞ্চোপযোগী করার জন্যে কেটেছেন ও সাজিয়েছেন সেটা দেখি, তখন যে কী পরিমাণ মুগ্ধ হয়েছিলুম তা বলা যায় না। এবং আমার বিশ্বাস আজও যদি কেউ সেটা দেখেন তো তিনিও মুগ্ধ হবেন। নাটক কী ক'রে কাটতে হয় ও সাজাতে হয়, সে-সম্পর্কে সেই বোধহয় আমার প্রথম শিক্ষা।

সেই নাটকে একটা দৃশ্য ছিলো। যেখানে আলমগীরের একটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে তয়বর খাঁ এসে তাঁকে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়ায়। আলমগীর নিজের ঐ বিভ্রান্ত অবস্থায় তয়বর খাঁকে চিনতে পারে না। তয়বর খাঁ নিজের নাম বলে। আলমগীর যেন অশ্রুতপূর্ব অজানা একটা নাম শুনছেন এইভাবে আপন মনে উচ্চারণ করেন, — তয়বর ? — কিন্তু এই উচ্চারণের ফলেই যেন তাঁর স্মৃতির অত্যন্ত গভীর প্রদেশে কী একটা আলোড়ন শুরু হ'য়ে যায়। আলমগীর যেন সেই তলদেশ থেকে এই নামটাকে উদ্ধার করতে চায়। যেন নিজের মনের মধ্যে ডুবে এই নামটাকে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে। আপন মনে বলেন, — তয়বর, তয়বর ! — হঠাৎ যেন নামটা পরিচিত ব'লে বোধ হয়। চোখে মুখে সেইরকম আভা আসে। প্রশ্নসূচকভাবে বলেন, — তয়বর ? — যেন বলতে চান যে, — তয়বর, না ? হ্যাঁ হ্যাঁ এ-নামটা তো আমি জানি। তারপরেই সব কথা যেন দ্রুত মনে পড়তে থাকে, — ও হ্যাঁ, তাইতো, তয়বর — সেনাপতি তয়বর — হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বিশ্বস্ত অনুচর তয়বর, — বুঝতে পেরেছি, তয়বর, — ঠিক, — তয়বব।

এই সমস্ত ভাবটা তিনি প্রকাশ করতেন কেবল বারংবার নানারকমে ঐ 'তয়বর' নামটি উচ্চারণ ক'রে। এবং সেই বলবার ধরনে আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারতুম যে ঐ মানুষটির মনটা কীরকমভাবে আস্তে আস্তে

আবার আমাদের এই দৈনন্দিন জগতের স্তরে ফিরে আসছে। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি।

কতোবার তো আমি এ-নাটক দেখেছি, কিন্তু প্রত্যেকবারেই যেন আমার কাছে নতুন লাগতো। কারণ প্রত্যেক দিনই তো এই ছন্দের খেলাটা নতুন করে তৈরী হ'তো, আর হঠাৎ হঠাৎ যেন এক একটা নতুন অর্থ বহন ক'রে আনতো। আর আমরা মুগ্ধ হ'য়ে যেতুম।

কিন্তু কেন মুগ্ধ হতুম? এটা তো এমন-কিছু প্রগতিবাদী কথা নয়। বিরাট একটা-কিছু দার্শনিক উপলব্ধিরও কথা নয়। তবে?

নাটকটার মধ্যে অনেক অসঙ্গত ও অবাস্তব কথা আছে। অনেক স্থলে এ-নাটকটার উদ্দেশ্যও আমি বুঝতুম না। তবু এই অভিনয় অংশটা যদি ঘটনাচক্রে কোনোদিন খারাপ হ'য়ে যেতো তাহ'লে আমার আর দুঃখের সীমা থাকতো না।

তেমনি আর-একটা জায়গা ছিলো। যেখানে অসুস্থ আলমগীর দিলীর খাঁর কাছে একটা স্বপ্নের বিবরণ বলে। তার আত্মা যেন তার দেহকে ছেড়ে ঊর্ধ্বে — বহু ঊর্ধ্বে — চ'লে যাচ্ছিলো আর তার সেই পরিত্যক্ত মৃত শরীরটার পাশে যেন কতো হিন্দু কতো মুসলমান, কতো ইয়াহুদী, কতো কেরেস্তান, সব যেন ভিড় ক'রে দাঁড়ায়। তারা সম্রাট, আলমগীর ইত্যাদি নামে তাকে ডাকে, — উঁহু, কোনো সাড়া নেই। তারপরে কে যেন কোথা থেকে ডেকে ওঠে দিলীর, — মুসলমান! অমনি আমার আত্মার মুখে বাণী ফোটে, সে ব'লে ওঠে, — ঐ, ঐ-ই আমি। — এর পরে আরো আছে। স্বপ্নের মধ্যে তিনি যেন তৃষ্ণার্ত। কতো জাতির কতো লোক সোনার ঝারিতে ক'রে যেন জল নিয়ে এলো। কিন্তু তিনি সে-জল পান করতে পারলেন না। এমন-কি দিলীর — তুমি, যাকে আমি শ্রেষ্ঠ মুসলমান ব'লে শ্রদ্ধা করি, — সেই তুমিও নিয়ে এলে জল, কিন্তু আমি সে-জল পান করতে পারলাম না। কেন পারলাম না দিলীর?' (যতোদূর মনে পড়ে এইধরনেরই সংলাপ ছিলো।)

মঞ্চের ওপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কতোবার এই অংশটুকুর অভিনয় দেখেছি এবং প্রতিবারই মনে হ'তো যেন ভাদুড়ীমশায়ের কণ্ঠস্বর একটা মোহ বিস্তার ক'রে আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে। কী অদ্ভুত relaxed ব'লে মনে হ'তো তাঁকে। কণ্ঠ যেন অসুস্থ, ক্লান্ত লোকের। আর সেই আস্তে আস্তে কথা

বলার মধ্যে কতো সূক্ষ্ম স্বরবৈচিত্র্য যেন পলকে পলকে ঝল্সে উঠতো। কেবল কণ্ঠের কারুকার্যেই যেন মানুষ বুঝুক না বুঝুক কেমন তদ্গত হ'য়ে যেতো।

এগুলোর মধ্যে কোথাও কোনো গলা-ফাটানো প্রগতিবাদ বা দাগা-বুলানো ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজম্-এর প্রদর্শন ছিলো না। কিন্তু অভিনয়কলা হিসেবে অতুলনীয় ছিলো। তাহ'লে অভিনয়টা কী বস্তু?

শ্রীমতী প্রভার মতো অভিনেত্রী আমি খুব কম দেখেছি। তিনি উদিপুরী করতেন। ঐ-ভূমিকায় আমি শ্রীমতী চারুশীলা ইত্যাদি আরো কয়েকজন বিখ্যাত অভিনেত্রীকে দেখেছি। কিন্তু শ্রীমতী প্রভার অভিনয়ে আলমগীরের প্রতি উদিপুরীর প্রেম ও রাগ যতো অনায়াসমিশ্রণে প্রকাশ পেতো তেমনটি আমি আর-কখনো দেখিনি। ভেবে বুঝতে পারতুম যে নাট্যকারের বর্ণনানুযায়ী তাঁকে হয়তো মানাচ্ছে না। যেমন তাঁকে মানাতো না 'রমা' নাটকের রমা হিসেবে। কিন্তু অভিনয় দেখাকালে আমার মনে হ'তো — ও-সব বাজে কথা, ও-সব অতি তুচ্ছ কথা, এই অভিনয় দেখতে পেয়েছি ব'লে আমি ধন্য।

আমি একবার 'কর্ণার্জুন' নাটকে তাঁকে কুন্তী করতে দেখেছিলুম। সেটা ছিলো কোনো-এক অভিনেতার সম্মানরজনী। অনেক খ্যাতনামা অভিনেতাই ছিলেন। প্রায় অষ্টবজ্র সম্মেলনের মতোই। এবং এইসমস্ত সম্মিলিত অভিনয়ে কেউই প্রায় মনোযোগ দিয়ে অভিনয় করেন না। সবারই লক্ষ্য থাকে ব্যক্তিগত কিছু করতালি সংগ্রহ করবার। সেই হট্টগোলের মধ্যে প্রভা দেবী এলেন কুন্তী হিসেবে কৃষ্ণের সঙ্গে কথা কইতে। মুহূর্তে আমার মন থেকে মেলায় আসার চাপল্য অন্তর্হিত হ'য়ে গেলো। অদ্ভুত মিষ্টি এক কণ্ঠস্বরে এই বিধবা নারী বর্ণনা করলেন যে-ছেলেকে তিনি জন্মকালে বিসর্জন দিয়েছেন সেই ছেলে কেমন ক'রে বারে বারে তাঁর স্বপ্নের মধ্যে এসে তাঁকে আকুল ক'রে তুলেছে।

কী মর্যাদা তাঁর বাচনে, কী ব্যাকুল ভালোবাসা তাঁর কণ্ঠে! হঠাৎ মনে হ'লো এইসমস্ত অভিনেতাদের মধ্যে তাঁকে মানায় না। তাঁর স্থান যেন অন্যত্র। অন্য পরিবেশের মধ্যে। তাই এর পরবর্তী দৃশ্য যেখানে কুন্তী গিয়ে কর্ণের সঙ্গে দেখা করেন, সেই দৃশ্য শেষ হওয়ামাত্র আমি ও আমার এক

বন্ধু-সদৃশ দাদা দু-জনেই উঠে চ'লে এলুম। এতোক্ষণ যেখানে বসেছিলুম আর যেন সেখানে ব'সে থাকা সম্ভব হ'লো না।

হ'তে পারে আমি হয়তো রোম্যান্টিক। হ'তে পারে আমি হয়তো বোকার মতো অল্পেতেই অত্যন্ত বেশী মুগ্ধ হ'য়ে পড়ি। কিন্তু সেই বোকামির জন্যে আমি আমার ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ। তবেই তো এতো আনন্দ আমি পেয়েছি। চালাক হ'লে তো পেতুম না।

'বিন্দুর ছেলে' নাটকে স্বামীর অপমানে স্তম্ভিত হ'য়ে যখন বড়ো বৌয়ের চরিত্রে প্রভা দেবী বলতেন, তুই কাকে কী বল্লি লা ছোটো বউ! — সেটা আমার কাছে পৃথিবীর বিখ্যাত অভিনয়ের মধ্যে গণনীয়। একজন শুদ্ধচিত্ত মানুষ যখন অচিন্তনীয় আঘাত পায়, যাকে সে অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছে, ভালোবেসেছে, সেই তারই ব্যবহারে যখন সে-বিশ্বাস ভেঙে যায়, তখন তার সেই কষ্ট দেখে আমার মনের মধ্যে যা-কিছু সৎ, যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু শুদ্ধ, সে-সব যেন কাঁদে। কারণ মানুষের বিশ্বাস ভাঙার মতো ট্র্যাজেডি আর-কিছুতে নেই। আর তখন তো সেটা কেবল ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিশ্বাসের প্রশ্ন থাকে না, তখন সেটা জীবনের ভিত্তি সম্পর্কে বিশ্বাস ভাঙার কথায় গিয়ে পৌঁছয়। হ্যামলেটের বিশ্বাস ভেঙেছিলো, ওথেলোর বিশ্বাস ভেঙেছিলো — এইগুলোই তো আমাদের ভয় পাওয়ায়, আমাদের বিচলিত করে। আমার মনে হ'তো সেই ততোখানি আঘাত পাওয়াটাই প্রকাশ করতে পারতেন প্রভা দেবী। কিন্তু দুঃখ এই যে, সে-নাটকে এর চেয়ে বেশী বস্তু ছিলো না। যদি থাকতো তাহ'লে এই অভিনেত্রী আমাদের কোন্ স্বর্গে না নিয়ে যেতে পারতেন। সেই একটি দৃশ্যের অভিনয়ে যে-গভীরতা প্রকাশ পেতো তাতে একজন বিরাট শিল্পীকে প্রত্যক্ষ করেছি আমরা।

অথচ এ-ও তো সোচ্চার কোনো আধুনিক বুলি বলা নয়! অর্থাৎ এ-কথাটা আমাদের কিছুতেই ভুলে গেলে চলবে না, — বা ভুললে একদিন আবার অনেক ক্ষতি স্বীকারের পর কষ্ট ক'রে আমাদের স্মরণ করতেই হবে যে শিল্পের বিচার তার গভীরতা দিয়ে, কোনো চালু ফ্যাশানের 'বুড়ি' ছোঁওয়া দিয়ে নয়। এবং অভিনয়ের গভীরতা আসে মানুষের মনের প্রকাশে, কেবল তার মতের প্রকাশেই নয়। তাই তো আমার মতো অসংখ্য মানুষ আগ্রহ আর শ্রদ্ধা নিয়ে নাট্যাভিনয়ের দোরে আসে মানুষের এই

বৈচিত্র্যময় প্রকাশ দেখবে ব'লে, কোনো confounded philosophy-র জন্যে নয়। আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো হ'লো মানুষ।

আলবেয়ার কামু এক জায়গায় বলেছেন — মানুষের ভেতরে যে-সত্য লুকোনো থাকে, তার অন্তরে যে-রহস্য থাকে, সে-সম্বন্ধে যার ঔৎসুক্য আছে সে যেন থিয়েটারে আসে। ("বহুরূপী", ২২শ সংখ্যা)।

'মাটির ঘর' নাটকে মহর্ষি (শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য) অভিনয় করতেন সত্যপ্রসন্নের। তিনিই ঐ মাটির ঘরের কর্তা। তাঁর এক মেয়ে স্বামীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করে। তখনো সত্যপ্রসন্ন অন্যকে বলেছেন, — বোঝাতে চেয়েছেন যে, — বিশ্বাস হারাতে নেই, রাত্রি যতো অন্ধকারই হোক্, একদিন তারপরে সকাল হবেই। কিন্তু তাঁর জীবনে সে-সকালটা আর এলো না। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাঁর আর-এক মেয়ে পাগল হ'য়ে গেলো এবং পুত্র-প্রতিম যে-জামাই — সে মারা গেলো। তখন সেই বুড়ো সত্যপ্রসন্ন ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে, — তবু আমি কাঁদবো না। তুমি আমায় কাঁদাও দেখি, — স্টুপিড, — তুমি আমাকে কাঁদাতে পারবে না।

সেই সময়ে মহর্ষির সেই বিশাল চোখদুটো যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকাতো। চোখের শিরাগুলো লাল হ'য়ে ফুটে উঠতো। তাঁর ঠোঁট বেঁকে যেতো। আর অতো বড়ো শরীরটা যেন থর থর ক'রে কাঁপতো। একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলতেন, — তুমি স্টুপিড, — তুমি আমাকে কাঁদাতে পারবে না —।

এই অভিনয় দেখে লোকে মুগ্ধ হ'তো। কেন? সংযত অভিনয়ের জন্যে মহর্ষির খ্যাতি ছিলো। তিনি কখনো বাড়াবাড়ি ক'রে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারতেন না। সেটা তাঁর চরিত্রেই ছিলো না। তাহ'লে কী প্রকাশ হ'তো নাটকের এই অন্তিম লাইনগুলোয় যে আমাদের বুকের মধ্যেটা ভয়ে শুকিয়ে যেতো? আমরা কাঁদতুম না। কিন্তু আমাদের গলার কাছটায় লাগতো, ঢোক গিলতে কষ্ট হ'তো। কেন?—

আমি বারেবারে দেখেছি যে অভিনয়ে যখন মানুষের গভীর আবেগ এই-রকম ক'রে প্রকাশ হয় তখন সেটা নাটকের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেন অন্য আর-একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছয়। তাই নাটক মাপবার সবলীকৃত মাপকাটি দিয়ে ভালো অভিনয়কে মাপা যায় না।

কেউ যদি সানাইয়ে পূরিয়া বাজায় তাহ'লে সেই বাজনা শুনে আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না যে সে-বাজনাটা এতোদিনের সানাই বাজানোর ধারার মধ্যে কোনো বিশিষ্ট সৃষ্টি কিনা। তাই আমরা জানতে চেষ্টা করি সানাইবাদক কোনো য়ুরোপীয় ভাষা জানে কি না, বা তার রাজনৈতিক মতবাদ কী, এবং সেই অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ স্থির ক'রে ফেলি যে তার বাজনা প্রশংসার যোগ্য না নিন্দার যোগ্য। অথচ এগুলো অত্যন্ত অসংলগ্ন সংবাদ। এগুলোর দ্বারা পূরিয়া কোনোদিন নিটোল হ'য়ে প্রকাশ পাবে না সানাইয়ে।

অভিনয়েও তেমনি। সেটা আধুনিক না প্রাচীন, সে-বিচার করতে গেলে আমাদের জানতে হবে যে মানুষের মনকে প্রকাশ করবার যে অভিনয়ধারা আমাদের দেশে আছে তারই মধ্যে এই প্রকাশভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য কী ? এবং বিচারের সময়ে সেই সংবেদনশীল মন থাকা চাই যা আধুনিককালের পরিপ্রেক্ষিতে একটা মানুষের সত্য প্রকাশ দেখতে পায়, অনুভব করতে পারে।

স্মরণ করা যাক সেই অসামান্য অভিনেতা শ্রী যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে। তিনি 'মহানিশা' 'বাংলার মেয়ে'র মতন নগণ্য নাটকে অভূতপূর্ব ও অনতিক্রম্য অভিনয় ক'রে গেছেন। এবং যে-সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা সে-অভিনয় দেখতে পেয়েছে তারাই জানে যে নাটক ছাড়িয়ে কোথায় যেতো তাঁর অভিনয়।

'মহানিশা' নাটকে তিনি হতেন গ্রামের একজন সুদখোর বদমেজাজী লোক। একদিন সেই খিট্‌খিটে স্বভাবের লোকটি তাঁর পুরোনো জমজমাট সংসারের বর্ণনা দেন। শুরুটা করেন যেন খানিকটা ব্যঙ্গে, অলিপ্ত তৃতীয় ব্যক্তির মতো। কিন্তু বলতে বলতে তাঁর গলা বদলে যায়, স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, বিবরণটা ক্রমশ যেন গভীরভাবে ব্যক্তিগত হ'য়ে উঠলো। তখন এই নিঃসঙ্গ বদমেজাজী মানুষটার গোপন ক্ষতের জায়গাটা যেন হঠাৎ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু এই প্রকাশ — কোনো ভারী, গম্ভীর, আবেগপ্রবণ গলায় বা ভঙ্গীতে হয়নি। তাঁর গলা ছিলো হাল্কা, একটু চড়ার দিকে। বাচনভঙ্গী ছিলো স্বাভাবিক কথা বলবারই মতো। এই অভিনয়ে বরঞ্চ খিঁচিয়ে ওঠার ভাব ছিলো বেশী। সেই কাঠামোর মধ্যেই তিনি অতিকৃতির সাহায্য না-নিয়ে

এমন-একটা সুর আনতেন যে বর্ণনার শেষটুকুতে মনে হ'তো লোকটা যেন আর্তনাদ ক'রে বিলাপ ক'রে উঠলো।

তাঁর আর-এক অতুলনীয় অভিনয় আমি দেখেছি 'বাংলার মেয়ে'তে। এইসব নাটকের সম্পর্কে আমার চিরকালই বিতৃষ্ণা। সে-বয়সে তো আরো বেশীই ছিলো। এক আত্মত্যাগিনী প্যানপেনে মেয়েকে কেন্দ্র ক'রে বাঙালী সমাজের কুসংস্কারগুলোর গুণকীর্তন করা হয়, ওতে আমার আনন্দ পাবার কিছু নেই।

তখন রেঙ্গুনে বোমা পড়েছে, কলকাতা ফাঁকা হ'য়ে গেছে। সেই সময়ে আমি সামান্য কয়েকদিনের জন্যে শ্রী কালীপ্রসাদ ঘোষের এক ভ্রাম্যমান থিয়েটারে যুক্ত হয়েছিলুম। সেই কোম্পানীরই অভিনয় হচ্ছিল 'বাংলার মেয়ে'। হয়তো চুঁচুড়া, বা শ্রীরামপুর, বা ঐ-রকমই কোনো-এক জায়গায়। আমি উইংস্‌-এ দাঁড়িয়ে সে-অভিনয়ের কিছুটা দেখছিলুম। কিন্তু এতো বাজে লাগে যে সেখান থেকে স'রে আসি। তখন কে কে যেন আমাকে যোগেশবাবুর ঐ-দৃশ্যটা বিশেষ ক'রে দেখতে বলেন। বোধহয় শ্রী কালীপ্রসাদ ঘোষও তার মধ্যে একজন। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। পরে আমি বারবার ভেবেছি যাঁরা আমাকে জোর ক'রে যোগেশবাবুর ঐ-অভিনয় দেখতে বলেছিলেন তাঁরা আমার পরম বন্ধুর কাজ করেছেন।

মফঃস্বলের মঞ্চ। ইংরেজ পদানত বাঙলার যুদ্ধকালীন মফঃস্বল। সুতরাং সেখানে না-ছিলো দৃশ্যের বাহার, না-ছিলো আলোর কায়দা। রং উঠে যাওয়া আঁকা একটা পটের সামনে, কলকাতার তুলনায় অত্যন্ত ছোটো একটা মঞ্চে, স্মরণীয় অভিনেতা যোগেশচন্দ্রকে আমি অভিনয় করতে দেখেছিলাম। তিনি অভিনয় করছিলেন একজন সাত্ত্বিক আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের অভিনয়ে আমি দেখলুম এক সাত্ত্বিক চরিত্রের মানুষ। যিনি ব্রাহ্মণ না ব্যাধ, হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ, এ-সবে কিছুই এসে যায় না। মন আপনা থেকেই এঁর কাছে প্রণত হয়। বোঝা যায় ইনি মিতভাষী, ইনি সহিষ্ণু, এবং এ-ও বোঝা যায় যে, প্রচুর দুঃখের আঘাতে জীর্ণ এই বৃদ্ধ কিন্তু জ্ঞানী।

তিনি মেয়েকে দেখতে এসেছেন। জামাই কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে এসে বলে যে, সে তার স্ত্রীকে হত্যা ক'রে ফেলেছে। কয়েকদিন পরে আজ ঘরে

ফিরে সে আকস্মিক এক রাগে তার স্ত্রীর হাত ধ'রে টান মারে। স্ত্রী তখন কয়েকদিন অভুক্ত থাকার পর খেতে বসেছে। দুর্বল শরীরে সেই হেঁচ্‌কা টান সহ্য করতে পারেনি, মারা গেছে।

কথাটা যখন বোধগম্য হয় তখন সেই বৃদ্ধ — আমার যতোদূর মনে পড়ে — মাটিতে ব'সে পড়েন। আকস্মিক আঘাতে মানুষ বিহ্বল হ'য়ে ব'সে পড়তে পারে এটা আমরা বইয়ে হয়তো পড়েছি, কিন্তু অভিনয়ে এই ক্রিয়াকে সত্য ক'রে তোলা অনেক জটিল, অনেক দুরূহ।— এলো গা, কাঁধে উড়ুনী হাতে একটা সাদা কাপড় লাগানো পুরোনো ছাতা। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেন পায়ে আর দাঁড়িয়ে থাকবার জোর পেলেন না, ব'সে পড়লেন। অত্যন্ত বাস্তবভাবে কিন্তু দর্শকদের মনকে কি গভীরভাবে বিচলিত ক'রে।

তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে প্রশ্ন করেন — সে কোথায়? জামাইয়ের নির্দেশে উঠে ধীরে ধীরে মঞ্চে পিছনে লুণ্ঠিতা মেয়ের মৃতদেহের কাছে যান। নীচু হ'য়ে ঝুঁকে ডাকেন — ভবানী! ভবানী! তোকে যে নিয়ে যেতে এসেছিলুম মা।

কোনো কান্না নেই, কোনো হাহাকার নেই, গলার স্বরে কোনো কৃত্রিম কম্পন নেই। অথচ আওয়াজটার মধ্যে কীরকম যেন একটা ভীষণ কষ্টের প্রকাশ হয়। সেই দুটো ডাক শুনে আমাদের সকলের চোখ জ্বালা ক'রে জল এসে গেলো।

এই দৃশ্যের সময়ে আমি দেখেছি অপরদিকের উইংস্‌গুলোতে থিয়েটারের মেয়েরা পাছে শব্দ ক'রে ফ্যালে তাই মুখে আঁচল গুঁজে হু হু ক'রে কাঁদছে। সচেতন হ'য়ে শুনেছি সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ থেকে অপ্রতিরোধ্য কান্নার ফোঁপানি ভেসে আসছে। কিন্তু যাঁর দুঃখে সবাই এতো অধীর তাঁর কিন্তু চোখে এক ফোঁটা জল নেই। তিনি আবার ধীরে ধীরে মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে আসেন। জামাই কেঁদে বলে — আপনি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিন, আমি ওকে খুন করেছি।

বৃদ্ধ যেন ভালো ক'রে শোনেন না কথাগুলো, বলেন — না, না ও-সব তোমরা যা পারো করো। আমাকে আর ওর মধ্যে জড়িয়ো না।

অপরাধীকে এই কথা বলার মধ্যে কোথায় যেন একটা 'ভীতিপ্রদ কমিকের' ইঙ্গিত আছে। এবং সেটা প্রচণ্ড বেগে এসে লাগতো। অন্তত আমার

লেগেছিলো। যে-বাস্তবের মধ্যে কমিক আর ট্র্যাজিক গায়ে গায়ে লেগে থাকে তারই অনুভব হয়েছিলো আমার।

তারপর বৃদ্ধ যেন আপন মনে বলেন, — কিন্তু আমার তো চোখে জল আসছে না। যাই, বৌমাকে গিয়ে বলি, সে কাঁদলে তখন হয়তো আমারও কান্না পাবে।

ব'লে আবার চুপ ক'রে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর সত্যিই তখন আমার মনে হয়েছিলো যে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীর সময়ও যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। তারপর একটা নিশ্বাস টেনে বললেন, — শিব শম্ভু, শিব শম্ভু — ! তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

সাজঘরে তিনি তখন কাপড় বদলাচ্ছেন, আমি উত্তেজিত হ'য়ে সেখানে গিয়ে বললুম, — আপনি কী ক'রে করলেন! কী ক'রে! যদি কোথাও আপনার গলা কাঁপতো, বা ঐ-রকম কিছু হ'তো, আমি সত্যি বলছি আপনাকে, আমি এখুনি সেটা তুলে ফেলতে পারতুম, কিন্তু আপনি তো গলার আওয়াজ কিছু বদলালেন ব'লে বুঝতে পারলুম না, অথচ অতো কান্না কী ক'রে প্রকাশ পেলো? আপনি কী ক'রে করলেন ওটা?

তখনো যোগেশবাবু যেন সজল হ'য়ে আছেন। একটু হেসে প্রায় আপন মনেই বললেন, — কি জানো, ধ্যান করতে হয়, ধ্যান করলে — মন দিয়ে ধ্যান করলে, — তারপর পাওয়া যায়।

মনে আছে আমার যেন ভীষণ একটা অসহিষ্ণু রাগ হয়েছিলো। ধ্যান কথাটা শুনেই মনে হয়েছিলো এ আবার সেই পুরোনো হিঁদুয়ানির ধোঁয়া ধোঁয়া কথা। আমি তখন ভালো অভিনয় করার একটা মুষ্টিযোগ পেতে চাচ্ছি, সুতরাং তখন তো আমার চ'টে ওঠবারই কথা।

অথচ এই লোককেই আমি 'রমা'তে গোবিন্দ গাঙ্গুলীর মতো ধূর্ত ও নীচ লোকের অভিনয় করতে দেখেছি। এবং কখনো তাঁকে 'সধবার একাদশী'তে ঘটিরাম ডেপুটির মতো নির্বোধ হ'তে দেখেছি, 'দিগ্বিজয়ী'তে আলি আকবরের মতো সিনিক হ'তে দেখেছি, আবার 'আলমগীর'-এ রাম সিং-এর মতো ভাঁড় হ'তে দেখেছি। এইরকম ব্যাপ্তি না-থাকলে আমাদের দেশের শিল্পীরা উচ্চতম শ্রেণীর ব'লে গণ্য হতেন না। এই হ'লো আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের দেশে নাট্যকারের অভাব পূর্ণ করেছেন এইরকম কিছু ক্ষণজন্মা অভিনেতা-

অভিনেত্রী। তাঁরাই তাঁদের উপলব্ধির গভীরতা দিয়ে এ-শিল্পকে এমন-এক মহিমা দান ক'রে গেছেন যে, আজও আমরা বাঙলাদেশের মঞ্চ নিয়ে গর্ব ক'রে থাকি। তাই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে পিতৃপুরুষদের এই কষ্টার্জিত সম্পদকে নষ্ট ক'রে আমরা যেন কৌশলের পথে চ'লে নিজেদের সর্বনাশ না-করি।

অদ্ভুত অভিনেতা যোগেশচন্দ্র কেবল একটা অভিনয় পারতেন না। সেটা হ'লো heroic অভিনয়। তাঁর শম্বুক তাই মনোগ্রাহী হ'তো না। কিন্তু সে-অভাব পূর্ণ হ'তো ভাদুড়ীমশায়ের কাছে। Heroic অভিনয়ের কাঠামোর মধ্যে কী ক'রে চরিত্রটাকে জীবন্ত ক'রে তুলতে হয় তা তিনি জানতেন। তাই রামের ভূমিকায় ছন্দের সংলাপের মধ্যে তিনি যে-সব দৈনন্দিন কথোপকথনের সুর আনতেন সেটা তদানীন্তন অনেক লোকের ভীষণ খারাপ লাগতো। আমাদের এক সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি তো ভাদুড়ীমশায়ের ছন্দকে colloquial speech-এর কাছে আনবার চেষ্টায় ভীষণ ক্ষিপ্ত হতেন। কারণ তখন ছন্দের সংলাপে সুরেরই প্রাধান্য ছিলো, মানে-র নয়। গলা দুলিয়ে দুলিয়ে আবৃত্তি করা হ'তো।

শিশিরকুমারের আলমগীর আর নাদির শাহ, রাম ও রঘুবীর, — heroic অভিনয়ের যে-ব্যাপ্তি তাঁর ছিলো তা আর দেখিনি। অনেক অভিনেতা শিশিরবাবুর গোটা কতক মোটাদাগের ভঙ্গী নকল করেছেন, কিন্তু তাঁর অভিনয়ে বাচনের সূক্ষ্মতা লক্ষই করেননি। আমারও হয়তো লক্ষ হ'তো না, যদি-না পথ দেখাবার মতো গুরুজন থাকতেন। আমি কৈশোরে একজনের কাছে অভিনয় সম্পর্কে প্রচুর শিক্ষা পেয়েছি। বলতে গেলে তিনিই আমার প্রথম গুরু। তিনি বলতেন, — ভাদুড়ীমশায়ের মূড্ দ্যাখো যেন সুইচ বোর্ডে বাঁধা আছে। যখনি যে-মনোভাব দরকার, তখনই সেগুলো যেন পর-পর পটাপট চ'লে আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই গলার modulation যেন আপনা থেকে হ'য়ে যাচ্ছে। এর জন্যে কতোখানি প্র্যাকটিস্ আর কতোখানি ডিসিপ্লিন দরকার বুঝতে পারো? অ্যাকটিং এমনি হয় না।

পরলোকগত গায়ক ও অভিনেতা শ্রী ধীরেন দাসমশায়, আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি একদিন বলেছিলেন, — বড়দার একটা জিনিস লক্ষ করবেন। একটা পঙক্তির মধ্যে যদি পাশাপাশি একটা কোমল অর্থের শব্দ

ও একটা কঠোর অর্থের শব্দ থাকে তাহ'লে তিনি দ্রুত ছন্দে সমস্তটা বলবার মধ্যেই কিন্তু সুস্পষ্টভাবে ঐ দুটো শব্দের ভিন্ন ওজন প্রকাশ ক'রে দেন। লক্ষ্য ক'রে শুনবেন।

এবং যোগেশবাবু বলেছিলেন, — ধ্যান করতে হয়, — মন দিয়ে ধ্যান করলে, — তারপর পাওয়া যায়।

তাইতো আমি শিখেছি যে, অভিনেতারা বিরাট শিল্পী, তাঁরা কোনো নাটকের বা কোনো পরিচালকের পরিচালনার সূতোয় বাঁধা পুতুল নয়। এবং একটা নাট্যাভিনয়ের মধ্যে নাট্যকার, অভিনেতা, ও মঞ্চ পরিকল্পনাকার, সকলেই নিজের নিজের শিল্পীর অধিকারে আত্মসম্মানে মণ্ডিত। এই হ'লো আমাদের আদর্শ থিয়েটার। এবং সম্মানীয় মানুষদের এই যৌথ সমাজই কি আমাদের আদর্শ সমাজের কল্পনা নয়?

কিছু পুরোনো কথা

কিছু পুরোনো গল্প করা যাক।

অনেকদিন আগে রঙমহলে 'কেদার রায়' নাটকের অভিনয়। কেদার রায় কে করছিলেন মনে নেই, হয়তো নির্মলেন্দু লাহিড়ীমশায়। কিন্তু কার্ভালো করেছিলেন শ্রী ভূমেন রায়। গল্পটা তাঁকেই নিয়ে।

কার্ভালো লুকিয়ে এসেছে রাজা কেদার রায়কে কারাগার থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ সচকিত হ'য়ে ওঠে কার্ভালো — কেউ যেন টের পেয়েছে — রাজার হাত ধ'রে সে পালাবার পথে ছুটে যায়। মঞ্চ অল্পক্ষণের জন্য অন্ধকার হ'য়ে যায়।

সেই অন্ধকারের মধ্যে কে একজন দর্শক পিছন থেকে অত্যন্ত ব্যাজার গলায় ব'লে উঠ্‌লো -- দুস্ শালা।

দৃশ্যটা এমন-কিছু খারাপ হচ্ছিলো না। এবং আমার অভিজ্ঞতায় আমি কোনোদিন শ্রী ভূমেন রায়কে কার্ভালোর ভূমিকায় একতিলও হেলাফেলা ক'রে অভিনয় করতে দেখিনি। কিন্তু তাতে কি ? সেই লোকটি সুস্পষ্ট গলায় একটা ঘোষণা ক'রে তো দিলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক দর্শকই খিক্ খিক্ ক'রে হেসে ফেললেন। তাঁরাও অবশ্য সবাই ভদ্রলোক।

তারপরেই মঞ্চে আলো জ্ব'লে গেলো। কারাগারের বাইরের দৃশ্য। কার্ভালো রাজার হাত ধ'রে ছুটে বেরিয়ে এলো কারাগারের ভিতর থেকে। একজন সিপাহী চীৎকার ক'রে প'ড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভূমেনবাবু ব'লে উঠলেন — দুস্ শালা। তারপর আরো অনেকগুলো সিপাহী ঐ একইভাবে কার্ভালোর গুলিতে মরে, এবং প্রত্যেকবারই এক একজনকে মেরে ভূমেনবাবু যেন বিজাতীয় উল্লাসে লাফাতে থাকেন আর বলতে থাকেন — দুস্ শালা, দুস্ শালা, দুস্ শালা। সবকটাকে মারবার পর ভূমেনবাবু হঠাৎ একেবারে ফুট্‌লাইট্‌সের সামনে চ'লে গিয়ে দর্শকদের দিকে সোজা তাকিয়ে কানে কানে বলার মতো ক'রে বললেন — যো শালা বোলা হ্যায় ও ভি শালা। — ব'লে কার্ভালোর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে ছুটে স্টেজের পিছনে গিয়ে

নৌকার ওপর রাজাকে নিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে মাঝিদের নৌকো তাড়াতাড়ি বাইতে বলতে থাকলেন। — প্রচণ্ড তালিতে প্রেক্ষাগৃহ ভেঙে পড়লো। যারা হেসেছিলো তারাই তালি দিলো।

এই গল্পটার মধ্যে এতো ভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আছে যে এটা প্রায়ই আমার মনে পড়ে। বিশ্লেষণটা পাঠকদের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলাম।

'কেদার রায়' নাটক সাহিত্য হিসাবে কোনোদিনই আদৃত হয়নি। তার মধ্যে আবার কার্ভালোর চরিত্রটি অত্যন্ত অবাস্তবভাবে লেখা।"কার্ভালো ভাঙা বাঙলা বলে, হিন্দী বলে, আর ইংরেজি বলে। সুদূর য়ুরোপ থেকে জলদস্যু হিসাবে বাঙলাদেশে এসে, সে বাঙালীর বন্ধু হয়েছিলো। কিন্তু তার জন্যে সেই যুগে সে ইংরেজি কেন বলবে এবং হিন্দীও বলবে কিনা সে-বিষয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ জাগে। শুনেছি, ভাদুড়ীমশায় যখন রডা অভিনয় করেছিলেন তখন তিনি ভাঙা ভাঙা চট্টগ্রামের ভাষা ব্যবহার করতেন। কিন্তু ভূমেনবাবু করতেন না। রডাতেও না, কার্ভালোতেও না। কিন্তু মানুষটা জীবন্ত হ'তো। এমন-একটা দুর্দান্ত বেপরোয়া অথচ শিশুসুলভ সারল্য প্রকাশ পেতো যে প্রথম দৃশ্যেই লোকে তাকে ভালোবেসে ফেলতো। এই ভূমেনবাবুকে আমি আরো অনেক চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছি কিন্তু সবসময়েই মনে হ'তো তিনি বাজে অভিনেতা, কিন্তু যখনই তিনি রডা বা কার্ভালো করতেন — বিশেষ ক'রে কার্ভালো — তখন মনে হ'তো মঞ্চের অন্য সমস্ত অভিনেতাকে ছাড়িয়ে তাঁর ক্ষমতা যেন অনেক উঁচুতে। এবং 'কেদার রায়' নাটকে যে-সব অন্যান্যদের থাকতে দেখেছি তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রী নরেশ মিত্র ইত্যাদি। তাঁরা কেউই অবহেলার অভিনেতা ছিলেন না।

এ-রকম অভিনেতা আমি আরো এক-আধজনকে দেখেছি। আর-একটা দৃশ্য মনে পড়ে। 'প্রতাপাদিত্য'-এর কল্যাণীর অনুকরণে তৈরী একটি চরিত্র। তাঁকেও কারা যেন বলাৎকারের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেছে। বধূটি আত্মরক্ষার আর-কোনো উপায় না-দেখে গৃহদেবীর হাত থেকে খাঁড়া খুলে নিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রচণ্ড ভাষণ দেন। যতোদূর মনে পড়ে মিস্ তারকবালা (লাইট) নাম্নী এক অভিনেত্রী ঐ-অভিনয় করেছিলেন। নাটক খুবই বাজে লেখা, অভিনয়ের মানও খুব সস্তার ছিলো, কিন্তু উপরোক্ত ঐ-দৃশ্যে শ্রীমতী

তারকবালার অভিনয় আমাকে হতবুদ্ধি ক'রে দিয়েছিলো। যখন তিনি অনন্যোপায় হ'য়ে দেবীর মূর্তির কাছে প্রার্থনা আরম্ভ করলেন তখন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁর আবেগ যেন ক্রমশ উচ্চগ্রামে উঠতে থাকলো, উঠতে উঠতে যেন তারার সপ্তকে পৌঁছুলো, তখন তিনি খাঁড়া হাতে ক'রে উন্মাদিনীর মতো ঘুরে দাঁড়ালেন, চীৎকার ক'রে দস্যুদের আহ্বান করলেন। সেই সময়ে সত্যিই তাঁকে উন্মাদিনী ও প্রচণ্ড মনে হয়েছিলো। এবং সেটা সম্পূর্ণ ঘটলো আমাদের চোখের সামনে, ভীত আকুলতা থেকে প্রচণ্ড চণ্ডী-মূর্তি। আমার তখন বয়স অল্প, এবং নিজের আধুনিকতা সম্পর্কে হাস্যকর উন্নাসিকতা। সেই আমিও কেমন মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। সে-রাত্রে অনেকক্ষণ ভেবেছিলাম, কেবলই মনে হয়েছিলো, আমি একটি মেয়েকে একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে অত্যন্ত সত্য হ'য়ে প্রকাশ হ'তে দেখলাম। কিন্তু কেবল সেই বিশেষ মুহূর্তে। নাটকের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁকে দেখিনি, শ্রীমতী তারকাবালা যেন নিজের সেই সত্তাকে কোথায় লুকিয়ে ফেলেছিলেন।

আর-একটা অভিনয়ের কথা মনে পড়ে। নির্মলেন্দু লাহিড়ীমশায়ের সিরাজের ভূমিকা। সিরাজ তার অমাত্যদের কাতরভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছে, আবেদন করছে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্যে। বলতে বলতে সে বলে — এ-বাঙলা হিন্দুর না, এ বাঙলা মুসলমানের না, মিলিত হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি এই বাঙলা।

এ-কথা খুব বোঝানোর মতো ক'রে, খুব যুক্তির মতো ক'রে বলা যেতো, কিন্তু নির্মলবাবু বললেন দোলা দিয়ে দিয়ে আবৃত্তি করার মতো ক'রে। এ-বাঙলা হিন্দুর না, — গলাটা আর এক পর্দা তুলে বললেন, এ-বাঙলা মুসলমানের না, — তারপর আরো তুলে বললেন, মিলিত হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি — চীৎকার ক'রে বললেন — গুল্‌বাগ্‌ এই বাঙলা। আমি অনুভব করলাম যে দর্শকদের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুতের শিহরন খেলে গেলো। আমার নিজের বুদ্ধি এই অভিনয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো, কিন্তু আমার মাংসপেশী, আমার স্নায়ুতন্ত্রী, যেন মোহগ্রস্ত হ'লো। এরপরে অনেকদিন এইটেকে পরীক্ষা করার জন্যে আমি আমার অনেক বুদ্ধি-অভিমানী বন্ধুদের কাছে নির্মলবাবুর নকলে আবৃত্তি ক'রে দেখেছি তাঁদেরও গায়ে কাঁটা দেয়।

দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে যে অভিনয়ে একটা শরীরগত দিক আছে। আমার শরীরের একটা রাসায়নিক দ্রব্য বাড়িয়ে দিলে আমার মনের ওপর তার একটা প্রভাব ঘটে। যেমন adrenalin ইন্‌জেক্‌শনে আমাকে অকারণ সন্ত্রস্ত ক'রে তোলা যায়। তেমনি কোনো-একটা প্রক্রিয়া হয় এইসব অভিনেতাদের সৃষ্টিতে। এবং সেটা বোধহয় ঘটে এক একটা ঘটনা সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাস তাঁদের সত্তার মূল পর্যন্ত প্রোথিত থেকে তাঁদের প্রকাশের ভঙ্গীকে অনুপ্রাণিত করে ব'লে। যাই হোক্, এ-সমস্ত মনস্তাত্বিক ও ইঁস্থেটিক্ বিশ্লেষণ সমালোচকদের জন্য রেখে দেওয়া ভালো। আমি শুধু বলতে পারি যে, ঘটনাগুলো এবং আমার ওপর তাদের যে-প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছি, সেগুলো আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতে সত্য।

যে-ঘটনাগুলোর উল্লেখ করলাম সেগুলো দর্শক মাতানোর এক একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। কিন্তু এইরকম বিশিষ্ট ক্ষণ ছাড়া বাকি সময়ে এই রীতির অভিনয় আমাদের কী দিয়ে গেছে সেটাও কিন্তু অনুধাবনযোগ্য।

এই অভিনয়রীতিকে বলা যায় flamboyant অভিনয় বা আধুনিক পরিভাষায় হয়তো theatrical theatre এবং এরই ঐতিহ্যে বাঙলাদেশে যাত্রা ও থিয়েটার এতোদিন আসর মাৎ ক'রে রেখে এসেছে। এতে সমগ্রতার চেয়ে চমকের প্রতি লক্ষ্য থাকে বেশী। হালে, এই অভিনয়ধারার একটা আধুনিকরূপ তৈরী হচ্ছে নানারকম স্টাণ্ট্ দিয়ে। কিন্তু সে-কথা থাক।

'জীবনরঙ্গ' নাটকের রিহার্সেলে একদিন ভাদুড়ীমশায় নায়কের ভূমিকা অভিনয় ক'রে দেখাচ্ছিলেন। নায়ক মঞ্চে অভিনয় করতে ঢুকে অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছে এই সন্দেহ ক'রে নায়কের শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ ক'রে স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে চ'লে গেছে, — কেবল স্বামীকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। নায়ক সেই দুঃখে মদ খেয়ে সেই অভিনেত্রীরই বাড়ীতে এসে মনের দুঃখের কথা বলছে। এই দৃশ্যে ভাদুড়ীমশায়ের অভিনয় দেখে স্পষ্ট বোঝা গেলো যে ভাদুড়ীমশায় যেন চরিত্রটির বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখাচ্ছেন যে সে কতোটা সেন্টিমেন্টাল, এবং তার আসল অপ্রকাশিত মনোগত ইচ্ছা হচ্ছে যে অভিনেত্রীটি মায়ের মতো তাকে আদর করে ও শিষ্যার মতো তার পায়ে প্রণত হ'য়ে তার আহত পৌরুষকে আবার চাঙ্গা ক'রে দেয়।

ছোটোবেলা থেকেই শুনেছি যে, ভালো অভিনয় করতে হ'লে চরিত্রটার মধ্যে ডুবে যাও। কিন্তু হঠাৎ এমন-একটা বুদ্ধিমার্জিত অভিনয়ভঙ্গী চোখের সামনে ঝলসে উঠলো যে আমার এক অদ্ভুত আবিষ্কারের অনুভূতি হ'তে লাগলো। তখন আমরা কেউই ব্রেখ্ট্-এর নাম শুনিনি। সেটা ১৯৪০ কিংবা ৪১ সাল।

বাইরে এসে মনোরঞ্জনবাবুকে উত্তেজিত হ'য়ে বললাম — এই-ই তো অভিনয়ের চরম। এর চেয়ে বড়ো আর কী হ'তে পারে ?

মনোরঞ্জনবাবু বললেন — হ্যাঁ, ভালো, কিন্তু সর্বত্র তো এটা করা যাবে না। যেখানে চরিত্রটা অভিনেতার চরিত্রের চেয়ে ওজনে হাল্কা সেখানে করা যাবে, কিন্তু যেখানে নাটকের চরিত্রটা একটা বিরাট ব্যক্তি সেখানে তো অভিনেতাকে কেবলই চেষ্টা করতে হয় সেই বিরাটত্বে গিয়ে পৌঁছুতে, সেখানে তো তার বাইরে থেকে বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা নেই, বরং কেবলই সে চেষ্টা করে যাতে তার অখণ্ড মনোযোগ তার নিজেরই সত্তার নানারকম প্রকাশ ঘটিয়ে দেয় — তার সচেতন চেষ্টারও বাইরে।

অর্থাৎ যে সামান্য অত্যুক্তির দ্বারা চরিত্রের বিশ্লেষণ করা হয় সেটা প্রায় কমিক অভিনেতাদের অভিনয়পদ্ধতির মতন। কিন্তু ভীম যখন কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দুঃশাসনের বুকের ওপর ব'সে তার বুক চিরে রক্ত বার করছে আঁজলা ক'রে, আর পাগলের মতো লাল চোখে চীৎকার ক'রে কৌরবদের ডাকছে সাধ্য থাকলে বাধা দিতে, তখন অভিনেতার বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বিশ্লেষণ করবার সুযোগ কোথায় ? তাতে কি সেই প্রতিশোধ গ্রহণের রক্তাক্ত বিভীষিকা বেশী প্রকাশ করা যাবে ? 'দিগ্বিজয়ী'তে নাদির শাহ করবার সময়ে কি ভাদুড়ী-মশাই এতো বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন ?

আর-একরকম বিশ্লেষণ দেখেছি তার কথা বলি।

'রত্নদীপ' নাটকে মনোরঞ্জনবাবু দেওয়ানের অভিনয় করতেন। যখন নায়ক তার কাছে স্বীকারোক্তি করে যে সে একজন জোচ্চোর, সে ভবেশ সেজে এসেছিলো, তখন মনোরঞ্জনবাবুর অভিনয় হ'তো অবিস্মরণীয়। অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থেকে বলতেন ' — সেজে এসেছো ! — কি বলছো কী তুমি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।' বুড়োমানুষ যেমন কিছু-একটা বুঝতে না পারলে রেগে ওঠেন সেইরকম রাগতভাবেই বলতেন। তারপর ক্রমশ যখন

কথাটা বোধগম্য হ'তো তখন খপ ক'রে রাখালের বুকের কাছের জামাটা মুঠো ক'রে ধ'রে ক্রুদ্ধ হ'য়ে ব'লে উঠতেন — 'জোচ্চোর! তোমাকে আমি পুলিশে দেবো।' — তারপর কেমন যেন নরম হ'য়ে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলতেন — 'বাহবা, বাহবা জোচ্চোর।'

একটা অত্যন্ত সৎপ্রকৃতির মানুষ যদি প্রতারিত হন তাহ'লে তার যে-ক্ষোভ, এবং তখনও যদি সেই প্রতারককে তিনি না-ভালোবাসতে অক্ষম হন তাহ'লে তাঁর যে-কষ্ট, সবটা এক সঙ্গে মূর্ত হ'তো।

এঁদের অভিনয় দেখতে দেখতে আমি শিখেছি যে, অভিনয় ব্যাপারটা মোটেই একমেটে নয়। ছেলে ম'রে গেছে, বাপের কষ্ট হয়েছে, — এটা তো নাটকের সিচুয়েশন। কিন্তু সেই কষ্টের একটা ব্যক্তিগত রূপ দিতে পারাই হ'লো অভিনেতার সৃষ্টি। কোনোরকমে নাটকের গল্পটাকে সংলাপ আর সিচুয়েশনের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া নয়, নিজের অভিনেয় চরিত্রের ব্যক্তিগত গল্পটাকে প্রকাশ করাই হ'লো অভিনেতার কাজ। তাতে অনেক কারুকার্য আসে, অনেক গভীরতা। তারপর আর ব্যক্তিগত থাকে না। সকলের হ'য়ে যায়। তখন ব্যক্তি ছাড়িয়ে, নাটকের গল্প ছাড়িয়ে, আমাদের মৌল অনুভবগুলোকে নাড়া দিয়ে দেয়।

১৩৭২

কিছু সামান্য কথা

নাট্যমঞ্চে কাজ আমার অনেকদিন হ'লো। প্রথম যখন পেশাদারী মঞ্চে ঢুকেছিলুম তখন শ্রী বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটীর ঘর', 'বিশ বছর আগে' হ'য়ে গিয়ে 'মালা রায়' শুরু হচ্ছে। শ্রী শচীন সেনগুপ্তের 'পথের দাবী' বা শ্রী যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'পরিণীতা' ঠিক এর আগে আগেই বোধহয় হ'য়ে গিয়েছে। তারপর তারাশঙ্করবাবুর 'কালিন্দী', বিধায়কবাবুর 'শতাব্দীর প্রেম' কিংবা ঐ-রকমই কী একটা নামের নাটক মহাসমারোহে শুরু হ'লো। তবে তখন নাট্যমঞ্চগুলোতে এখনকার মতো একটা নাটক ধ'রে কেবলমাত্র সেটারই অভিনয় চালানো হ'তো না। অন্যান্য নাটকও ক'রে যাওয়া হ'তো। তখন বিক্রিদাতা নাটক হিসাবে 'কেদার রায়', 'চরিত্রহীন', 'প্রফুল্ল', 'সাজাহান', ইত্যাদি কিছু নাটক অনেক সময়েই করা হ'তো। সেইরকম শিশিরবাবুও শ্রীরঙ্গমে তাঁর অনেক পুরোনো নাটকের অভিনয় ক'রে যেতেন। এগুলো অভিনীত হ'তো বিশিষ্ট অভিনেতাদের বিশিষ্ট চরিত্রাভিনয়ের খ্যাতির ওপরে। যেমন অহীনবাবুর খ্যাতি ছিলো 'সাজাহান' বা 'আবন' হিসাবে, বা ভূমেনবাবুর খ্যাতি ছিলো 'কার্ভালো' বা 'রডা' হিসাবে, বা নির্মলবাবুর খ্যাতি ছিলো 'সিরাজদ্দৌলা' বা 'ভাস্কর পণ্ডিত' হিসাবে। সুতরাং তাঁরা যখন যে-নাট্যমঞ্চে থাকতেন সেখানে এই নাটকগুলো তখন অভিনয়ের চেষ্টা হ'তো। ফলে, এই বিশিষ্ট অভিনেতাদের এই বিশিষ্ট অভিনয়গুলো ক্রমে ক্রমে একটা কিংবদন্তীতে পরিণত হ'য়ে গেছে।

আমি আজকাল এক এক সময়ে পুরোনোপন্থী কোনো কোনো অভিনেতা বা সমালোচকদের লিখতে দেখি যে, তখন অভিনয়ের যে উন্নত মান ছিলো — আওয়াজ তৈরী করার বা উচ্চারণ স্পষ্ট করার যে প্রচুর প্রয়াস ছিলো, — সে-সব আজকাল আর নেই। আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে যে এইসব ভদ্রলোক, যাঁদের চিন্তা ভাবনার শিকড় সেই অতীতকালেই প্রোথিত, যাঁরা নতুন নাট্য-প্রচেষ্টাকে বহুদিন পর্যন্ত স্বাগত জানাতে পারেননি, এবং নিজেরাও যাঁরা এই পরিবর্তনশীল সমাজের মধ্যে শিল্পী হিসাবে বা বিদগ্ধ সমালোচক

হিসাবে এই স্রোতের অংশীদার হ'তে পারেননি, তাঁরাই বর্তমানকালকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এ-সব কথা এতো সহজে বলতে পারেন। বাঙলা নাট্যমঞ্চের তখনকার অভিনীত শ্রেষ্ঠ নাটকগুলোর সঙ্গে এখনকার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলোর সাহিত্যিক মূল্য বিচার করলেই স্পষ্ট হবে যে, এমন সমস্ত গভীর কথা আজকের নাট্যে উচ্চারিত হ'য়ে থাকে যা তখনকার যুগে অকল্পনীয় ছিলো। সুতরাং সেই সকল গভীর চিন্তার সাহিত্য-প্রসাদ-সম্পন্ন নাটক যাঁরা অভিনয় করবার জন্যে উৎসাহিত হচ্ছেন (অর্থার্জনের ক্ষেত্রের বাইরে দাঁড়িয়ে) তাঁরা অভিনয়কুশলতার চেষ্টা করছেন না, গভীর ভাব অভিব্যক্তির জন্যে কোনো প্রয়াস পাচ্ছেন না, এটা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত কথা হয় না।

তখনকার দিনে উচ্চারণ সবচেয়ে স্পষ্ট ছিলো ভাদুড়ীমশায়ের। শুধু বাক্যগত উচ্চারণ নয়, অর্থগত উচ্চারণ। কিন্তু আর ক'জন অভিনেতা তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন ?

নানান্ কারণে আমাদের অনেকের মধ্যে আত্মগ্লানি করাটাই ফ্যাশন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে মনে হয়। 'গোরা' উপন্যাসের পানুবাবুর মতো। এঁদের কথা শুনলে গোরার মতোই বলতে ইচ্ছে হয় যে, এই যদি অবস্থা হয় 'তবে আপনি ব'সে ব'সে পাউরুটি চিবোচ্ছেন কোন্ লজ্জায় ?'

কাজ করতে নামলে তবে বোঝা যায় যে, কাজটাকে এক ইঞ্চি এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও কতো শক্ত। তাই কাজের চেয়ে বড়ো শিক্ষাদাতা আর কেউ নেই। এতোবড়ো অনুপ্রেরণাদাতাও আর কেউ নয়।

অন্যধরনের থিয়েটার হওয়া উচিত এই কথা মনে ক'রে আমরা কয়েকজন যখন কাজ শুরু করি সেটা আজ ২৩ বৎসর আগের কথা। তখনই আমার কাঁধে নির্দেশনার ভার পড়ে। সেই প্রথম। বন্ধুবর শ্রী বিনয় ঘোষের লেখা নাটক। 'ল্যাবরেটারী'। ১৯৪৩ সাল।

তারপর ১৯৪৪ সালের গোড়ায় সহোদরপ্রতিম শ্রী বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'। এবং শেষের দিকে 'নবান্ন'।

তখনকার থেকে আজকের বাঙলা থিয়েটার যে কতো বদলে গেছে তা কল্পনা করাও শক্ত। অবশ্য এমন হ'তে পারে যে আমি এই কাজটার সঙ্গে যুক্ত ব'লেই আমার মনে হচ্ছে আধুনিককাল খুব একটা কিছু করেছে। কেবল প্রতিফলিত গৌরবের অধিকারী হবো ব'লে। কিন্তু তখনকার দিনে যাঁরা

'নবান্ন' 'জবানবন্দী' দেখেছেন তাঁদের সংখ্যাই আজকের দিনে দর্শকের মধ্যে অত্যন্ত কম। তার ওপরে এমন লোক তো আরো কম যাঁরা পূর্বেকার থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ-সব নাটকগুলো দেখেছিলেন, এবং আজকের থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে মনে ক'রে বিচার করতে পারেন।

ফলে কিছু লোক যখন পুরোনো থিয়েটারের প্রশস্তি করেন তখন এ-বিচার করেন না যে, আমাদের মতো কিছু লোক কেন সে-থিয়েটারে তৃপ্ত হ'তে না-পেরে অন্য থিয়েটার করবার কথা ভেবেছিলো। আবার যাঁরা এখনকার নব-নাট্য আন্দোলনের সোচ্চার ঘোষণায় পুরোনো থিয়েটারকে একেবারে বরবাদ করেন, তাঁরা এ-বিচার করেন না যে সেটা যদি অতোই কদাকার ছিলো, তাহ'লে আমরা শিখলুম কোথা থেকে।

অর্থাৎ আমরা যদি কিছুই না মনে রাখতে পারি তাহ'লে এই যে-স্রোতটা নিরবধি চলেছে যুগ থেকে যুগে, তার কোনো রূপ তো বুঝতে পারবো না। বাঙলা নাট্যের কোনো চরিত্রই ধরতে পারবো না। তার গতি-প্রকৃতি, তার পুরাতনত্ব, এবং তার নবীনত্ব কিছুই বুঝতে পারবো না। অর্থাৎ কোন্‌টা যে এই স্রোতের মধ্যে নতুন এলো, আর কোন্‌টা যে আধুনিক পোষাকে সেই পুরোনো বস্তাপচা ভুষি, কিছুই পৃথক্‌ করতে পারবো না। ফলে, মুড়ি এবং মিছরির দর এক হ'য়ে যাবে। যেটা কখনো কোনো সমাজের পক্ষে মঙ্গলসূচক নয়।

আমার অনুমান হয় যে বাঙলা নাট্য নানা ক্ষেত্রে একেবারে বদ্‌লে গেছে। এমন-কি, ব্যবসায়িক মঞ্চেও। তখনকার দিনে ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাটক হ'তে পারতো, আজকাল হয় না।

সখীদলের নৃত্যগীত সেকালের নাট্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিলো। এখন সেটা ঘটে না। এখন পার্টির অছিলায় নাচানো হয়।

তখনকার অভিনয়ে বাচনভঙ্গীই অন্যরকম ছিলো, এমন-কি সামাজিক নাটকেও এবং সেটা কেবল খারাপ অভিনয়ের ক্ষেত্রেই যে হ'তো তা নয়। ভালো অভিনেতাদের বাচনভঙ্গীও তখনকার দিনে আর-একরকম ছিলো। শিশিরবাবু বা অহীনবাবুর শেষের দিকের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সে-কথা স্পষ্ট মনে থাকতে পারে।

যাই হোক্‌, এ-রকম অনেক বদল হ'য়ে গেছে। এবং সেটা প্রথম

স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারা যায় ব্যবসায়িক নাট্যমঞ্চগুলির বাইরে। যখন প্রথম 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' অভিনয় হয়। তখন এগুলোর অসাধারণ ও চমকপ্রদ নাট্যগুণ লোককে উচ্চকিত ক'রে দিয়েছিলো। আর কিছু-দিন পরেই শুরু হ'লো ঐ-রকম 'জনগণ'-এর নাটক লেখা। কিন্তু যে-সহানুভূতির জন্যে উপরোক্ত ঐ-নাট্যগুলি সত্যিই 'জনগণ'-এর রূপ ফোটাতে পেরেছিলো সেই মানবিক মূল্যবোধের অভাবে ক্রমশ নাটকে চারটে বলাৎকার, পাঁচটা শিশুহত্যা, আটটা নৃশংস প্রহারের দৃশ্য, — এইসব ঢুকতে লাগলো। মনে হ'লেও দুঃখ হয় যে এইসমস্ত ঘটনার একটাও যাদের জীবনে ঘটে তাদের পক্ষে এগুলো কি মর্মান্তিক, আর সেই মর্মান্তিক ঘটনাগুলোকে নিয়ে যাঁরা ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে নাট্যাভিনয় জমাবার চেষ্টা করেন তাঁরা — বোধহয় সৎ কাজ করেন না। এ-কাজটা honest নয়। মানুষটাকে দরদ দিয়ে ফোটানো আর sensationalism তো এক জিনিস নয়। তাই এগুলোকে বলা যায় অ-সৎ নাট্য। Dishonest theatre.

যাই হোক্, তারপর এলেন তুলসীদাস লাহিড়ী। তাঁর 'দুঃখীর ইমান' ও 'পথিক' নাটক যদিও ইতিপূর্বে শ্রীরঙ্গমে ও 'বহুরূপী'তে অভিনীত হয়েছিলো তবু তাঁর খ্যাতি বোধহয় 'ছেঁড়া তার'-এর পরেই সর্বাধিক হয়েছিলো। তাঁর লেখায় আবার আমরা বাস্তবের একটা অদ্ভুত সুন্দর ছবি পেলুম।

কিন্তু তারপর সবচেয়ে চমকপ্রদ নাট্যকার আবিষ্কৃত হলেন বোধহয় রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'রক্তকরবী' একটানে বাঙলা থিয়েটারকে অন্য জায়গায় এনে ফেললো। ফলে আরো-কিছু নাট্যকার মুছে গেলেন।

তারপর অনেক অনূদিত নাটক অভিনয় হয়েছে, নাট্যপ্রযোজনার নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এমন-কি 'রাজা'র মতো নাটকও অভিনয় করা গেলো, কিন্তু তেমন যেন আধুনিক নাটক বিশেষ পওয়া গেলো না। ভেবে দেখে আমার মনে হয় যে পাওয়াটাও খুব সহজ ছিলো না। কারণ এই ক'টা বছরে বাঙলার নাট্যক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে তা অকল্পনীয় ছিলো। এবং কি দ্রুতই না ঘটনাগুলো ঘ'টে চলেছে। যতোদিন বাস্তববাদী নাটকের রূপ ছিলো ততোদিন একটা ছক ছিলো। সেই ছকে বহুদিন থেকে নাটক লেখাও হচ্ছিলো। তারই মধ্যে কিছু আধুনিক কাহিনী বললেই সেটা আধুনিক নাটক হ'য়ে যেতে পারতো। কিন্তু 'নবান্ন'-এর নাট্যাভিনয় সেই

বাস্তববাদী আঙ্গিককে প্রথম ভাঙে। অথচ নাটকের কথাটা বাস্তবের সত্য। তার ওপর ছিলো তার একটা এপিক বিস্তৃতি। তবু তখনো বোঝা যায়নি এই প্রথম ভাঙাটা ভাঙতে ভাঙতে কতোখানি ভাঙাতে গিয়ে দাঁড়াবে।

এই দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের নাট্যের ছন্দ ধরা অতো সহজ ছিলো না। আর সেইজন্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে নতুন নাটক সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব ছিলো না। কিন্তু যে-দিন আমি প্রথম 'এবং ইন্দ্রজিৎ' পড়লুম, মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। মনে হ'লো, এই এতোদিন প্রতীক্ষার পর একটা আধুনিক নাট্যকার পাওয়া গেলো।

পৃথিবীতে কোনো দেশেই কখনো ভালো শিল্পী ভালো নাট্যকার অবিরত ও অজস্রভাবে জন্মায় না। এর এক একটা যুগ থাকে। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর যে সার্বিক উদ্দীপনা আমাদের আসবে ব'লে আশা ছিলো, যে-নবজাগরণের কল্পনা করা গিয়েছিলো, তা দুর্ভাগ্যবশত ঘটলো না।

আমাদের জীবনে নতুনকে স্বাগত জানালে ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই অর্ধসমাপ্ত নবজাগরণ এইকালে সম্পূর্ণ হ'তো। হ'লো না।

অথচ মজার কথা এই যে, এইসমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ঘাঁটিগুলোও আজ দেশের অবস্থার তিক্ত সমালোচনায় যাকে বলে সোচ্চার। কয়েকদিন আগে একটি ব্যবসায়িক মঞ্চের এক কর্তা আমাকে একটি নতুন নাটক প'ড়ে শোনান। তাতে দেশে যে ন্যায়নীতি কিছুই নেই, এবং সমাজের উপরের স্তরে যে কতো পাপ ঢুকেছে আর সাধারণ মানুষ যে কতো দুঃখী সে-সম্পর্কে বহু জ্বালাময়ী ভাষণ আছে।

শুনে বড়ো কৌতুক অনুভব হ'লো। বললুম, — এ-নাটক তো ভীষণ বামপন্থী নাটক মনে হচ্ছে।

তিনি আহ্লাদিত হ'য়ে বললেন, — আরো শুনুন, আরো আছে।

অর্থাৎ বামপন্থীর বেশে কড়া কড়া সমালোচনা করলেই যে একটা ব্যবসায়িক মুনাফার সুযোগ আছে এটা তাঁরা বুঝেছেন। ডাইভোর্স বিল পাশ হবার পরেও যে-থিয়েটারে আধুনিক নায়িকা গলদশ্রুলোচনে বলে যে, বিবাহের বন্ধন ইচ্ছা করলেই ভাঙা যায় না, এ-বন্ধন শুধু এ-জন্মের নয়, জন্মজন্মান্তরের, — সে-থিয়েটারেই আবার তিক্ত সমালোচনার ভাষণে নাটক চালানো হয়। তাঁরাও সামিল হ'য়ে গেছেন সমালোচনার ময়দানে।

কিন্তু দেশ তো শুধু পরস্পরকে তিক্ত সমালোচনা করলেই বাঁচে না, দেশ বাঁচে ভাঙার মধ্যে গড়ার রূপটাকে দেখতে পেলে। ভাস্কর যখন ছন্দোহীন একটা পাথরের চাঁইকে বাটালি দিয়ে কাটে, তখন সে শুধু ভাঙার কাজ করে না, ঐ বাঁকাচোরা পাথরটার মধ্যে যে-মূর্তিটা সে দেখতে পায়, তাকে পরিস্ফুট করার জন্যেই সে ভাঙে। এই অভূতপূর্ব ওলোটপালটের মধ্যে আমরাও বেঁচে যাবো যদি সত্যকে বোঝবার চেষ্টা করি।

আমরা যখন '৪৩ সাল থেকে প্রথম কাজ আরম্ভ করি তখন একটা কবিতা খুব আবৃত্তি করা হ'তো। তাতে ছিলো — 'ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে শৌখিন মজদুরি।' আরো দুটো লাইন ছিলো —

সেটা সত্য হোক্,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।

এই কথাগুলো আমাদের পক্ষে ভুলে যাওয়া শক্ত। তাই আমরা এইটাই চেয়ে এসেছি যে শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন চোখ ভোলাবার ব্যবসা না-করি। আমাদের অন্তরের কিছু গূঢ় উপলব্ধির কথা যেন প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'রে যেতে পারি। সেই উপলব্ধিই যেন আমাদের ভঙ্গীকে নির্ধারিত করে।

অপরের কাছেও আমি তাই-ই চাই। তা সে 'মজদুরি'ই হোক্ আর 'আর্তি'ই হোক্।

১৩৭৩

স্বগত

'নবান্ন' ও তার পরবর্তী পঁচিশ বছর সম্বন্ধে কিছু লেখা শক্ত। বিশেষ ক'রে আমার পক্ষে। তবু চেষ্টা করছি।

কিন্তু কী নিয়ে লেখা হবে? 'নবান্ন' নাটককে আশ্রয় ক'রে কীভাবে নাট্যাভিনয়টা গ'ড়ে উঠেছিলো? অবশ্য বলা উচিত বোধহয় নবান্ন নাট্য। কারণ দর্শকদের সামনে যেটা উপস্থাপিত হয়েছিলো সেটা তো কেবল অভিনয় নয়, আরো অনেক ব্যাপার ছিলো। যেমন প্রথম দৃশ্যে জনসাধারণের যে-লড়াইটা — সেটা ও নাটকের চরিত্রগুলোর সংলাপ আশ্রিত যে-প্রকাশটা, এই দুটোকে পৃথক ক'রে মঞ্চের ওপর দুটো স্তরে উপস্থাপন করা হয়েছিলো। এবং তার সঙ্গে নেপথ্য থেকে বাজনা ছিলো, সূত্রধার জাতীয় ঘোষণা ছিলো, আর কিছু আলো, ধোঁয়া, ও নামহীন চরিত্রগুলোর মধ্যে কিছু ঘটনাও ছিলো। এইসব মিলিয়ে যে-জিনিসটা তৈরী হয়েছিলো সেটা লিখিত নাটককে আশ্রয় ক'রেও সেটার থেকে পৃথক্। সেটা কেবল অভিনয়ও নয়। নাটক, অভিনয় ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কিছু জিনিস নিয়ে যে-বস্তুটি সৃষ্টি হয় সেটার কী নাম দেবো? এক কথায় বোধহয় বলা যায় নাট্য। 'নবান্ন' নাট্যের সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, সে এক রামায়ণ হবে। শুধু কী করা হয়েছিলো লিখলে তো হবে না, কেন করা হয়েছিলো সেটাও তো লিখতে হবে। কেন একটা অঙ্কের প্রত্যেকটা দৃশ্য পরিবর্তনের অন্ধকার সময়টুকুতে ভিক্ষুকদের আর্তনাদ ঢোকানো হয়েছিলো, কেন একটা দৃশ্যে পিছনের পর্দাগুলো টেনে ফাঁক ক'রে দেওয়া হ'তো, কেন একটা দৃশ্যে পিছনের পর্দার ওপর আলো ফেলে সামনেটা অন্ধকার রাখা হ'তো, — সে-সব অনেক লিখতে হয় তাহ'লে। তাছাড়া কতোজন লোক সত্যিই সে-সব খুঁটিনাটি জানতে আগ্রহী সেটার সম্বন্ধেও একটু সন্দেহ জাগে। কারণ তারপরেও কতো নাট্য সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কেউ তো সেগুলো লক্ষ করেছেন বা বিচার করেছেন, এ-রকম লক্ষণ পাওয়া যায় না সমালোচনাগুলো পড়লে! ফলে, সাধারণ সহৃদয় দর্শকের জন্যে যা আমরা করি তা না-ক'রে পারি

না ব'লেই করি। তাঁদের ভালো লাগলেই আমরা খুশি। গুদামী-জ্ঞানের ভাঁড়ার বাড়াবার জন্যে লিখতে কি আমি পারবো ?

তাহ'লে বাকি থাকলো সংগঠনের কথা। সেটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো একটা বড়ো ফাঁকি ছিলো, নইলে অতো তাড়াতাড়ি ভেঙে গেলো কেন ? বাজারে পারস্পরিক দোষারোপের যে-খেউড়গান চালু আছে, তার মধ্যে আমরা ভদ্রলোক হিসাবে না-ই-বা গেলাম। নবান্নের সময় যতো লোক একত্র হয়েছিলেন তার মধ্যে বেশ কিছু লোক দেশে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। যেমন, বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, গঙ্গাপদ বসু, চারুপ্রকাশ ঘোষ, নিমাই ঘোষ, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন। তবু আরো আরো নাট্যসৃষ্টি হ'লো না কেন ? এক নবান্ন নাট্যেই এর উত্থান ও পতন ধৃত হ'লো কেন ? এ-সম্পর্কে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কিছু বিচার বিবেচনা হয়তো প্রয়োজন ছিলো। – যদি দেশ কোনোদিন তার প্রয়োজন মনে করে, করবে। যদি না মনে করে, ভুলে যাবে। হ'য়ে গেলো।

তবে দু-একটা চুটকি কথা হয়তো লিখলে চলে।— নবান্নে চটের পর্দা ব্যবহার করা হয়েছিলো। পরামর্শটা দিয়েছিলেন মহর্ষি। শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। অনেকের ওটা ভালো লেগেছিলো কারণ ওর মধ্যে কেমন একটা গরীবিয়ানার ব্যঞ্জনা আছে। 'প্রোলিটেরিয়ান টাচ্'। আমাদের ভালো লেগেছিলো, ওর রঙের জন্যে। সস্তা তো হ'লোই। কিন্তু অমন রঙটা থিয়েটারে দেখা যায়নি তার আগে। যেন নতুন মানে তৈরী হ'তো একটা। মোটেই গরীব মনে হ'তো না। সামনে মুখে কালি-লাগা ছেঁড়া কাপড়-পরা মানুষগুলোর বিভিন্ন বিন্যাস, আর পিছনে ঝকঝকে নতুন চটের পর্দা। তখন ওপরের ঝালরগুলোকে একটু তুললেই যেন আকাশছোঁয়া মনে হ'তো পর্দাটাকে। কেননা, তখন সাধারণত যে-সব দৃশ্যপট চালু ছিলো তার মধ্যে পর্দা ঝোলালেই একটা নতুন অনুভব হ'তো। তার ওপর বর্ডারগুলো একটু তুলে দিলেই বিশাল মনে হ'তো। সেই বিশালতার অনুভবটা দরকার ছিলো নবান্ন নাট্যে।— আজকাল আর অতো সহজে কিন্তু দর্শককে নতুন অনুভব দেওয়া যায় না। দেখতে দেখতে এঁরাও বড়ো সেয়ানা হ'য়ে গিয়েছেন। আমরাই নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মেরেছি।

যে-রূপে নবান্ন নাট্য উপস্থাপিত হ'য়ে চিত্তহরণ করেছিলো, আমার গভীর

আশঙ্কা, ঠিক সেইরূপে দেখলে আজকের দর্শক হয়তো হতাশ হবে। কারণ, (আমি নিজের কথাই বলতে পারি) নিত্যকালের শাশ্বত আর্ট সৃষ্টি করবো ব'লে কখনোই নাট্যকর্মে লিপ্ত হইনি, বা হই না। সমকালীন লোকের বোধকে আনন্দ (মজা নয়) দেবার জন্যেই নাট্যকর্ম ক'রে থাকি। তার কোনোটা হয়তো শিল্প হয়, তাই 'সৃষ্টি' হয়, অনেকগুলোই হয়তো হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্যটা স্থান ও কালের সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা। সেটা ছিঁড়ে পঁচিশ বছর পরের দেখাটা ঠিক হ'তো না।

সেইকালে মনে একটা জোয়ার এসেছিলো। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য ও আমি, একটা গভীর বোধের ক্ষেত্রে পরস্পরকে বুঝতে পারছি ব'লে মনে হ'তো। সিদ্ধান্তে আসতে আমাদের দেরী হ'তো না। কল্পনার বল্‌গা আলগা ক'রে দিয়ে মনে হ'তো সবই যেন ক'রে ফেলা যায়। যাকে ইংরেজিতে বলে আকাশটাই যেন শেষ সীমা। তাই অনেক-কিছু সাহস করা গিয়েছিলো। এবং আরো যেতো, যদি-না —।

হয়তো তখনকার সেই মনে হওয়াটাই ছেলেমানুষি। তবু সেই ছেলেমানুষি অনুভবটা এসেছিলো ব'লে আমার ভাগ্যের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাইতো টিঁকে থাকতে পেরেছি। আরো কাজ করবার চেষ্টা করার সুযোগটা অন্তত পেয়েছি।

জীবনে চেনাজানা হয় বহু লোকের সঙ্গে, বন্ধুত্ব হয় কম। আমাদের সেই বন্ধুত্বের সম্পূর্ণটাই হয়তো টেঁকেনি, তবু একটা আস্বাদ দিয়ে গেছে যে কী ক'রে মানুষের সঙ্গে একত্র কাজ করতে হয়। তার জন্যে আমি খুশি। লাভটা তো আমারই রইলো।

চিত্ত ব্যানার্জির ওপরেও আমার ভীষণ ভরসা ছিলো। সে আগে যেতো। মঞ্চ সাজাতো, অন্যান্য বিলি ব্যবস্থা করতো। তারপরে স্নান ক'রে পাইপ মুখে দিয়ে বসতো। পরিশ্রমে ভয় পেতো না, মাথা খাটাতে পারতো সহজে। অন্য কেউ তো প্রায় কিছু জানতো না যে কতো কী করতে হয়। চিত্ত ছাড়া নবান্ন হওয়া শক্ত ছিলো।

কেউ কেউ মাঝে মাঝে বলেন — আবার সকলে একত্র হ'য়ে শুরু করা যায় না? — আমার কীরকম সন্দেহ লাগে। লোক ক'টাকে একত্র করলেই তো আর তাদের যৌবনটা ফিরে আসবে না। যতোগুলো বছর বয়স ছিলো, ততোদিনের মধ্যে যদি এতোটুকু সহানুভূতি পাওয়া যেতো, একটু সাহায্য,

তাহ'লে হয়তো আরো অনেক-কিছু করা যেতো। (এ-কথা বলাটাও হয়তো নিজের অক্ষমতার জাস্টিফিকেশন। যতোটুকু করেছি ঠিক ততোটুকুই হয়তো ক্ষমতা ছিলো। কে জানে ?)

তার চেয়ে আশা করবো, আজকের দিনে কয়েকজন মিলে যেন সেইরকম একটা বোধে একত্র হ'তে পারে। তাহ'লেই তারা আকাশ পাতাল সব নাড়িয়ে দেবে। বেশী লোকের দরকার হয় না। পাঁচজন লোক যদি একমনা হয় তো তারা পাঁচ হাজারের মওড়া নিতে পারে।

তাছাড়া সমাজের নাম ক'রে, আরো কতো বড়ো বড়ো ব্যাপারের নাম ক'রে ধম্‌কে ঘুরিয়ে দেবার লোকও তো চতুর্দিকে বহু বিস্তর। কোথায় পান থেকে চূণ বুঝি খ'সে গেলো, কোথায় সতীত্বের এতোটুকু স্খলন এইবুঝি হ'য়ে পড়লো, — এ-সব দেখবার স্বয়ম্ভূ গুরুজন তো, ফ্যামিলি প্ল্যানিং আরম্ভ হবার আগেও যেমন পরেও তেমন। অথচ বলবার কিছু নেই। ঝগড়া করবেন, না কাজ করবেন? ওরা লোককে বিভ্রান্ত করছে? লোকের মন বিষিয়ে দিচ্ছে? কী করবেন বলুন? কেউ তো ভ্যাকুয়ামে জন্মায় না। আমরা এই দেশে ও কালে জন্মেছি, এর ইতিহাস তো আমাদের বহন করতেই হবে। কপাল, ভাই কপাল।

এইসব আজে বাজে লেখায় আপনার কাজ হবে? যদি হয় ভালো। না-হয় সে-ও ভালো। ফেলে দেবেন। কি এমন কাণ্ডমাণ্ড করেছি আমরা যে তার হিসেব রাখতে হবে? এতোদিনে এখনো দেশের লোককে বোঝাতে পারিনি যে আপনারা প্রত্যেকে মাথা পিছু একটাকা ক'রে চাঁদা দিলে সংস্কৃতি-চর্চার একটা নতুন যুগ শুরু হ'য়ে যেতে পারে। সমাজ নেতাদের বোঝাতে পারিনি যে সংস্কৃতি জিনিসটার নিজস্ব একটা দাম আছে যার দ্বারা দেশের মানস তৈরী হয়। আরো অনেককেই অনেক কথা বোঝাতে পারিনি।

ধরা যাক, আমরা ম'রে গেলে হয়তো দেখবেন আমাদেরই মতো বেপরোয়া হ'য়ে যদি কিছু ছেলে-মেয়ে কাজ করতে আরম্ভ করে তো তখন হয়তো আমাদেরই নাম ক'রে তাদের ধম্‌কানো হচ্ছে। ধরুন যদি তাই-ই হয়, তখন আপনি নিশ্বাস ফেলে ভাবতে পারেন, যাক ইতিহাস এদের স্বীকৃতি দিয়েছে। — কী কাঁচকলার দাম আছে সেই স্বীকৃতির বলুন ?

১৯৭০

প্রেমের পরিশ্রম

আমাকে আমার নিজের কথা বলতে বলা হয়েছে। কিন্তু নিজের কথা বলা সবসময়েই অত্যন্ত কঠিন। কারণ, ভয় হয় যে আত্মকথা বড়ো সহজেই আত্মবিজ্ঞাপন হ'য়ে যেতে পারে। তাছাড়া শিল্পকর্মের মধ্যে মানুষের সত্তা এতো গভীরভাবে জড়িত থাকে যে নিজেও তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। ফলে, অনেক সময়ে আমরা নিজেদের সত্তার একটা কাল্পনিক চেহারা খাড়া করি এবং নিজের একাগ্রতার ও কীর্তিকলাপের একটা মনোহর মূর্তি আরোপ করি। অতএব এ-রকম ব্যক্তিগত আলোচনায় সেইটুকু প্রমাদের সম্ভাবনা মেনে নিয়েই তার গুণবিচার করতে হয়। তবু বারবার আমি আমি উচ্চারণ করতেও মানুষের বড়ো সঙ্কোচ হয়। তাই ধ'রে নেওয়া যাক যে আমি একজনের কথা বলছি যে সম্পূর্ণ ক'রে হয়তো আমি নয়, আমার চরিত্রের যতোটুকু realized এবং যতোটুকু unrealized, তার খনিকটা হয়তো realizable, আর খানিকটা হয়তো একেবারেই un-realizable, অথচ এইসমস্তের নিরবচ্ছিন্ন টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যে-লোকটাকে আমি খুব অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করি, এ সেই লোকের কথা, — যার নাম, ধরা যাক, 'ক'।

ক যে কেন থিয়েটারে এলো এ-কথা আমিও অনেকবার ভেবেছি। সে-যে খুব একটা বুদ্ধিমান লোক তা নয়। তার দেহ এবং মুখটা সৃষ্টি করবার সময়ে সৃষ্টিকর্তাও বোধহয় বেশ আনমনা ছিলেন, তাই ফলটা খুব-একটা চেয়ে দেখবার মতো নয়। তবু ক যে থিয়েটারে এলো তার কারণ হয়তো একটা জান্তব আকর্ষণ। হয়তো বুদ্ধি কম ব'লেই থিয়েটারের মধ্যে দেহের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের যে-সুযোগ আছে সেটাই তাকে আকৃষ্ট করেছিলো।

যাই হোক্, এ-কথা স্বীকার্য যে সে খেটেছিলো। বছর পনেরো বয়স থেকে সে প্রায় পনেরো বছর ধ'রে প্রত্যহ গলা তৈরীর জন্যে খেটেছে। একনাগাড়ে অন্ততপক্ষে দৈনিক দু-ঘণ্টা, কিন্তু প্রায়শই তিন-চার ঘণ্টা। সে

তারস্বরে কবিতা কিংবা পুরোনো নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্রের সংলাপ আবেগময় কণ্ঠে আবৃত্তি করেছে।

সত্যি, সে-সময়ে এই ক পাড়ার লোকেদের কাছে এক নিদারুণ nuisance হ'য়ে উঠেছিলো। একজন প্রতিবেশী তো রেগেমেগে অন্য এক প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা, ওদের বাড়ীর ছেলেটাকে কি কুকুরে কামড়েছে? নইলে অমন জলাতঙ্ক রুগীর মতো চেঁচায় কেন?'

কিন্তু এই চর্চা জিনিসটা নেশার মতো, এটা তো সত্যিই দুই তিন বা চার ঘণ্টার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। চলন্ত বাসের মধ্যেও কবিতার পদ মনে পড়তে থাকে, এবং মুখ ফুটে বেরিয়েও পড়ে। কখনো কখনো বেশী জোর হ'য়ে গেলে পাশের যাত্রী হয়তো অবাক হ'য়ে তাকায়, ক তখন ভ্রূ কুঁচকেয়ে কাশির শব্দ ক'রে ব্যাপারটা চাপা দিতে চায়।

আমি ভালো ক'রে জানি ক-এর মনে কোনো dedication-এর অনুভব ছিলো না। তার এই অভিনয় সম্পর্কিত পাগলামিকে justify করতে সে হয়তো অন্য লোকের কাছে খুব গম্ভীরভাবে dedication-এর কথা বলেছে, কারণ ঐ-ধরনের কথা শুনলে লোকে lost case মনে ক'রে আর বেশী কিছু বলে না, কিংবা হয়তো এই গভীরভাবের জন্যে একটু শ্রদ্ধাও বোধ করে। কিন্তু ক-এর কাছে আসলে এটা ছিলো নেশা। তাই এই চর্চার প্রতি পদক্ষেপে সে অনেক জিনিস আবিষ্কার করতো। হঠাৎ হঠাৎ গলার থেকে এমন একটা modulation বেরুলো, বা এমন একটা আওয়াজ বেরুলো যে অত্যন্ত চেনা একটা সাধারণ লাইন যেন অদ্ভুত একটা নতুন আলোতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতো। ক জানে যে সে-আওয়াজটা সে বুদ্ধি ক'রে বের করেনি, বা সে-modulationটা সে সচেতনভাবে করবো ব'লে করেনি। তার ভেতরের কোনো এক অজ্ঞাত কার্যকারণের যোগে যেন আচমকা এই একটা প্রকাশ হ'লো। আর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত কথাগুলো যেন একটা নতুন রঙ পেলো, আবেগের তীব্রতায় হঠাৎ যেন একটা মন্ত্রের মতো গভীর হ'য়ে উঠলো।

কবিতার মধ্যেও ছন্দের গুণে চেনা কথা এইরকম গভীর হ'য়ে ওঠে। কবিতায় ছবি থাকে। ক আপ্রাণ চেষ্টা করতো যাতে সেই ছবিগুলো তার

আওয়াজে ফোটে। সেই ছবির পিছনে কিন্তু নানান্ আবেগ, নানান্ অনুভব। এই-যে ছবি, আবেগ, শব্দ, সমস্ত মিলিয়ে মানুষকে একটা নেশার জগতে নিয়ে যায়, যেখানে পৌঁছুলে পৃথিবীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকেও যেন আরো স্পষ্ট ক'রে ফোকাসে দেখা যায়। Aldous Huxley একটা ওষুধ খেয়ে তুচ্ছ জিনিসের মধ্যে যে প্রায়-অসীমকে দেখতে পাওয়া যায় ব'লে বর্ণনা করেছেন, আমি জানি, কবিতার বা নাটকের চর্চায় ক-এর তাই হ'তো।

তারপর যতো তার গলা তৈরী হ'তে থাকলো ততো সে যেন ঐ গলার আওয়াজের মধ্যে আর-একটা সত্তাকে আবিষ্কার করতে থাকলো। সে যেন ক নয়, অন্য আর-একজন। অচেনা, কিন্তু খুব চেনা। ক-এর কীরকম অদ্ভুত লাগতে লাগলো। মনে হ'লো কে আমি? আমার অভিনয়ে বা আবৃত্তিতে আমার কণ্ঠ যে-চরিত্রটা প্রকাশ করছে সেই আমি, না দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে নির্বর্ণ যে-লোকটাকে আমি চিরকাল জানি সে-ই আমি? কোনটা আমি?

এ-কথাগুলো হয়তো একটু নিরবয়ব, একটু অবাস্তব সূক্ষ্মতাপ্রীতি ব'লে মনে হ'তে পারে অনেক শ্রোতার। কিন্তু আমি বেশ ভালো ক'রে জানি যে এই বোধের সম্মুখীন হ'য়ে আমাদের ক খুব হতবুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছিলো। সে একটা অতি সাধারণ লোক, এবং অতি সাধারণভাবে চাকরীবাকরী ক'রে বাঁচবার জন্যেই সে হয়তো জন্মেছিলো। কিন্তু এই থিয়েটার করবার নেশা তার পক্ষে কাল হ'লো। কেবল সামান্য একটু অভিনয় করতে চেয়ে সে ভাবলো যে গলাটা একটু তৈরী করা দরকার। গলাটা তৈরী করতে নেমে তার মনে হ'লো একটু কবিতার সাহায্য নেওয়া দরকার। কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে দেখলো অনেক বিচিত্র অনুভূতিকে স্পষ্ট করবার আছে। এবং সেই অনুভবগুলোকে প্রকাশ করতে গিয়ে তার গলা, তার প্রকাশভঙ্গী একটা নিজস্ব সত্তা পেতে লাগলো। তাহ'লে কি এই সত্তাটা তার মধ্যে সুপ্ত ছিলো, নাকি অন্য শিল্পীদের মানস তার ওপর আরোপিত হচ্ছে? অর্থাৎ সামান্য একটা অভিনেতা হ'তে গিয়ে তার নিজের পরিচয় সন্ধানের সমস্যায় জড়িয়ে পড়লো।

অবশ্য শুধু এইটুকু হ'লেও আমি ক-এর জন্যে হয়তো বিশেষ সহানুভূতি বোধ করতুম না। কিন্তু জীবনের হাতে মানুষকে মারবার অজস্র অস্ত্র

আছে। সে ক-এর মাথায় প্রথমে এই প্রতীতি ঢোকালো যে অভিনয়ের সময়ে বা কবিতা আবৃত্তির সময়ে যে পরিচ্ছন্ন, সুবিন্যস্ত ও সূক্ষ্ম অনুভবসম্পন্ন ব্যক্তিত্বটি প্রকাশ পায় সেইটেই তার আসল সত্তা। এবং সেই সত্তার প্রকাশে ক যখন বেশ দক্ষ হ'য়ে পরিতুষ্ট হ'য়ে উঠেছে, তখন হঠাৎ একদিন দেখিয়ে দিলো যে তার পুরো প্রকাশের বস্তু ও ভঙ্গী বাস্তব থেকে বহুদূরে। প্রায় একটা মূল্যহীন আকাশী ফুলের মতো। বেচারা ক।

কিন্তু ঘটনাটা বলি। তখন যুদ্ধের সময়। বাঙলাদেশে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো। সারা প্রদেশে লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিলো। এবং প্রত্যেক মৃত্যুর বদলে মজুতদার ও কালোবাজারীরা মোটা মুনাফা করেছিলো।

তখন অন্য অনেক লোকের মতো ক-এরও মনে হ'লো যে থিয়েটারে এই অনাচারের রূপ দেওয়া চাই। আমাদের দেশের চাষীদেরকে অভি-নয়ে ফুটিয়ে তোলা চাই। নাটক লেখা হ'লো একটা জেলার উপভাষায়। সে-নাটকে চাষারাই নায়ক। সেই নাটকের মহলায় ক আতঙ্কিত হ'য়ে দেখলো যে একটা বাস্তব চাষীকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা তার নেই। তার কণ্ঠ মার্জিত, তার উচ্চারণ পরিষ্কার, এবং প্রকাশভঙ্গী কাব্যাদর্শে পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সেই গুণগুলোই তার পক্ষে প্রচণ্ড বাধা হ'য়ে দাঁড়ালো। একটা বাস্তব চাষার অবোধ সরলতা, তার অমার্জিত কণ্ঠ, তার অপরিষ্কার উচ্চারণ, ও অপরিচ্ছন্ন প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে জীবন্ত মানুষটা, তাকে সেইভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা ক-এর নেই। অথচ নতুন অভিনেতারা যারা কোনোদিন ক-এর মতো অনুশীলন করেনি, যারা অভিনেতা হিসেবে ক-এর তুলনায় একেবারে নগণ্য তারাও যেন সেই চাষাদের বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে পারছে, কিন্তু ক পারছে না। তাহ'লে কি শিল্পে অনুশীলনের কোনো দাম নেই? অপরিশীলিত শিল্পীর মধ্যে যে-সততা প্রকাশ পায় সেটা কি অনুশীলনের ফলে ম'রে যায়? তখন কি প্রাণের চেয়ে রূপটা বড়ো হ'য়ে ওঠে?

তখন ক যে কতোদিন ধ'রে কীরকম কষ্ট পেয়েছে তা বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ মানুষ যদি হঠাৎ বুঝতে পারে যে তার মুখটা আর মুখ নেই, মুখোস হ'য়ে গেছে, যদি বুঝতে পারে যে অন্তরে যেটা সে

গভীরভাবে অনুভব করছে বাইরে তার প্রকাশটা ক্যারিকেচারের মতো দেখাচ্ছে, তাহ'লে সেই দ্বিধান্বিত মানুষটার কষ্ট শুধু অনুমানই ক'রে নিতে হয়, বর্ণনা করা যায় না। শিল্পের দেবী যে কতোখানি নিষ্ঠুর এই প্রথম ক-এর সেই দীক্ষা হ'লো।

তখনই সে এই ক্ষেত্র থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারতো, এবং নিজের অনুশীলিত গুণকে অর্থোপার্জনের কাজে লাগাতে পারতো। কিন্তু বোকা ব'লে এবং ভয় পাওয়াটাকে স্বীকার করবার সাহসের অভাবে ক থিয়েটারে র'য়ে গেলো।

এবং কঠিন দুঃখের সঙ্গে তাকে বুঝতে হ'লো যে শিল্পের সমস্ত প্রকাশভঙ্গীই আসল মানুষটার থেকে এক ঘাট দূরে। কারণ সে বুঝলো, তার অন্তরের কোনো contour নেই। সেটা একটা amorphous পিণ্ড যার কোনো আদি অন্তও দেখতে পাওয়া যায় না। এবং যেটুকু দেখা যায় সেটুকুও প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। ফলে, যে-মূহূর্তে মানুষ একটা প্রকাশভঙ্গীকে আশ্রয় করে সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকাশভঙ্গীই মানুষটার পরিচয়কে সঙ্কীর্ণ করে। শুধু তাই নয়, সেই প্রকাশভঙ্গী তার নিজস্ব form-এর logic-এ ছোট্টো জমির ওপরে একটা বিরাট sky-scraper-এর মতো উঁচু হ'য়ে ওঠে।

ক তাই নিজের সমস্ত অতীত পারদর্শিতার কথা ভুলতে চেষ্টা করলো। অন্যান্য অপরিশীলিত অভিনেতাদের ভঙ্গীকে সে নকল করতে লাগলো, যাতে তাকে একটা বাস্তব চাষা ছাড়া আর-কিছুই মনে না হয়।

কিন্তু এই চেষ্টার সূত্রে ক-এর আর-একটা কথাও মনে হ'তে থাকলো। সেটা হচ্ছে, অভিনয়টা কখন শিল্প হয়? যদি অনুশীলনের প্রয়োজন না-থাকে, তাহ'লে actingটা তো acting নয়, কেবল behaving। তাহ'লে সিনেমায় যে-পশুপক্ষীকে ব্যবহার করা হয় সেইটাই acting-এর চরম, কারণ তাদের তো পশুপক্ষী ছাড়া কিছু মনে হয় না। এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ গল্পের মধ্যে খাপ খেয়ে যায়। অর্থাৎ কুকুর বা পাখী বা অভিনয়ে অ-কুশলী কোনো অভিনেতার যে amorphous সত্তা সেটা এইরকম behaviour-এর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেতে পারে, যদি কোনো কুশলী নির্দেশক ভগবানের মতো এদের ব্যবহার ক'রে নেয় তাহ'লে এদের সেই অসৃষ্টিক্ষম behaviour-ই দর্শককে বিস্তীর্ণ একটা রূপবিহীন গঠনবিহীন সত্তার আবেগ অনুভব করাতে পারে।

কিন্তু যে-মুহূর্তে অভিনেতা সচেতনভাবে সৃষ্টিশীল হ'তে চাইবে সেই মুহূর্তে কিন্তু সে খণ্ডিত হ'লেও বিশিষ্ট হবে। তাই অনেক ফিল্ম নির্দেশক বিশিষ্ট অভিনেতাকে নিতে চান না। তার চেয়ে কাঁচা নতুন লোক তাঁরা বেশী পছন্দ করেন। যে শুধু behave করতে পারবে, অভিনয় করতে চাইবে না।

আশা করি, পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এইসমস্ত চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবার দরুণ আমাদের দেশে থিয়েটার সিনেমার যে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র সেখানে রোজগার করার সুযোগ ক ক্রমশই হারাতে থাকলো। কারণ নিজেকে কাপুরুষ ব'লে স্বীকার ক'রে নেবার মতো সৎ সাহস ক-এর ছিলো না। কথাটা সম্পূর্ণ ঠাট্টা নয়। বাঘের সামনে পড়লে মানুষ যদি পালায় তাহ'লে সে-কাপুরুষতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু নিজের একটা বিশিষ্ট সত্তা গঠন করার মানেই হ'লো একধরনের আদর্শবাদ। এবং এই idealization-এর একটা stance থাকে, একটা অস্বাভাবিকত্ব (তা সে যতো অল্পই হোক্) থাকেই থাকে। চট ক'রে সেখান থেকে সে নামতে পারে না।

তাই ক যতোই তার idealized চরিত্রের জন্যে অভ্যর্থিত হ'তে থাকলো, ততোই তার ভয় হ'তে থাকলো সে আবার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে।

সে তো অভিনেতা হ'তে চেয়েছিলো, একটা অবোধ্য জান্তব আকর্ষণে। সেই লীলার অবকাশ তার কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে? সেই-যে হৃদয় এবং বুদ্ধি এবং দেহকে মিলিয়ে এক মহৎ আনন্দের আস্বাদ সে পেতে চেয়েছিলো এবং লোককে দিতে চেয়েছিলো সেটা কোথায় গেলো? সমস্ত প্রশংসার মাঝখানে ক-এর নিজেকে দেউলে মনে হ'তে লাগলো। ভয় করতে লাগলো যে আজ যারা প্রশংসা করছে, তারাই হয়তো কাল ওকে ঠগ্ ব'লে দংশনোদ্যত হবে।

আমি ক-কে বহুদিন থেকে জানি। কতোবার তাকে আমি এইরকমভাবে পরাজিত পশুর মতো ধুঁকতে ধুঁকতে নিজের কোটরের মধ্যে ফিরে আসতে দেখেছি। আজ সে বুঝেছে বারেবারে সে যেমন একটা জিনিসকে প্রকাশ করার জন্যে কতো সত্য কতো মিথ্যা মিলিয়ে একটা জটিল প্রকাশভঙ্গী গঠন ক'রে তুলবে, তেমনি আর-একটা প্রকাশের অসুবিধে হচ্ছে ব'লে সেই পুরোনো প্রকাশটাকে নিঃশেষ ক'রে ভাঙবে। কিন্তু এ তো তার নিজেকেই ভাঙা। অথচ সব তো ভাঙা যায় না, সব ভোলা যায় না।

তবু এখনো ক আছে। যদি সে ঘূণাক্ষরেও জানতো যে কেবল অভিনেতা হওয়ার জন্যে তাকে এতো দাম দিতে হবে, তাহ'লে সে কোনোদিন থিয়েটারে আসতো কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি। সে যে বোকা, সে যে আদর্শকে আর বাস্তবকে জীবনে মেলাতে পারলো না, তার জন্যও তাকে আমি ভালোবাসি। তার সমস্ত পাপকে আমি জানি, আর তার শুচিতাকেও জানি। তাই তাকে আমি ভালোবাসি।

একদিন একটা পরাজিত সন্ধ্যায় আমি রাগ ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলুম — 'তুই রয়েছিস কী ক'রে এতোদিন থিয়েটারে ? থিয়েটার তোকে কী দিয়েছে ? বারেবারে শুধু তোকে ঠকিয়েছে। সার্থক ক'রে দেবে ব'লে লোভ দেখিয়ে তার পরমুহূর্তেই তোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তোর লজ্জা করে না ? তুই আছিস কী ক'রে ?'

ক ক্লান্তভাবে আমার দিকে তাকিয়ে কথাটা ভাবলো। তারপর দুঃখের হাসি হেসে মাথা নেড়ে বললে, 'কী করবো আমি-যে থিয়েটারকে ভালোবেসেছি।'

অতঃ কিম্?

আমার লেখা সম্পর্কে আমার অনেক সঙ্কোচ আছে। একসময়ে যা লিখি পরে আর-এক সময়ে সেটা অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়। মনে হয় যা ভেবেছিলুম তা যেন প্রকাশ করতে পারিনি। প্রাঞ্জল হয়নি। কিংবা সরল করতে গিয়ে জটিলতার আভাসটা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। আসল কথা এই জটিলতাটা। স্তরের পর স্তর, তারপরে আবার আরো স্তর। কলাশিল্পের ব্যাপারটাই বহুস্তরে ছড়ানো, ব্যাপ্ত। কবি জীবনানন্দ যখন বলেন —

> আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি।
> আবার বছর কুড়ি পরে।

কিংবা বলেন,

> শোনা গেল
> লাসকাটা ঘরে
> নিয়ে গেছে তারে।

তখন সে-কবিতাগুলো কেবল খবর নয়। ছন্দে সুরে কথায় এমন একটা-কিছু প্রকাশ পায় যা মানুষের মনের বহুস্তরে আবেদন জানায়। খালি বহুস্তরে নয়, কিছু মূল অনুভব মানুষের থাকে, সেইখানে গিয়ে ঘা দেয়। এইরকম ব্যাপারটাই ঘটে সমস্ত কলাশিল্পের ব্যাপারে। অথচ সেইটার কোনো সংজ্ঞা আমার জানা নেই। কী ক'রে সেটা যে বোঝানো যায় তা-ও আমি বুঝতে পারি না। আরো একটা কারণ বোধহয় এই যে, কারা আমার লেখাটা যে পড়বেন তা-ও আমি বুঝতে পারি না। ফলে, লিখতে ব'সে আমার দ্বিধা কখনোই ঘোচে না। বহুদিন পূর্বে 'বহুরূপী'র হ'য়ে একটা প্রচারপত্র লিখতে হয়েছিলো। তাতে লিখেছিলুম যে অভিনয়ের সময়ে অনেক 'আহার্যের' প্রয়োজন। আহার্য কথাটা প্রাচীন অর্থে, অর্থাৎ মঞ্চে অভিনয়ের জন্যে যে সমস্ত উপকরণ আহরণ করতে হয় — এই অর্থে, ব্যবহার করেছিলুম। মনে হয়েছিলো অভিনয়ের কথা যখন গম্ভীরভাবে লেখা হচ্ছে তখন শাস্ত্রোক্ত শব্দ ব্যবহার করাই প্রশস্ত। ফল হ'লো উল্টো। অনেকেই ভাবলেন, ওটা

অভিনয়ের সময়ে খাওয়া-দাওয়ার কথা। কেউ কেউ আবার সহানুভূতির সঙ্গে বললেনও যে, সত্যিই তো কেবল তো আর পেটে কিল মেরে আর্ট করা যায় না, অভিনেতাদেরও তো খেতে হয়।

শব্দ ব্যবহারের এই দোষ যে আমার এখনো গেছে তা মনে হয় না। কথোপকথনে বা অভিনয়ে একটামাত্র শব্দের ওপর ঝোঁক দিয়ে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ বদ্‌লে দেওয়া যায়। একটা গল্প আমরা ছোটোবেলায় শুনতুম, মন্ত্রী বুঝি রাজার নাপিতকে ডেকে কামিয়ে যেতে বলেছেন, নাপিত ব্যঙ্গের সুরে উত্তর দিলে, আপনাকে আর কামাবো না, এই যাচ্ছি। ব'লে রাজার কাছে চ'লে গেলো। মন্ত্রী রেগে ফুসতে ফুঁসতে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন — কী বলেছিস ব্যাটা? নাপিত সবিনয়ে বললে, আজ্ঞে মহারাজ আমি বলেছি যে আপনাকে আর কামাবো না, এই যাচ্ছি — ব'লে তাড়াতাড়ি আপনার কাছে চ'লে এসেছি, মন্ত্রীমশায় ধর্ম্মত বলুন এছাড়া আমি আর কী বলেছি। ফলে, রাজার চোখে মন্ত্রীমশায়ের কেস্‌টা একটু কাঁচা হ'য়ে গেলো।

এ তো গেলো পুরো বাক্যটাই ব্যঙ্গের সুরে বলার কথা। কিন্তু কেউ যখন কাউকে বলেন — আপনি তো শিল্পী, — তখন বলার ভঙ্গীতে শিল্পী কথাটা যেন উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে প'ড়ে যায়। তাতে তাঁর শিল্পী সম্পর্কে কী মনোভাব — অনেক সময়েই খুব জটিল মনোভাব — প্রকাশ পেয়ে যায়। অথচ কতো সহজে, কতো অল্পের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে যায়। কিন্তু লেখার সময়ে তো পাতাটাকে এ-রকম চিহ্ন কণ্টকিত ক'রে তোলা যায় না, — আর অতো চিহ্ন নেই-ও — ফলে পাঠককে ঠিকমতো জায়গায় ঝোঁক দিইয়ে নেওয়া কেবলমাত্র বড়ো লেখকদের লেখার কৌশলেই সম্ভব। আর তাই আমার অনেক দ্বিধা।

ধরা যাক অভিনয়ে একটা কথা বলতে হবে — আমি তোমায় ভালোবাসি। এখানে আমি-র ওপর ঝোঁক দিলে একটা মানে হয়, তোমায়-এর ওপর ঝোঁক দিলে আর-একটা মানে হয়, আবার ভালোবাসি-র ওপর ঝোঁক দিলে তৃতীয় একটা মানে হয়। অথচ বাক্যটাকে ছাপার অক্ষরে পড়লে প্রথম প্রতিক্রিয়ায় কি ছেঁদো, কি তুচ্ছ ব'লে মনে হয় আমাদের। কিন্তু কোনো ভালো অভিনেতা ঐ আমি-র ওপর ঝোঁক দিয়ে এমনভাবে

বলতে পারেন কথাটা যে মনে হবে, তুমি আমাকে প্রতিদানে ভালোবাসো বা না-ই বাসো, আমার জীবনে এর জন্যে যতো দুঃখ বা যতো দুর্ঘটনাই ঘটুক বা ঘ'টে থাক, তবু আমি নিসঙ্কোচে নির্মল হ'য়ে বলবো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি। তখন এ-কথাটা মনে হ'তে পারে 'রাজা' নাটকের সুদর্শনার শেষ আত্মোৎসর্গের মতো। সাধারণ সম্পর্কের খুচরো লেনদেনের পরিধির বাইরে গিয়ে আমাদের মূল অনুভবের কোথাও গিয়ে এটা নাড়া দেবে। যদি ইংরেজিতে বলা যায় যে archetypal অনুভব ব'লে কিছু আছে তাহ'লে এই স্বীকৃতির উলঙ্গ সততা আমাদের সেই মূল অনুভবের জায়গায় গিয়ে নাড়া দেয়। যার জন্যে মিস্টিকদের সহজ সরল লেখা, তাদের আত্মনিবেদন, আমাদের এখনো মুগ্ধ করে। এতো মুগ্ধ করে।

অবশ্য এটা কেবল একটা শব্দের ওপর ঝোঁক দেওয়ার কথা নয়। অভিনেতার ব্যক্তিত্বের গভীরতা, তার কষ্টার্জিত উপলব্ধির কথা, এই একটা বাক্যের উচ্চারণের পিছনে যেন একটা পুরো আকাশ জাগিয়ে তোলে। অথচ কতো স্বল্পে কতো সংক্ষেপে হয়। এই-যে অল্পের মধ্যে অনেক কথা প্রকাশ করবার সুবিধে আছে অভিনয়ে এইটেই আমাকে আকর্ষণ করে।

আরো একটা বড়ো উদাহরণ ধরা যাক। — সে এখানে আসবে বলেছিলো, কিন্তু এখনো এলো না। এই কথাটায় যদি সে এবং এলো-র ওপরে ঝোঁক দেওয়া যায় তাহ'লে অভিনয়ের যে-ভঙ্গী হবে, আর আসবে এবং না-এর ওপরে যদি ঝোঁক দেওয়া যায় তাহ'লে যে-ভঙ্গী হবে, দুটো একেবারেই পৃথক্। এই পৃথকত্বের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতার অঙ্গভঙ্গীও বদলে যায়। অর্থাৎ বাক্যটার তাল ভিন্ন হয় ব'লে অঙ্গভঙ্গীর তালও সেই অনুযায়ী হয়। (এখানে অঙ্গভঙ্গী বলতে অবশ্য সামান্য মাথা ঝাঁকানো বা ভুরু তোলাও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।)

প্রত্যেক সংলাপের — তা সে কী গদ্যে কী পদ্যে — একটা তাল থাকে। (সুরও থাকে। যখন বলি, যাবে (অর্থাৎ আমি জানি সে যাবে), তখন একটা সুর হয়। আর যখন জিজ্ঞাসা করি, যাবে ?, তখন আর-একটা সুর হয়।) কিন্তু এই তালটা পর পর বাক্যগুলোয় একরকম থাকে না। আমরা যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলি তখন লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে অহরহ কি ভীষণ তালফেরতা হয়। কথা বলার সময়ে যখন আমরা বলি - সে বললে এখানে আসবে, এখনো দেখা নেই — তখন অংশদুটো দু-ভাবে বলি। শুধু

তাই নয়, 'বললে' শব্দটার ওপর যতো ঝোঁক দেওয়া হবে সেই অনুযায়ী তার আগের 'সে'-টার ততো পরিবর্তন হবে। যদি বললে-র ওপর প্রবলতম ঝোঁক দেওয়া যায় তাহ'লে দেখা যাবে 'সে'-টা যেন তালধরার আগে ফাঁকে চ'লে গেলো। তারপর 'আসবে'-র পর একটা ছেদ। এবং ছেদের পর 'এখনো দেখা নেই'-টা অন্য তালে ও অন্য সুরে বেরিয়ে এলো।

এ এক অদ্ভুত মজার খেলা। লোকের কথাবলা শোনা। কতোরকম-ভাবেই যে লোকে কথা বলে। এবং আলাদা আলাদা মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের লয় যেমন আলাদা ঠিক সেই অনুযায়ী তাদের কথা বলার লয়ও আলাদা। আর তাই যে-লোকের বুদ্ধি দ্রুতগতি, অনুভবশক্তি তীক্ষ্ণ, সে-লোক যখন ধীর লয়ে কথা বলে তখন একটা সংহত বজ্রশক্তির পরিচয় আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তাইতো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কথা ব'লে পৃথিবীর দেশদেশান্তরের এতো লোক অতো মুগ্ধ হতেন।

যাই হোক্, কথার মধ্যে এই-যে তালের বদল এটা কবিতাতেও হয়। "দেবী আছো, আছো তুমি। দেবী, থাকো তুমি।" 'বিসর্জন' নাটকের এই অংশটা যদি চোদ্দ অক্ষরের ছাঁদে যেমন সাজানো আছে সেই হিসেবেই কেউ বলে তাহ'লে আড়ষ্ট লাগবে, জয়সিংহ মানুষটাকে পাওয়া যাবে না। সে যে 'দেবী আছো, আছো তুমি' বলছে সেটা তার মনে যে-সন্দেহ জেগেছে তাকে চাপা দেবার জন্যেই বলছে। তারপর অল্প একটু চুপ। সেই চুপের মধ্যে সে বুঝতে পারে যে তার সন্দেহটা দুর্নাশী, দেবী যে আছে এটা জোর ক'রে বলবার ক্ষমতা তার ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে, তাই নিমজ্জমান ব্যক্তির অসহায় ব্যাকুলতায় সে ব'লে ওঠে — 'দেবী, থাকো তুমি।'

এখানে থাকো-র ওপরে ঝোঁক দেওয়ার জন্যে, হয় দেবী শব্দটা স্বল্প হ'য়ে তালের আগে ফাঁকে চ'লে যাবে, নয়তো দেবী-র ঈ-টা দীর্ঘ হ'য়ে বেশী মাত্রার মূল্য পাবে। তারপর থাকো-র আ-কারটাও বিস্তৃত হবে। ফলে, দেবী ও থাকো এই দুটি শব্দের দীর্ঘ স্বরবর্ণ উচ্চারণের সঙ্গে তুমি যুক্ত হ'লে লিখিত ছন্দের ছয় অক্ষরের ছয় মাত্রার চেয়ে এই বাক্যের মাত্রামূল্য অনেক বেশী হয়। অর্থাৎ এইরকম কাব্যনাট্যের যে-বাঁধুনি দেখানো থাকে সেটা ভেঙে মুক্ত হ'য়ে যায়, অর্থ হিসেবে তার নতুন ছাঁদ হয়।

অর্থাৎ অভিনয়ের স্ব-তন্ত্রে গদ্যের বা কাব্যের সংলাপের এক ছন্দ-বিভাজন

হয়। এবং এই বিভাগটা কেবলমাত্র শব্দের দ্বারাই হয় না, কখনো চুপ ক'রে থাকায়, কখনো-বা ভঙ্গীর দ্বারা হয়।

"নাই, দেবী নাই। নাই? দয়া ক'রে থাকো"··· ইত্যাদি। এখানে নাই?-এর পর একটা নিস্তব্ধতা, একটা ছেদ। যেন 'নাই?' এই প্রশ্নটাই একটা পুরো লাইন।

আর ভঙ্গীর দ্বারাও যে ভাগ হয় তার প্রমাণ দেখা যায় যখন কেউ 'সে বললে এখানে আসবে, এখনো দেখা নেই' বাক্যটায় 'এখনো' শব্দটা বাদ দিয়ে কেবল হাতটা একবার নেড়ে 'দেখা নেই' ব'লে দেয়।

অভিনয়ে সংলাপ বলাটা কেবল একটা সামান্য সংবাদ দর্শকদের দেওয়া নয়। একটা ঘটনা সম্পর্কে বক্তার কী অনুভব, যে সেই ঘটনাটা ঘটিয়েছে তার সম্পর্কে কী অনুভব, এবং যাকে বলা হচ্ছে তাকে এই কথাটা বললে তার কী প্রতিক্রিয়া হবে ব'লে বক্তার অনুমান, সমস্তই একসঙ্গে প্রকাশ পায়। জীবনেও তাই পায়। এবং এর ওপরে থাকে আমাদের মূলীভূত কোনো একটি আবেগকে নাটকীয় মুহূর্তে নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা। তাইতো অভিনেতা যখন কোনো ভূমিকা তৈরী করে তখন সে নিজেকেই আবিষ্কার করতে করতে যায়। এবং যখন সে অভিনয় করে তখনো সে-আবিষ্কারের কাজ থামে না। তখন সে relaxed হ'য়ে নিজের মৌল অনুভবগুলোর জেগে ওঠবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আর যখন সে তা পারে তখন দর্শকদের মধ্যে যাঁরা 'রসিক' তাঁদেরও মনের তারে ঝনঝন ক'রে ওঠে, তখন তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত ছবি নিজেরা সৃষ্টি করেন। ফলে, সমস্তটা একটা সহযাত্রার রূপ নেয়; 'কেবল একজন করে আর অন্যেরা দ্যাখে' নয়।

জানিনা বোঝানো গেলো কিনা। শুধু যেটা আমার আন্দাজ, আমার একধরনের উপলব্ধি বলা যেতে পারে, সেইটাই লিখতে চেষ্টা করলুম। এবং এইরকম সময়ে — যখন নিজের মৌল কিছু অনুভব জাগে — তখন সত্যিই আমি ভালো অভিনয় করছি কিনা, ঠিকমতো আমি সব প্রকাশ করতে পারছি কিনা, তা-ও বুঝতে পারা যায় না। লেখার মতোই তখন অভিনয় সম্পর্কেও কিছু বলতে বড়ো সঙ্কোচ বোধ হয়। জানিনা তো আমি অধিকারী কিনা। স্তানিস্লাভস্কি যখন প্রথম তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী অভিনয় করতে আরম্ভ করেন তখন অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা তাঁর অভিনয়ে কিছু পরিবর্তন অনুভব

করছে কিনা। কেউ-ই বিশেষ ক'রে কিছু লক্ষ করেনি। তিনি অবশ্য বিরাট লোক ছিলেন, তাই তাঁর তত্ত্বকে সাজিয়েছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন, এবং অন্যকে শিখিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমি যে-অভিনয়ের কথা বলছি তার আদ্যোপান্তে কাব্যের মতো নেশা আছে, একটা আবেগ আছে, এবং এ-অনুভব এতো ব্যক্তিগত যে এ-পথ যদি কেউ একলা একলা হেঁটে আসে তবেই বোধহয় সে বুঝতে পারবে। কারণ এ-জিনিস ব'লে বোঝানো যায় না, ইচ্ছা-মতো ক'রে দেখানোও যায় না। এ একটা অন্য অস্তিত্ব।

অর্থাৎ গলা তৈরী করা, উচ্চারণ তৈরী করা, চরিত্রটাকে বুঝে তার মতো অভিনয় করা, বা চরিত্রটার টীকাকার হওয়া, আবেগের মুহূর্তগুলোতে জীয়ন্ত মনে হওয়া, এ-সব হবার পর আরো কাজ বাকি থাকে। লেখক যেমন প্রথমে নিজের ভাষা তৈরী করে, নিজের ছন্দ তৈরী করে, যাতে নিজের মনের ভাব স্পষ্ট ক'রে বোঝাতে পারে তার চেষ্টা করে, কিন্তু এ-সমস্ত হ'য়ে যাবার পর সে নিজেকে ছাড়া দেয়। কঠিন সাধনালব্ধ সেই যে সহজতা, তার মধ্যে প্রত্যেক বাক্যের পিছনে যেন একটা অনন্ত গভীরতা ছায়া ফেলে থাকে। ভালো অভিনয়ও আমার মনে হয় ঐ-রকম। ঐ-রকম অসীমের স্পর্শ-লাগা।

কিন্তু এইরকম অভিনয়ের ক্ষেত্রে নির্দেশকের কাজটা কী? তার কাজ এইটা দেখতে পাওয়া, এবং এইটাকে ফুটে উঠতে সাহায্য করা। আলোতে, ধ্বনিতে, সমস্তটাকে একটা কাব্যের মধ্যে ধরা। নাটকাভিনয় যদি কাব্যের অনুভূতি না-জাগায় তাহ'লে আমার মন তৃষ্ণার্ত থেকে যায়। কাব্যই তো আমাদের সেই বিরাটের আস্বাদ এনে দেয়।

তাছাড়া সব অভিনেতারই তো এই গভীরতা প্রকাশের ক্ষমতা থাকে না, এবং যাদের থাকে তাদেরও একদিনে সেটা জন্মায় না, — তাই নির্দেশক এই খেই-টা সকলকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে ভালো হয়। কারণ, নির্দেশকের ওপরেই তো পুরো নাট্যের রূপ নির্ভর করে। তাই আমার অনেক সময়ে ভেবে মনে হয়েছে যে নাটক যিনি লেখেন তিনি নাটককার, আর পুরো নাট্যের যিনি রূপ দেন তাঁরই নাম নাট্যকার হ'লে ঠিক শোনায়। অন্য প্রদেশেও নাটক-লেখককে নাটককারই বলা হয়। কিন্তু থাকগে এ-সব কথা।

নাট্যের রূপ স্থির করার জন্যেই নির্দেশক নাটককে অদলবদল করেন, ফিরে সাজান। ঠিক যেমন চলচ্চিত্রের রূপের জন্যে সাহিত্যের গল্প ফিরে

সাজানো হয়। ঠিক তেমনি মঞ্চের রূপের জন্যে নাটককেও ফিরে সাজানো দরকার হয়। ফিল্মে যদি সেটা অনুমোদিত হয় তাহ'লে স্টেজেই বা হবে না কেন ?

এ-কথার উত্তরে হয়তো বলা যায় যে, নাট্যকার মঞ্চের কথা ভেবেই নাটক লিখে থাকেন, অতএব তাঁর লেখাটাই ফিল্মের সিনারিওর মতো।

এ-কথাটা এককালে যতোটা সত্য ছিলো আজ আর তা নেই। এখন নির্দেশকের কাজের মধ্যে অনেক টেক্‌নিক্যাল ব্যাপার এসে পড়েছে। তাছাড়া, যেখানে নাট্যের একটা বাঁধা রূপ আছে সেখানে যদিও-বা এটা সত্য হয়, যেখানে প্রচণ্ড গতিতে নাট্যের রূপ বদলাচ্ছে, বদলানোর চেষ্টা হচ্ছে সেখানে সত্য নয়।

আর তাই কাজটা অনেক জটিল হ'য়ে পড়েছে। ধরুন, একজন নির্দেশক নতুন একটা নাট্যের রূপারোপের কথা ভাবলো, — তখন সে দেখবে যে শহরে যে মঞ্চগুলো আছে তার কোনোটাতেই সে-নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করা যায় না। আমার নিজেরই কতোবার এ-কথা মনে হয়েছে।

তাই, প্রশ্ন আসে যে এইরকম নতুন রূপের কাব্যময় নাট্যাভিনয় কোন্‌ মঞ্চে হবে ? পর্দা-ঢাকা প্রোসিনিয়াম স্টেজে ? কলকাতায় আমাদের নাটকের দলগুলোকে বাধ্য হ'য়েই প্রোসিনিয়াম স্টেজ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু সময় এসেছে অন্যভাবে অন্য মঞ্চ তৈরী করার। যেখানে নানাভাবে মঞ্চকে ব্যবহার করা যায়। কেবল মঞ্চের ভিতরটাই নয়, বাইরেটাও। যেখানে দর্শকদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় দূরত্বও থাকবে আবার নৈকট্যও থাকবে। সেটা যাত্রার আসরও নয়, আবার প্রোসিনিয়াম মঞ্চও নয়। মঞ্চের নতুন রূপ সম্পর্কে ভাবার সময় এসেছে নতুন শিল্পীদের।

১৩৭৮